ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান

আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদভী
অনুবাদঃ অধ্যাপক আ.ফ.ম খালিদ হোসেন

সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ
চট্টগ্রাম

প্রথম প্রকাশঃ
পৌষ, ১৪১০
জানুয়ারী, ২০০৪
জিলকদ, ১৪২৪

প্রকাশকঃ
সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ
১৬৬/১৬৮ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
পোষ্ট বক্স # ৭৭৪

প্রচ্ছদ অলংকরণঃ আল আরাফাত
অক্ষর বিন্যাসঃ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ
মুদ্রণঃ এ্যাড সোসাইটি

বিনিময়ঃ ৮৫.০০ টাকা

Bharat Barshe Musalmander Abadan (Contribution of Muslims to Indian Sub continent) Written by Sayyid Abul Hasan Ali Nadwi. Rendered into Bengali by Prof. A.F.M Khalid Hossain and published by Center for Research on the Quran and Sunnah, 166/168, College Road, Chawkbazar, Chittagong, Bangladesh.
Post Box No.774
Price: 85.00 tk.

উৎসর্গ

এ ক্ষুদ্র অনুবাদ কর্মটি আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা, শিক্ষক ও গাইড,
সাতকানিয়া আলিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জনাব
মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের
নামে উৎসর্গ করছি, যিনি রক্ত দিয়ে, শ্রম দিয়ে সর্বোপরি
সার্বক্ষনিক দু'আ দিয়ে আমাকে এ কাজের উপযুক্ত করেছেন।
মহান আল্লাহ তাঁকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন– আমীন।

আ.ফ.ম খালিদ হোসেন
সিনিয়র প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
ওমর গণী এম. ই.এস কলেজ
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
E-mail: khalid 009 <ep 4001@bttb.net.bd

প্রকাশকের কথা

ভারতবর্ষের বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে মুসলমানদের রয়েছে গৌরবদীপ্ত অবদান। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, লোকাচার ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় মুসলমানদের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভারতের জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্রমবিকাশ ধারায় মুসলামনদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ ও দেশ মাতৃকায় মুক্তি সংগ্রামে তাদের নজীরবিহীন কুরবাণী ভারতের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোন কোন বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ইতিহাসবিদ মুসলমানদের চিহ্নিত করছেন আগ্রাসী, লুটেরা ও অপাংক্তেয়রূপে। তাদের অভিযোগ, মুসলমানরা নিয়েছেনই কেবল,ভারতবর্ষকে দিতে পারেনি কিছু। এ অভিযোগ একেবারে কাল্পনিক, ভিত্তিহীন ও সংকীর্ণতা প্রণোদিত। বক্ষমান গ্রন্থে বিশ্বের কীর্তিমান ইতিহাসবিদ, আরবী সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল ও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত আলামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) ঐতিহাসিক উপাত্ত নির্ভর তথ্য ও যুক্তি ভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে এ সত্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন যে, মিশনারী জাতি হিসেবে মুসলমানরা এ দেশকে ভালবেসেছেন। এ দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন এবং এ দেশের মাটিতে তাঁরা সামাহিত হয়েছেন। মধ্য এশিয়ার মুসলমান সূফী, দরবেশ, বুদ্ধিজীবী, লেখক এবং পণ্ডিতরা এসে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে যোগ করেছেন নতুন আঙ্গিক, নতুন মাত্রা ও নতুন রুচি বোধ।

ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় মুসলমানদের যে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এগারোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এ গ্রন্থটির প্রতিটি ছত্রে ছত্রে মুসলমানদের কীর্তি ও গৌরবগাঁথার বিবরণ ও বিশেষণ রয়েছে। ইতিপূর্বে আলোচ্য গ্রন্থটির একাধিক অনুবাদ বেরিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। উর্দূ হতে বাংলা ভাষায় এটা প্রথম অনুবাদ করেছেন বন্ধুপ্রতিম অধ্যাপক আ.ফ.ম খালিদ হোসেন। সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুর'আন এন্ড সুন্নাহ এর পক্ষ হতে এ ঐতিহাসিক গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে বিশেষভাবে এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের কাছে সাধারণভাবে এ গ্রন্থটি আদৃত হবে–এটা আমার যৌক্তিক প্রত্যাশা। আলাহ্ আমাদের এ মেহনত কবুল করুন।

আমীন

কাজী দ্বীন মুহাম্মদ
চেয়ারম্যান
সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ

সূচীঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রারম্ভিক কথা ঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-শ্রেণী যদি পারস্পরিক ঐক্য ও আস্থা, ভালবাসা ও মর্যাদা এবং সুখ-দুঃখে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশদারিত্বের ভিত্তিতে এক সাথে থাকতে (Co- Existence) চায় তাহলে অবশ্যই প্রত্যেক জাতিকে অন্য জাতির মানসিকতা ও রুচি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে, জানতে হবে তার আক্বীদা-বিশ্বাস কী? তার সামাজিক আচার-আচরণ কি ধরণের, তার অতীত ও ইতিহাস কি রকম। জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে জাতির অবদানকে স্বীকার করতে হবে, তার নির্মাণ শৈলী ও সৃজনশীল যোগ্যতা সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, অন্য জাতির এ সব বিষয়কে জানার পাশাপাশি সম্মান করতে হবে, মূল্যায়ন করতে হবে, ক্ষেত্র বিশেষে সহানুভূতি দেখাতে হবে এবং প্রয়োজনে এসব সামাজিক আচার-আচরণ ও জাতিগত প্রতিভা-যোগ্যতাকে সংরক্ষনযোগ্য সম্পদ মনে করতে হবে।

উপরিউক্ত ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্বের প্রত্যেক জায়গায় ভিন্ন দেশের ভাষা সাহিত্য, স্বভাব ও সংস্কৃতি এবং সেদেশের অতীত ও প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জানা জরুরী মনে করা হয়। এমনকি তাদের শিল্প সুষমা সম্পর্কে অবগতিকেও প্রয়োজনীয় বিবেচনা করা হয়। এক রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক দল (Cultural Mission) অন্য রাষ্ট্রে যায়, সেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি অধ্যয়ন করে এবং নিজ দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরে সেখানকার মানুষের সামনে। প্রতিটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে আলাদা অফিস ও শাখা খুলে থাকে এবং সে খাতে উদারতার সাথে অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারত সরকার Indian Council for Cultural Relations নামের বিরাট একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে। কতিপয় আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানও খুলেছে যেমন- Indo-Arab

Society, Indo-Iranian Society ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ হচ্ছে, বিভিন্ন দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়া এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সৃষ্টির জন্যে নানা ধরনের পন্থা অবলম্বন করা।

এমতাবস্থায় যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং স্বয়ং আমাদের দেশ ভারতেও অনেক দূরবর্তী দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সৃষ্টি এবং ব্যাপক কুশল বিনিময়ের আগ্রহ দেখা যায়; প্রত্যেক দেশে অন্যান্য দেশের ভাষা ও সাহিত্য, সেখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি, কবিতা ও সুর এবং সেখানকার অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত জানার ব্যাপক আকর্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে; আর যেখানে প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক চাহিদা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি প্রক্রিয়াও তাই দাবী করে। এটা কী উচিত নয় যে, একই দেশের অধিবাসী অন্যান্য অধিবাসীদের (যারা লাখ নয়; বরং কোটি কোটি সংখ্যায় রয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে এ দেশে বাস করছে দেশের ইতিহাসে যাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে) ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে তাদের অবদান এবং তাদের সৃজনশীল যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত হোক ? এটা এক বিস্ময়কর বৈপরিত্য এবং ভারতের জাতীয় জীবনের এক বিরাট শূন্যতা যে, এখানকার অধিবাসীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের ঐতিহ্য ও প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে একদম অজ্ঞ। তাঁরা এদেশ আবাদ করার ক্ষেত্রে, এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতটুকু অংশ নিয়েছেন, এদেশের উন্নতি-অগ্রগতিতে কী ভূমিকা রেখেছেন? এবং এ ক্ষেত্রে তাদের অবদানই বা (Contribution) কতটুকু ? এ জাতিটির আশা-আকাঙ্ক্ষা কী ? তাদের জীবনের সমস্যা কী ? বর্তমান যুগে তাঁরা কোন ধরণের জটিলতার শিকার ? এ সম্পর্কে কিছুই জানেনা। যুগ যুগ ধরে একই স্থানে পাশাপাশি জীবন যাপন করার পরেও একে অন্যের সাথে এমন অপরিচিত ভাব অবশ্যই এক বিরাট শূন্যতা যা খুব বেশী অনুভূত হওয়া দরকার। এ শূন্যতা পুর্ণ করার দ্রুত প্রয়াস চালানো উচিত। ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক ঐক্য, মৈত্রী, ও আস্থা যা দেশের উন্নতির জন্য অপরিহার্য তা তখন পর্যন্ত হতে পারেনা যতক্ষণ না আমরা দেশের উন্নতি-অগ্রগতির ক্ষেত্রে একজন আরেকজনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে অবগত হবোনা। অতীত, বর্তমান ও

ভবিষ্যতের আলোকে সেই সুবাদে অর্জিত উন্নয়নের সম্ভাবনাগুলোকে চিহ্নিত করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত সেই ঐক্য ও সদভাব সুদূর পরাহতই থেকে যাবে।

এটা শুধু অজানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আরো ভয়ঙ্কর ও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, ভারতের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ জাতির সভ্যতা, ইতিহাস, দেশের স্বাধীনতায় তাঁরা যে কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং আরো যেসব অমূল্য ত্যাগ ও কুরবানি দিয়েছেন এসব বিষয়কে ইদানিং উপেক্ষা করার বরং অস্বীকার করার মানসিকতা জন্ম নিচ্ছে। ভারতের ইতিহাসকে পরিকল্পিতভাবে এমনভাবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা চলছে, যেন মুসলমানদের যুগটা নিরেট এক প্রবাসী জাতির সাম্রাজ্যবাদীর যুগ বৈ কিছুই নয়। যার মধ্যে ভাল ও কল্যাণ বলতে কিছুই ছিলোনা। এ সময়ের মধ্যে উঁচু মানের কোন ব্যক্তিত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার দিক দিয়ে কোন কৃতিত্ব এবং দেশ গড়ার ও জাতীয় উন্নয়নে এমন কোন অনাবিল ও নির্দোষ কাজ হয়নি যা নিয়ে ভারত গর্ব করতে পারে। দীর্ঘ স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের অথবা নির্লিপ্ত কোন জাতির। ঘটনাক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিলেও তা অনুল্লেখ্য। এভাবে আমরা ভারতের সবুজ শ্যামল, সদাবসন্ত মুখর বৃক্ষের এক ফলদায়ক শাখাকে আমরা নিজেরাই বর্শাবিদ্ধ করে চলেছি এবং এটাই প্রমাণ করছি যে,আটশ বছর পর্যন্ত এ বৃক্ষ নিষ্ফল ছিলো। দেশ জুড়ে হেমন্তই শুধু বিরাজ করতো।

এঘটনা যেমন ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিরোধী, তেমনি এর মাধ্যমে আমাদের দেশের উর্বরতা, যোগ্য মানুষ সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। আর এভাবে আমরা কোটি কোটি অধিবাসীর সাথে অন্যায় আচরণ করছি, তাঁদের হৃদয়ে কষ্ট দিচ্ছি এবং তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে আহত করছি। শুধু তাই নয়; বরং এ দেশ, দেশের ইতিহাস, বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের সাথেও অন্যায় করছি। অথচ তাদের জন্য এসব খুবই প্রয়োজন ছিল। এভাবে ভারতবর্ষের মুসলিম যুগের ব্যতিক্রমধর্মী ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের নমুনা তাদের সামনে উপস্থাপন করা দরকার। পাশাপাশি এ

যুগের অবদানগুলোকে প্রকাশ করে আমরা মুসলিম দেশগুলোর (যাদের সাথে আমরা বন্ধুত্ব গড়তে প্রত্যাশী) সামনে ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিচয় তুলে ধরতে পারি। বিশ্বের বুদ্ধিজীবি মহলের সাথে ভারতীয় মুসলমান মনীষীদের সৃজনশীল মেধা ও মননের পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। যেহেতু মুসলিম দেশ সমূহ আগে থেকেই এ ধরণের বহু নাম ও গবেষণা কর্মের সাথে পরিচিত। তাই এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা বা মাথা ব্যথার প্রয়োজন হবেনা।

এ প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতাই বক্ষ্যমান গ্রন্থটি রচনার মূল প্রেরণা বা কারণ। আমাদের দেশের অনেক মুসলমান এবং অমুসলিম বন্ধুদের পক্ষে বৃহৎ গ্রন্থ পড়ার সুযোগ হয়না।সনাতন পদ্ধতিতে ফার্সী ও উর্দূ বইপুস্তকের মাধ্যমে মুসলমানদের অবদান এবং মুসলিম যুগের সাংস্কৃতিক, ইলমী ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হওয়াও অনেক সময় সম্ভবপর হয়ে উঠেনা। এ জন্যে এধরনের, অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রন্থের প্রয়োজন যার মধ্যে থাকবে মুসলিম যুগের পরিচয় এবং ইতিহাসের কিছু ঝলক। আমি ১৯৫১ সালে যখন মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘ সফর শেষে প্রত্যাবর্তন করি তখন 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'-র অনুরোধে *'ভারতীয় মুসলমান'* শীর্ষক বেশ কিছু আরবী বক্তৃতা দেই। বক্তৃতা গুলো মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত কোন কোন ভারতীয় দূতাবাসের খুবই ভাল লাগে এবং সেগুলো প্রকাশ করার জন্য প্রস্তাব করে। স্বয়ং 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতাগুলো সম্প্রচার করে। দামেস্ক থেকে প্রকাশিত একটি আন্তর্জাতি মানের আরবী ম্যাগাজিন *'আল-মুসলিমূন'* বক্তৃতাগুলো কয়েক কিস্তি করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে। মনে করলাম, সেই বক্তৃতাগুলোকে যদি আরেকবার দেখে প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় সংযোজন করা হয় তাহলে উপরোল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একটি মহৎ কাজ হতে পারে। সুতরাং প্রয়োজনীয় সব কিছুকে সমন্বয় করে একটি আরবী গ্রন্থের রূপ দেয়া হলো। পরবর্তীতে আমার অনুরোধে সুপ্রিয় বন্ধু, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার সাবেক উস্তাদ মৌলভী মাহমূদুল হাসান নদভী গ্রন্থটিকে সাবলীল উর্দূ ভাষায় তরজমা করেন। গ্রন্থটিকে আরেকবার দেখে প্রয়োজনীয়, উল্লেখযোগ্য পরিবর্ধন, পরিমার্জন করা হয়।

পরে আমি এ সংকলনে বেশ কয়েকটি এমন বিষয় সংযোজন করি যা রেডিওতে প্রচারিত হয়নি।

এ গ্রন্থটি আরবী ভাষায় *'আল-মুসলিমূনা ফিল হিন্দ'* নামে ভারত ও বিভিন্ন আরব দেশ হতে প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে এর বেশ ক'টি আরবী সংস্করণ বেরিয়েছে। ইংরেজী ভাষায় Muslims In India নামে গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উর্দূতে *'হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারিখী জায়েযা'* নাম দিয়ে 'মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম'-এর পক্ষ থেকে গ্রন্থটির বেশ কয়েকটি সংস্করণ বের হয়। আমি দীর্ঘদিন পরে গ্রন্থটির উপর আরেকবার দৃষ্টি বুলিয়ে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি যা গ্রন্থটির প্রাথমিক সংস্করণগুলোতে চোখের সামনে থাকলেও তখনকার বাস্তবতার নিরিখে অধ্যায়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়ার মত ঘটনা বা পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। বর্তমানে অধ্যায়গুলো সময়োচিত বলে সংযোজন করে দেয়া হয়েছে। এভাবে গ্রন্থটি এসব সংযোজনের মাধ্যমে একেবারে (Up to Date) হয়ে গেলো। আশা করি এ সংকলনটি সর্বস্তরে আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে পঠিত হবে। হয়ত সেই অজ্ঞতা ও অহেতুক সাম্প্রদায়িকতা লাঘবে এবং বাস্তবতা নির্ভর এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে এমন ফলদায়ক খিদমত আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে যার মুখাপেক্ষী আজ আমরা সবাই।

এ প্রত্যাশাও অমূলক নয় যে, শুধু অমসুলিম বন্ধুরাই নয়; বরং অনেক শিক্ষিত মুসলমান এ গ্রন্থ থেকে অনেক নতুন বিষয় জানতে পারবেন এবং এতে তাদের জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে। আর সেই হীনমন্যতার (Inferiority Complex) কিছুটা চিকিৎসা হবে যা দূর্ভাগ্যবশতঃ এ যুগের মুসলমানদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ মুসলমানদের জন্য তার কোন অবকাশ নেই। কারণ তারা এদেশের শুধু স্বাধীন, মর্যাদাশীল নাগরিক ও আদিবাসী নন; বরং এ বিশাল দেশের স্থপতিও (Architect) বটে। তাঁরাই এদেশের খিদমত করেছেন, দেশের মর্যাদা বুলন্দ করেছেন, দেশের সভ্যতা ও মানসিকতায় নতুন জীবন সঞ্চার করেছেন, এদেশকে নতুন ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে পরিচয় করিয়েছেন। তাঁরা অনেক উঁচু মাপের লোক। এখানকার প্রতিটি অণুতে

তাদের শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন বিদ্যমান, দেশের প্রতিটি অংশে রয়েছে তাঁদের মেধা, তাঁদের একনিষ্ঠতা, তাঁদের স্থাপত্যরুচি ও জযবায়ে খিদমতের অসংখ্য স্মৃতি। এখানকার জীবন ও সভ্যতার প্রত্যেক দিক তাদের সুরুচির স্বাক্ষ্য দেয়। ভারতের মাটিতে যে ব্যক্তিই পা রাখবেন এবং এখানকার ইতিহাসের যে কেউই পাতা উল্টাবেন নিজের অজান্তে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠবেন ঃ

"এখনি এ পথ দিয়ে যেন কেউ গেলো
পদচিহ্ন বলে দিচ্ছে সে যে গেলো।"

৩০ রজব ১৪২২হি.
সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদভী
৫ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ ইং
দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা
লক্ষ্ণৌ, ভারত।

প্রথম পরিচ্ছেদ
ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতায় মুসলমানদের প্রভাব

মুসলমান ধর্ম প্রচারক ও দরবেশ ঃ

মুসলমানরা পার্থিব লাভ ও বস্তুগত সুবিধা অর্জনের উর্দ্ধে উঠে নির্ভেজাল ধর্মীয় উদ্দীপনা নিয়ে এই বিশাল ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁরা এই দেশে ইসলামী ন্যায় বিচারের বাণী নিয়ে আসেন, যাতে সংকীর্ণ ও অন্ধকার পৃথিবীতে আলো ও বিস্তৃতির প্রত্যাশী মানব গোষ্ঠীকে মহান আল্লাহর বিস্তৃত জমিনে প্রকৃতির অমূল্য প্রাচুর্য্যে ভাগ্যবান হওয়ার পদ্ধতি শেখানো যায়; গোলামী ও অধীনতার লৌহ জিঞ্জিরে আবদ্ধ অসহায় মানুষকে বিশ্ব স্রষ্টা প্রদত্ত স্বাধীনতায় লাভবান করা যায়। ইসলামের নিঃস্বার্থ খাদিমগণ এবং মরুভূমিতে খেজুর পাতার চাটাইয়ে অবস্থানকারী বিশ্ববিজয়ীদের জীবনাদর্শ ওইসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের স্নেহছায়ায় ভারতীয় সমাজের হাজারো বিক্ষুদ্ধ ও মযলুম মানুষের কেবল আশ্রয় মেলেনি বরং এখানে তারা আপন পিতা-পুত্র এবং সহোদর ভাই-বোনের মত বসবাস করতে থাকেন। হযরত সাইয়্যেদ আলী হেজুয়রী (রহ.), খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী আজমিরী (রহ.) ওই সব বুযর্গদের অন্তর্ভূক্ত।

বিজয়ী ও শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক ঃ

মুসলমানরা কখনো এই দেশে বিজয়ী সেনাপতি ও সদাশয় মহানুভব শাসকরূপে আগমন করেন। যেমন সুলতান মাহমূদ গজনভী, শাহাব উদ্দীন মুহাম্মদ ঘূরী ও জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর তৈমুরী। এই সব শাসকদের হাতে ভারতে বিশাল ও জাঁকাল সাম্রাজ্য ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাঁরা দীর্ঘকাল যাবত ভারতের সেবা করেন এবং দেশকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির উচ্চাসনে অধিষ্টিত করেন।

ভারতের সাথে স্থায়ী সম্পর্ক ঃ

মূলতঃ মুসলমানগণ যে উদ্দেশ্যেই ভারতে আগমন করুন না কেন তারা এদেশকে নিজের মাতৃভূমি রূপে গ্রহণ করে নেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল পৃথিবী আল্লাহর, তিনিই যাকে চান স্বীয় পৃথিবীর উত্তরাধিকার ও

পাহারাদার নিযুক্ত করেন। তাঁরা নিজেদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত এই ভূখন্ডের ব্যবস্থাপক ও এবং আল্লাহর বান্দাদের সেবক মনে করতেন। তাদের গভীর প্রতীতি ছিল ঃ

"প্রতিটি ভূখন্ড আমার দেশ যেহেতু প্রতিটি ভূখন্ডের মালিক আমার আল্লাহ্।"

এই কারণে মুসলমানগণ সব সময় ভারতকে নিজের দেশ, নিজের ঘর এবং নিজের স্থায়ী নিবাস মনে করেন। এই দেশ হতে তাঁরা কখনো মুখ ফেরাতে পারেননি। সুতরাং ভারতের সেবার জন্য তাঁরা নিজেদের উৎকৃষ্টতর যোগ্যতা, আল্লাহ্ প্রদত্ত দক্ষতা ও মেধাকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা মানে নিজের সম্পদকে সমৃদ্ধ করা কারণ তাঁদের ভবিষ্যৎ এদেশের ভাগ্যের সাথে বিজড়িত। এই চেতনাবোধের ফলশ্রুতিতে দেখা গেল ভারতের মুসলমানরা যে দৃষ্টিতে এই দেশ প্রত্যক্ষ করেন ইংরেজ এবং অপরাপর সাম্রাজ্যবাদী অক্ষশক্তি এই দেশকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এখানকার সম্পদ লুণ্ঠন। তাদের জন্য এদেশটি ছিল, ক'দিনের জন্য পাওয়া দুধেল গাভীর মত। যে ক'দিন হাতের কাছে আছে ভাল করে দুধ দোহন করে নিতে হবে। এই দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য মুসলমানরা যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেছেন তার নেপথ্যে ছিল এই দেশের প্রতি মুসলমানদের মমত্ববোধ ও আগ্রহ।

ভারতের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ঃ

মুসলমানরা যখন ভারতে আসেন তখন এইখানে প্রাচীন বিদ্যা ও দর্শনের প্রচলন ছিল। খাদ্য, শষ্য, ফল, কাঁচামাল ব্যাপকভাবে উৎপন্ন হত কিন্তু সাংস্কৃতিক দিয়ে এদেশের জনগোষ্ঠী সভ্য ও উন্নত বিশ্ব হতে দীর্ঘ দিন যাবৎ ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । একদিকে সুউচ্চ পর্বতমালা অপর দিকে তরঙ্গবিক্ষুদ্ধ সাগর এই দেশকে বাইরের জগতের সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আলেজান্ডারই হচ্ছেন সর্বশেষ সম্রাট যিনি বাইরের সভ্য জগত থেকে এখানে এসেছিলেন। মুসলমানদের আগমন পর্যন্ত বাইরের জগতের সাথে ভারতের কোন সম্পর্ক ছিল না। বহির্বিশ্বের চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-কানুন, শিক্ষা-সংস্কৃতির নতুন পদ্ধতি যেমন

এই দেশে আসেনি তেমনি এই দেশের প্রাচীন কলা ও জ্ঞান ভান্ডারও বাইরে যায়নি।

বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ঃ

এই অসহায় মুসলমানগণ (যারা সে সময় প্রাচ্যের সবচে উন্নত সমৃদ্ধ জাতি ছিল) ভারতে আগমন করেন। তাঁদের সাথে ছিল এক নতুন সংস্কৃতি, সুগভীর প্রজ্ঞা, বাস্তব ধর্ম ও পরিপক্ক জ্ঞান। তাঁরা সাথে আরো বহন করে আনেন সংস্কৃতিবান ও সমৃদ্ধ জাতির মূল্যবান অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর প্রখর মেধাবী ও মননশীল মানুষের চিন্তার ফসল। এক কথায় মুসলমানগণ এই দেশে আরবদের সহজাত শিল্পিত রুচিবোধ, ইরানীদের মার্জিত সংস্কৃতি এবং তুর্কীদের রূঢ় সরলতার প্রতিনিধিত্ব করেন। এ ছাড়া মুসলমানরা ভারতীয়দের জন্য নিয়ে আসেন আরো বহু অমূল্য সম্পদ উপঢৌকন ও নৈতিক সদগুণাবলী।

তাওহীদ ও আল্লাহর ইবাদতে ইসলামের অবদান ঃ

সবচেয়ে মূল্যবান ও দূর্লভ উপঢৌকন যা মুসলমানরা এইদেশে নিয়ে আসেন তা হল ইসলামের বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ তাওহীদের বিশ্বাস; যার অধীনে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রার্থনা-বন্দনা ও ইবাদতে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। এই বিশ্বাসে বহু ইশ্বরবাদের ও অবতারবাদের স্থান নেই। বরং এক আল্লাহ, যিনি কারো মূখাপেক্ষী নন, যার সন্তান নেই, পিতা নেই। তাঁর কোন অংশীদার নেই। পৃথিবী ও সব মাখলুকের স্রষ্টা তিনি। জগতের নিয়ম কানুন, আকাশ ও ভূমন্ডলের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁর হাতে। সেই একক আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস ও স্বীকৃতির নামই তাওহীদ। তাওহীদের এই ধারণা ও বিশ্বাসের সাথে ভারতের জনগোষ্ঠীর পরিচিতি না থাকাটা ছিল স্বাভাবিক। ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় ধর্মের উপর ইসলামের অপ্রতিহত প্রভাবের উল্লেখ করতে গিয়ে বিশিষ্ট পন্ডিত ও ইতিহাসবিদ ড. কে,এম, পানিকর বলেন ঃ

"one thing is clear; Islam had a profound effect on Hinduism during this period. Medieval theism is in some ways a reply to the attack of Islam; and the

doctrines of medieval teachers by whatever names their gods are known are essentially theistic. It is the one supreme God that is the object of the devotee's adoration and it is to His grace that we are asked to look for redemption.

'একথা স্পষ্ট যে, এই যুগে হিন্দু ধর্মের উপর ইসলামের সুগভীর প্রভাব পড়েছে। হিন্দুদের মধ্যে স্রষ্টার উপাসনার ধারণা ইসলামের বদৌলতে সৃষ্টি হয়েছে। এযুগের সব হিন্দু পুরোহিতগণ তাদের দেবতাদের নাম যাই রাখুন না কেন! অর্থাৎ স্রষ্টা এক, তিনিই উপাসনার একমাত্র উপযুক্ত এবং তাঁর মাধ্যমেই আমরা পারলৌকিক মুক্তি পেতে পারি।"[১]

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ঃ

ইসলামে সাম্যের ধারণা ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা ছিল ভারতের সমাজ জীবনে একেবারে নতুন ও মূল্যবান বস্তু। মুসলিম সমাজে কোন শ্রেণী বৈষম্য নেই। অস্পৃশ্য ও অচ্ছুৎ সম্প্রদায় নেই। তাঁদের প্রত্যয় ছিল কোন মানুষ জন্মগত ভাবে অপবিত্র ও স্থিরীকৃত গন্ডমূর্খ হতে পারে না, যার জ্ঞানার্জনের কোন অধিকার নেই। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন পেশা ও ব্যবসা সংরক্ষিত রাখা হয় না। অপরদিকে তাঁরা এক সাথে থাকেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সর্বস্তরে জ্ঞানার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালান এবং তাদের সমাজে রয়েছে পেশা বাচাইয়ের অবাধ স্বাধীনতা।

মানব ভ্রাতৃত্বের এই চেতনা ছিল ভারতীয় মানস ও ভারতীয় সমাজের এক মহৎ অভিজ্ঞতা, নতুন চিন্তার আহ্বান, যদ্ধারা এই দেশের প্রভূত উপকার হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন প্রচলিত বর্ণপ্রথাপীড়িত সমাজে বেশ শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়। বর্ণবৈষম্যের কঠোরতার বিরুদ্ধে রীতিমত ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা ঘটে। ইসলামের আগমন সমাজ সংস্কারকদের জন্য ছিল বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ। পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু ভারতের সমাজ কাঠামোতে ইসলাম ও মুসলমানদের

---

[1] . Dr. K.M. Panikkar, A Sarvey of Indian History,

অপ্রতিহত উন্নত প্রভাবের উল্লেখ করে যে মন্তব্য করেন এইখানে তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

"The impact of the invaders from the northwest and of Islam on India had been considerable. It had pointed out and shone up the abuses that had crept into Hindu society – the petrification of caste, untouchability, and exclusiveness carried to fantastic lengths. The idea of brotherhood of Islam and theoretical equality of its adherents made a powerful appeal especially to those in the Hindu fold who were denied any semblance of equal treatment.''

" উত্তর-পশ্চিম দিক হতে আগত আক্রমণকারী ও ইসলামের আগমন ভারতের ইতিহাসে বিশেষগুরুত্বের দাবী রাখে। তাঁরা হিন্দু সমাজে সৃষ্ট কুসংস্কার সমূহ বিশেষত বর্ণপ্রথা, শ্রেণী বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা এবং অন্তহীন একাকীত্বের স্বরূপ উন্মোচন করেন। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ ও মুসলমানদের বাস্তব সাম্য হিন্দু মানসিকতায় সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষত যে সব মানুষ হিন্দু সমাজে সর্বদা সমানাধিকার হতে বঞ্চিত, তাদেরকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে।"[১]

মুসলিম শাসকগণ ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাস ও প্রচলিত সামাজিক রীতিকে বিবেচনায় রেখে 'সতী' এর ভয়ানক ও মর্মবিদারী প্রথার সংশোধনে যে প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছেন বিখ্যাত পর্যটক বার্নিয়ারের নিম্নোক্ত বক্তব্য তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ঃ

' .... The number of victims is less now than formerly; the Mahometans , by whom the country is governed, doing all in their power to suppress the barbarous custom. They do not, indeed, forbid it by a positive low, because it is a part of their policy to

---

[1].Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, 1946 P. 225

leave the idolatrous population which is so much more numerous than their own in the free exercise of its Religion; but the practice is checked by indirect means. No woman can sacrifice herself without permission from the governor of the province in which she resides, and he never grants it until he shall have ascertained that she is not to be turned aside from her purpose; to accomplish this desirable end the governor reasons with the widow and makes her enticing promises; after which, if these methods fail, he sometimes sends her among his women, that the effect of their remonstrances may be tried. Notwithstanding these obstacles, the number of self-immolations is still very consider-able particularly in the territories of the Rajas, where no Mahometan governors are appointed.

" আগের তুলনায় বর্তমানে 'সতী' এর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কারণ মুসলমানগণ যে সব অঞ্চলের শাসক হয়েছেন তাঁরা বর্বর এ প্রথার উচ্ছেদে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন; যদিও এ প্রথা হতে জনগণকে বিরত রাখার পর্যাপ্ত আইন বিধিবদ্ধ নেই। হিন্দুদের জীবনাচার ও উত্তরাধিকার ঐতিহ্যে হস্তক্ষেপ না করার করাই হচ্ছে মুসলিম শাসন পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বরং ধর্মীয় রীতি ও প্রথা পালনে জনসাধারণকে তাঁরা স্বাধীনতা প্রদান করেন। এতদসত্ত্বেও 'সতী' এর প্রথা পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্মুলের জন্য তাঁদের প্রয়াস অব্যাহত থাকে। এমনকি কোন বিধবা মহিলা প্রাদেশিক গভর্ণরের পূর্বানুমতি ছাড়া 'সতী' হতে পারবেনা। মহিলা তার সিদ্ধান্ত হতে মোটেও সরে দাঁড়াবে না, একথায় যথার্থভাবে আস্থাশীল না হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক গভর্ণর 'সতী' হওয়ার কোনক্রমেই অনুমতি প্রদান করেন না। প্রাদেশিক গভর্ণর বা সুবাদার যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তাঁকে বুঝাতেন। ওয়াদা-অঙ্গীকার নিতেন। এ সব তদবীর ও প্রচেষ্টা যদি ফলপ্রসূ না হয় তাহলে আত্মাহুতি দানকারী মহিলাকে গভর্ণরের অন্দর

মহলে পাঠিয়ে দেয়া হতো। যাতে গভর্ণরের সহধর্মিনী ও অপরাপর মহিলা আত্মীয় স্বজনরা তাকে ভালভাবে বুঝাতে পারেন। এত সব প্রয়াস সত্ত্বেও 'সতী' এর সংখ্যা এখনো প্রচুর রয়েছে ; বিশেষত ঐ সব অঞ্চলে যেখানে মুসলমান গভর্ণর নিযুক্ত নেই।"[১]

ইতিহাস চর্চা ঃ

মুসলমানগণ ভারতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক শাখা প্রবর্তন করেন, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইতিহাস। তখনো পর্যন্ত ইতিহাস লিখন ও চর্চার সাথে ভারতবর্ষ অপরিচিত ছিল। সত্যিকার অর্থে ইতিহাস বলা যায় এমন কোন প্রামাণিক গ্রন্থ ভারতে পাওয়া যেত না; কেবল ধর্মীয় কাহিনী, যুদ্ধের ঘটনা নির্ভর স্তুতি, মহাকাব্য বিশেষত, রামায়ন ও মহাভারতের কপি সহজলভ্য ছিল। মুসলমানগণ ইতিহাস শাস্ত্রে বিপুল গ্রন্থ প্রণয়ন করে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার তৈরী করে দিয়েছেন যা নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে এ বিষয়ে পৃথিবীর অন্য যে কোন আধুনিক দেশের গবেষণা কর্মের সাথে সন্তোষজনক ভাবে তুলনা করা যেতে পারে। মাওলানা সাইয়্যেদ আবদুল হাই হাসানী (রহ.) লিখিত *'আস-সাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ'* (ভারতে ইসলামী সংস্কৃতি) নামক গ্রন্থে ভারতের ইতিহাসের রচনায় মুসলমানগণ যে বিস্ময়কর প্রয়াস চালিয়েছেন তার ব্যাপক চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।[২] Dr. Gustave le Bon 'ভারতীয় সভ্যতা' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে ঃ

There does not exist a history of ancient India. Their books contain no historical data whatever, except for a few religious books in which historical information is buried under a heap of parables and folk-lore, and their buildings and other monuments also do nothing to fill the void for the oldest among them do not go beyond the third century B.C. To discover facts about

---

[1].François Burneir, Travels in the Moghal Empire, 1891,PP.306-7.

[২] দামেস্কের বিখ্যাত একাডেমী আল মাজমাউল ইলমী আল-আরবী' হতে গ্রন্থটির দু'টি সংস্করণ ইতমধ্যে বের হয়েছে বেরিয়েছে। উত্তর প্রদেশের আজমগরের দারুল মুসান্নিফীন হতে 'ইসলামী উলূম ওয়াফুনূন হিন্দুস্তান মে' শীর্ষক উর্দূ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

India of the ancient times is as difficult a task as the discovery of the island of Atlantis, which, according to Plato, was destroyed due to the changes of the earth.

" প্রাচীন ভারত বর্ষের কোন ইতিহাস নেই। যেসব গ্রন্থ পাওয়া যায় তাতে ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত নেই। কতিপয় ধর্মীয় গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হয় যেখানে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী রূপক ও কিচ্ছা-কাহিনীর স্তুপের নিচে চাপা পড়ে আছে। যে সব প্রাচীন প্রাসাদ ও স্মৃতিসৌধ রয়েছে যেগুলোও শূন্যতা পূরণে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি, কারণ এ গুলো খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বের নির্মিত। প্রাচীণ ভারত বর্ষের ঘটনাবলী ও ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন যেভাবে আটলান্টিক দ্বীপ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। প্লেটোর মতে উক্ত দ্বীপটি পৃথিবীর পরিবর্তনে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।"
মহাকাব্য রামায়ন ও মহাভারতকে স্বীকৃতি দিয়ে লেখক মন্তব্য করেন যে ঃ

The historical phase of India began with the Muslim Invasion. Muslims were India's first historians.
"ভারত বর্ষের ঐতিহাসিক যুগ সূচিত হয় মূলত মুসলমানদের সেনা অভিযানের পরই এবং মুসলমানরাই ভারতের প্রথম ইতিহাসবিদ।"[১]
জনগণ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতায় যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। তাঁরা এদেশে একটি অত্যন্ত সুন্দর, জীবন্ত, বিস্তৃততর ভাষার জন্ম দিয়েছেন যা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের চিন্তা-চেতনা ও ভাবের বিনিময়ে শক্তিশালী মাধ্যম এবং সাহিত্যের চমৎকার বাহন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমি এর দ্বারা উর্দূকে বুঝাতে চাচ্ছি যার ভাষাগত শক্তি, উৎকর্ষ ও চমৎকারিত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না।

---

[১] .Gustave len Bon Civilizations de l' India , (সাইয়েদ আলী বিলগ্রামী কর্তৃক উর্দূ অনূবাদ)

সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঃ

ভারত বর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, কারিগরি, তথা মানুষের জীবনধারায় মুসলমানদের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানগণ এ দেশের মানুষের জীবনে নতুন বিপ্লবের জন্ম দিয়েছেন যা উপমহাদেশের পূরনো পদ্ধতির চাইতে ভিন্নতর। যেমন আধুনিক ইউরোপের জীবনধারা তথাকার মধ্যযুগীয় জীবনধারা হতে সম্পূর্ণ বিপরীত ও আলাদা।

সম্রাট বাবরের দৃষ্টিতে ভারত ঃ

মুসলমানগণ ভারত বর্ষের সংস্কৃতির বহমান ধারায় কী অসামান্য বৈশিষ্ট্য ও ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছেন তার তাৎপর্য বুঝার জন্য ভারতের ঐ যুগের সমীক্ষা নেয়া প্রয়োজন, যখন মুসলমানদের এ দেশে আগমন ঘটেনি, আধুনিক ইসলামী ভারতের ভিত্তি স্থাপিত হয়নি। মুঘল সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা যহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৪৮৩-১৫৩২ খ্রি.) এদেশে মুসলমানদের আগমন-পূর্ব অবস্থার ব্যাপক চিত্র তুলে ধরেন, যা অধ্যয়ন করলে সম্যকরূপে বুঝা যাবে মুসলমানগণ নিজেদের উন্নয়ন তৎপরতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এ দেশকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছে। মুঘলদের আগমনের অনেক পূর্বে ভারতে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তখন থেকেই নির্মাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। বাবর তাঁর আত্মজীবনী *'তুযুক-ই-বাবরী'* তে লিখেন যে ঃ

There are neither good horses in India, nor good flesh, nor grapes, nor ice, nor cold water, nor baths, nor candle, nor candlestick, nor torch. In the place of the candle, they use the *divat.*[1] It rests on three legs: a small iron piece resembling the snout of a lamp is fixed to the top end of one leg and a weak wick to that of another; the hollowed rind of a gourd is held in the right hand from which a thin stream of oil is poured through a narrow hole. Even in case of Rajas and

---

[1]. A crude sort of lamp made of clay, wood or, iron in which mustard oil is generally burnt.

Maharajas, the attendants stand holding the clumsy *divat* in their hands when they are in need of a light in the night.

There is no arrangement for running water in gardens and buildings. The buildings lack beauty, symmetry, ventilation and neatness. Commonly, the people walk barefooted with a narrow slip tied round the loins. Women wear a dress consisting of one piece of cloth, half of which is wrapped round the legs while the other half is thrown over the head."

"ভারতে উন্নত ঘোড়া নেই, ভাল গোশত নেই, আঙ্গুর নেই, তরমুজ নেই, বরফ নেই, শীতল পানি নেই, শৌচাগার নেই, মোমবাতি নেই, বাতি রাখার পাত্র নেই, মশাল নেই। মোমবাতির পরিবর্তে লোকেরা কাদা মাটি, কাঠ বা লোহার তৈরী পিদিম ব্যবহার করতো। সরিষার তৈল এর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই পিদিমটি তিন পা বিশিষ্ট। এক পা'তে বাতি দানের মুখের আকৃতিতে একটি লোহা কাঠ স্থাপন করা থাকে। রাতের বেলা রাজা-মহারাজাদের যদি আলোর প্রয়োজন পড়তো তখন পরিচারিকাগণ এ স্থুল পিদিম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো।
বাগান ও প্রাসাদে পানি প্রবাহের কোন সুব্যবস্থা নেই। প্রাসাদগুলোতে সৌন্দর্য, সামঞ্জস্য, পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে এবং এতে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নেই। মহিলারা পড়তো ধূতি আর এক অংশ দিয়ে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখতো এবং অপর অংশ ছড়িয়ে দিতো মাথার উপরে।"

ভারতের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ও পশ্চাদপদতা বিষয়ে বাবরের পর্যবেক্ষণের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে পন্ডিত জওহার লাল নেহেরু বলেন ঃ

..... his account tells us of the cultural poverty that had descended on North India. Partly this was due to Timur's destruction, partly due to the exodus of many learned men and artists and noted craftsmen to the South. But this was due also to the drying of the

creative genius of the Indian people. Babar says that there was no lack of skilled workers and artisans, but there was no ingenuity or skill in mechanical invention.

"বাবরের লিখিত ইতিহাস থেকে উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক দরিদ্রতার বিবরণ আমরা পাই। এর পেছনে কারণ ছিল অংশত তৈমুর লঙ্গের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এবং অংশত শিল্পী, কারিগর ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দলবদ্ধভাবে দক্ষিণ ভারতে গমণ। এ অধঃপতনের পেছনে আরেকটি কারণ হচ্ছে ভারতীয় জনগণের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা শুকিয়ে গিয়েছিল। বাবরের মতে এদেশে দক্ষ কারিগর ও শিল্পীর অভাব নেই কিন্তু তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের দক্ষতার অভাব রয়েছে।"[১]

ফলমূলের উন্নয়ন ঃ

মাটির উর্বরতা সত্ত্বেও ভারত বর্ষে ফলমূল পাওয়া যায় অত্যন্ত কম। যা কিছু পাওয়া যায় তাও নিম্ন মানের এবং অপরিকল্পিত ভাবে উৎপাদিত। উদ্যান উন্নয়নে জনগণ পর্যাপ্ত উৎসাহ দেখাইনি। অপর দিকে মুঘল বাদশাহগণের রুচি ছিল উন্নত এবং তাঁদের দেশে বিভিন্ন ধরণের ফলমূল ছিল পর্যাপ্ত। ভারত বর্ষে তাঁদের আগমনের ফলে ফল চাষ দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে। বাবরের *'তুযুক-ই-বাবরী'* ও জাহাঙ্গীরের *'তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরী'*-তে এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এক গাছের সাথে অপর গাছে কলমের মাধ্যমে ব্যাপক পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা সুস্বাদু নতুন জাতের ফল উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে আম ভারতের সুস্বাদু ও বিখ্যাত ফল। মুঘলদের পূর্বে ভারতে শুধু মাত্র 'তুখমী' নামক একটি জাতের আম ছিল। মুঘলরা বিভিন্ন প্রজাতির আমের পরাগায়ন (Pollination) ও কলমের (Graft) মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর সুস্বাদু ও সুমিষ্ট আমের উদ্ভাবন করেন। এর ফলশ্রুতিতে ভারত বর্ষে এত জাতের আমের চাষ হতে লাগল যার সংখ্যা নিরূপন করা কঠিন।

---

[1] Jawaharlal Neheru, ,The discovery of India, P. 218.

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প ঃ

বস্ত্রের ব্যাপারেও একই কথা। ভারত বর্ষের পোষাক সাধারণত তৈরী হতো মোটা ও নিম্ন মানের কাপড় দিয়ে। মাহমূদ বাইগ্রাহ (মৃ.১৫১১) নামে সমধিক পরিচিত সুলতান মাহমূদ শাহ গুজরাটে বহু বস্ত্রের কারখানা স্থাপন করেন। এসব কারখানায় বুনন, রং করণ, ছাপা ও ডিজাইনের কাজ চলতো। এ ছাড়া তিনি কাগজ, রেশমী বস্ত্র, পাথর ও গজদন্ত দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। অগ্রসর ও গঠনমূলক মেধার অধিকারী সুলতান মাহমূদ গুজরাটী শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি সেক্টরে কর্মরত জনগণের মনে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির একটি দূর্লভ উদ্দীপনার জন্ম দেন। ভারতের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবদুল হাই (রহ.) *'নুযহাতুল খাওয়াতির'* গ্রন্থে সুলতান মাহমূদ গুজরাটী প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"দেশের উন্নয়নে সুলতানের 'নজীর বিহীন অবদানের মধ্যে মসজিদ ও বিদ্যালয় নির্মাণ এবং কাগজ ও ঔষধি বৃক্ষের চাষ অন্তর্ভূক্ত। এসব কাজের জন্য তিনি জনগণের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। সেচ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য তিনি বিপূল কূপ ও খাল খনন করেন। ইরান ও তুর্কিস্থান হতে অনেক দক্ষ শিল্পী ও অভিজ্ঞ কারিগর এসে এখানে শিল্প কারখানা স্থাপন করেন। কূপ ও প্রস্রবন ধারার কল্যাণে গুজরাট ভরে উঠে সবুজের সমারোহে। বাড়ন্ত বাগান, নিবিড় বৃক্ষ এবং সুমিষ্ট ফল পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হতে থাকে। এছাড়া গুজরাট গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র রূপে খ্যাতি লাভ করেন। সেখান থেকে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী করা হতো। এসব ছিল জনগণের কল্যাণ সাধনে সুলতান মাহমূদের নিরলস প্রয়াস ও ঐকান্তিক আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ।"[১]

আকবর ও শেরশাহের সংস্কার ঃ

সম্রাট আকবরের সময়ে কাপড় তৈরীর কারখানা গড়ে উঠে ভারতের সর্বত্র। মুঘল সম্রাটগণ ভূমি জরিপ, রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহের মাধ্যমে কৃষি সংস্কার সাধন করেন। শের শাহ ও আকবর তাঁদের রাজত্ব কালে নতুন মুদ্রা প্রবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি

---

[১] মাওলানা সাইয়েদ আবদুল হাই, নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খন্ড, পৃ.৩৪৬

সাধন করেন ইতিপূর্বে ভারতের আর কেউ করেননি। প্রজা কল্যাণার্থে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক সংস্কারের যে ধারা শের শাহ্ সূরী চালু করেন এটা তাঁর সৃষ্টিশীল মেধার পরিচায়ক। সম্রাট আকবর মূলতঃ শেরশাহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন।

জনকল্যাণমূলক কাজ ঃ

জীবন-জন্তুর প্রশিক্ষণ ও এদের বংশ বিস্তারে মুসলিম শাসকবর্গ বিরাট সফলতা অর্জন করেন। *'তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরী', 'আইন-ই- আকবরী'* ইত্যাদি ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আমরা বিস্তারিত বিবরণ পেতে পারি। তাঁরা অসংখ্য হাসপাতাল, দূঃস্থ পূনর্বাসন কেন্দ্র, গণপার্ক, পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ এবং বড় খাল ও বিস্তৃত দীঘি খনন করে জনকল্যাণে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেন। মাওলানা সাইয়েদ আবদুল হাই হাসানী (রহ.) তাঁর *'জান্নাতুল মাশরিক'* নামক তথ্য নির্ভর বিখ্যাত গ্রন্থে ভারতে মুসলিম যুগে স্থাপিত হাসপাতাল, পূনর্বাসন কেন্দ্র, সহ বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানের এক দীর্ঘ তালিকা প্রদান করেন। উক্ত গ্রন্থটি *'আল-হিন্দ ফিল আহাদিল ইসলামী'* নামে হায়দ্রাবাদের উসমানীয়া দায়েরাতুল মা'আরিফ হতে আরবী ভাষায় এবং লক্ষ্ণৌস্থ একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স হতে উর্দূ ভাষায় যুগপৎ প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের সাথে পূর্বাঞ্চলের সংযোগ রক্ষাকারী সব মহাসড়কই নির্মিত হয়েছে মুসলিম রাজা-বাদশাহদের শাসনামলেই। এর বিখ্যাত হচ্ছে শেরশাহ্ শুরী নির্মিত গ্র্যান্ড ট্র্যাংক রোড। এই মহাসড়কটি বাংলাদেশের সোনারগাঁ হতে পাকিস্তানের নিলাব পর্যন্ত ৩,০০০ মাইল (৪,৮৩২ কিলোমিটার)। প্রতি তিন কি দুই কিলোমিটার অন্তর একটি মুসাফির খানা, হিন্দু-মুসলমানদের জন্য পৃথক লঙ্গরখানা ও একটি করে মসজিদ থাকতো। রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত একজন ইমাম ও একজন মুয়াজ্জিন মসজিদের তত্ত্বাবধান করতেন। এক জোড়া দ্রুতগামী ঘোড়া প্রতিটি মুসাফিরখানায় রাখা হত যার মাধ্যমে চিঠিপত্র ও রাষ্ট্রীয় বার্তা নিলাব হতে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছানো হত। সড়কের উভয় পাশে ছায়াদার ফলবান বৃক্ষ রোপন করা হয়েছিল। এই সব বৃক্ষের ছায়া ও ফল পথচারী ও মুসাফিরদের জন্য ছিল অফুরন্ত নিয়ামত স্বরূপ।

পরিচ্ছন্নতা ও উন্নত জীবনধারা

উপরন্তু মুসলমানগণ পরিচ্ছন্নতা ও উন্নত জীবনধারার সাথে ভারতের আদিবাসীদের পরিচয় করে দেন। ভারতীয়রা রুচিবোধ, সংস্কৃতিপ্রীতি, খাদ্য, পানীয়, স্বাস্থ্যবিধি, পানি নিষ্কাশন, বায়ু চলাচলের পথযুক্ত (Ventilation) গৃহ নির্মাণ কৌশল ও রকমারি আধুনিক তৈজষপত্রের ব্যবহার মুসলমানদের নিকট হতে শিক্ষা লাভ করেন। এর আগে ভারতীয়রা খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে এমনকি দাওয়াত ও ভোজ সভায় প্লেটের পরিবর্তে পাতা ব্যবহার করতেন, যা এখনো কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। এক কথায় মুসলমানগণ ভারতের সামাজিক রীতি, জীবনাচার, গার্হস্থ্য সুখ ও গৃহসজ্জায় বড় ধরণের পরিবর্তন নিয়ে আসেন। পূরনো রীতির পরিবর্তে তাঁরা স্থাপত্য কৌশলে নতুন পরিকল্পনা, নতুন সৌষ্ঠব, নতুন প্রতিসাম্য, নতুন মর্যাদার স্বতন্ত্র রীতির সূচনা করেন। তাজমহলের অত্যুৎকৃষ্ট নির্মাণশৈলী সোনালী যুগের স্মৃতিকে জীবন্ত করে দেয়। পন্ডিত জাওহার লাল নেহেরু Discovery of the India নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর মুসলমানদের অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন ঃ

The coming of Islam and of a considerable number of people from outside with different ways of living and thought affected these beliefs and structure. A foreign conquest, with all its evils, has one advantage: it widens the mental horizon of the people and compels them to look out of there shells. They realise that the world is a much bigger and a more variegated place than they had imagined. So the Afghan conquest had affected India and many changes had taken place. Even more so the Moghals, who were far more cultured and advanced in the ways of living than the Afghans, brought changes to India. In particular, they

introduced the refinements for which Iran was famous.

"ইসলাম এবং বিভিন্ন চিন্তা ও জীবনধারায় অভ্যস্ত বহিরাগতদের ভারতে আগমন এখানকার বিশ্বাস ও সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করেছে। বহিরাগত বিজয়ী যা কিছু দোষক্রটি সাথে করে নিয়ে আসে তার একটি ইতিবাচকও থাকে। এটা জনগণের মানসিক দিগন্ত প্রসারিত করে এবং নিজেদের চিন্তার গন্ডি ছেড়ে বাইরে আসতে বাধ্য করে। তাদের ধারণার তুলনায় পৃথিবী আরো বড় এবং বর্ণিল স্থান। সুতরাং আফগানদের আগমন ভারতীয়দের চিন্তা ও জীবনধারাকে পাল্টে দিয়েছে। ভারতে তাঁরা পরিবর্তনের বৈপ্লবিক সূচনা করেন। এর চাইতে আরো বেশী পরিবর্তন সূচিত হয় মুঘলদের দ্বারা। কারণ আফগানদের তুলনায় মুঘলরা ছিল অধিকতর সংস্কৃতিবান ও উন্নত। তাঁরা ভারতে বিশেষভাবে উন্নত রুচিবোধের প্রবর্তন করেন যার জন্য ইরান ছিল সুখ্যাতি সম্পন্ন।"[১]

১৯৪৮ সালের জয়পূরে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল কংগ্রেসের ৫৫তম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে কংগ্রেসের তৎকালীণ চেয়ারম্যান ড. পাথবী সিতা রামাইয়া একই অভিমত ব্যক্ত করেন। নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

The Muslims had "enriched our culture, strengthened our administration, and brought near distant parts of the country ....It (the Muslim Period) touched deeply the social life and the literature of the land."

"মুসলমানগণ আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন, প্রশাসনকে সুসংহত করেছেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহকে একে অপরের সাথে সংযোগ সাধনে সফলতা অর্জন করেছেন। ভারতের সাহিত্য ও সামাজিক জীবনে তাদের প্রভাব সুগভীর।"[২]

---

[১] Jawaharlal Nehru, The Discvery of India, p. 219

[২] 'Presidential address of Dr. Pattabs.'

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদান ঃ

মুসলমানগণ ভারতবর্ষে ইউনানী চিকিৎসা নামক নতুন এক চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আসেন। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিস্কারের আগে রোগ নিরাময়ে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, অতি উন্নত ও বিজ্ঞান নির্ভর ছিল এ পদ্ধতি। ইরাক, ইরান ও তুর্কিস্তান তাদের সমৃদ্ধির যুগে ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির আর্ন্তজাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এখানেই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসক ও ভেষজ বিজ্ঞানী জন্ম নিয়েছিলেন। ভারতে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর শাসক বর্গের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অত্যাগ্রহ্ ও উদার পৃষ্ঠপোষকতার খবর দিকবিদিক ছড়িয়ে পড়লে ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী বিজ্ঞানীগণ একের পর এক ভারতে আসতে থাকেন। আগমনের এ ধারাবাহিকতা হিজরী সপ্তম শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ভারতের এসব অতিথি চিকিৎসক ও তাদের ছাত্রদের অভিজ্ঞতা, মেধা, একাগ্রতা ও মানবসেবার কারণে ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি অগ্রগতির তুঙ্গশৃঙ্গে পৌঁছে। ইউনানী পদ্ধতির অগ্রগতির সামনে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি সমূহ্ ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে। ভারতবর্ষের কোন শহর ইউনানী পদ্ধতির চিকিৎসা ছাড়া ছিল না। এ পদ্ধতি ছিল উন্নত, অধিকতর সাশ্রয়ী, সহজলভ্য এবং ভারতীয়দের মন-মেজায, পরিবেশ ও আবহাওয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ। ফলে অতিদ্রুত ভারতের সর্বত্র এ পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতীয় জনগণ বিশেষতঃ দরিদ্র শ্রেণীর চিকিৎসা সেবা প্রদানে বিস্ময়কর অবদান রাখে। ভারতীয় চিকিৎসকগণ তাদের অভিজ্ঞতা ও মেধা দিয়ে এ পদ্ধতিকে আরো গৌরবান্বিত করতে সমর্থ হয়েছেন। মুসলমানদের পতন যুগে দিল্লী ও লক্ষৌ ছিল ইউনানী চিকিৎসার বিখ্যাত কেন্দ্র এবং এখনো পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে এ পদ্ধতি বহুল প্রচলিত ও জনসমর্থিত।

মুসলমানদের ১০টি অবদান ঃ

প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ ড. স্যার যদুনাথ সরকার Islam in India শীর্ষক গ্রন্থে ভারতের জন্য মুসলমানদের প্রদত্ত ১০টি বড়

অবদানের কথা উল্লেখ করেন যার মধ্যে ৬টি নিম্নে উল্লিখিত হল, বাকীগুলো আগেই বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

১. বহির্বিশ্বের সাথে ভারতীয়দের সংযোগ সাধন।

২. রাজনৈতিক ঐক্য, সংস্কৃতি ও পোষাকে সঙ্গতি বিশেষতঃ উচ্চতর শ্রেণীতে।

৩. একটি সাধারণ সরকারী ভাষা, গদ্যের সহজ ও সরল রীতি যার উন্নয়নে হিন্দু মুসলিম উভয়ে অংশ নেন।

৪. কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আঞ্চলিক ভাষা সমূহের উৎকর্ষ সাধন যাতে শান্তি, সমৃদ্ধি ব্যাপকতর রূপ
ধারণ করে এবং সাহিত্য সংস্কৃতি উন্নয়নের সুযোগ লাভ করা যায়।

৫. সামুদ্রিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন যা মূলতঃ দাক্ষিণাত্যের জনগণের হাতে ছিল ; দীর্ঘদিন যাবত এ ব্যবসা বন্ধ ছিল।

৬. ভারতীয় নৌবহর গঠন।

বস্তুগত ও অধ্যাত্মিক অগ্রগতি ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের বস্তুগত ও অধ্যাত্মিক অবদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে প্রখ্যাত মুসলিম বিদ্বেষী লেখক ড. স্যার উইলিয়াম হান্টার বলেন ঃ

The Musalmans led several of these great land reclamation colonies to the southward, and have left their names in Eastern Bengal as the first dividers of the water from the land. The sportsman comes across their dykes, and metalled roads and mosques, and tanks, and tombs in the loneliest recesses of the jungle; and wherever they went, they spread their faith, partly by the sword , but chiefly by a bold appeal to the two great instincts of the popular heart. The Hindus had never admitted the amphibious population of the Delta within the pale of their community. The Muhammadens offered the plenary privileges of Islam to Brahman and outcaste alike.

'Down on your knees, every one of you,' preached these fierce missionaries, 'before the Almighty in whose eyes all men are equal, all created beings as the dust of earth. There is no god but the one God, and His Messenger is Muhammad.' The battle cry of the warrior became, as soon as the conquest was over, the text of the Divine.

" মুসলমানগণ দক্ষিণ অভিমূখে প্রাপ্ত বহুভূমিতে নতুন আবাদী গড়ে তুলেন এবং পূর্ববঙ্গেও সমুদ্র থেকে শুকনো ভূমিকে পৃথক করে কৃতিত্ব দেখান। কোন পর্যটক যদি উল্লিখিত অঞ্চল সমূহ পরিভ্রমণ করেন তাহলে আজো প্রত্যন্ত বনজঙ্গলে জলাধার, মসজিদ, পাকা সড়ক, বেড়ি বাঁধ, লক্ষ্য করবেন। তাঁরা যেখানেই গেছেন ধর্ম প্রচার করেছেন আংশিক তরবারীর সাহায্যে এবং প্রধানত মানব প্রকৃতির দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সহজাত প্রবৃত্তির সাহসী আন্দোলনের মাধ্যমে। হিন্দুরা গঙ্গা বদ্বীপের উভয় তীরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে ভ্রাতৃত্ববোধে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেনি। মুসলমানগণ ব্রাহ্মণ-অচ্যুৎ নির্বিশেষে সব মানুষের সামনে ইসলামের সামাজিক সাম্য ভিত্তিক সুবিধে তুলে ধরেন। ধর্ম প্রচারকগণ সব জায়গায় এ বাণী প্রচার করেন যে, প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর দরবারে মাথা নত করতে হবে। মহান আল্লাহর সামনে সব মানুষ সমান। ধূলিকণার ন্যায় সবাইকে আল্লাহ্ পয়দা করেছেন।"আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই; হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রসূল।" ঐ কালিমাই বিজয়ের পর বিজয় সাধনে রণযোদ্ধার ঐশী ও মুবারক শ্লোগানে পরিণত হয়।[১]

উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা ঃ

বিশিষ্ট ভারতীয় বুদ্ধিজীবি ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এন.এস. মেহতা Islam and the Indian Civilization নামক নিবন্ধে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি ইসলামের অবদান মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন ঃ

---

[১] W.W. Hunter, The Indian Musalmans, 1876. pp. 154-5

Islam had brought to India a luminous torch, which rescued humanity from darkness at a time when old civilizations were on the decline and lofty moral ideals had got reduced to empty intellectual concepts. As in other lands, so in India, too, the conquests of Islam were more widespread in the world of thought than in the world of politics. Today, also, the Islamic World is a spiritual brotherhood, which is held together by community of faith in the Oneness of God and human equality. Unfortunately, the history of Islam in this country remained tied up for centuries with that of government with the result that a veil was cast over its true spirit, and its fruits and blessings were hidden form the popular eye.

" ইসলাম ভারতবর্ষে একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা নিয়ে আসে, যা অন্ধকার থেকে মানবতাকে এমন সময়ে উদ্ধার করে যখন প্রাচীন সভ্যতা পতনোন্মুখ এবং উন্নত নৈতিক আদর্শ সমূহ কেবল নিরস বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণার মধ্যে সংকোচিত হয়ে পড়ে। অন্যান্য দেশের মত ভারতেও ইসলামের বিজয় রাজনীতির জগতের চাইতে বুদ্ধি ও চিন্তার জগতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। আজো মুসলিম বিশ্ব আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ব বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলমানগণ তাওহীদ ও মানুষের সমতাকে একত্রে আঁকড়ে ধরে আছে। দূর্ভাগ্যজনকভাবে এদেশে ইসলামের ইতিহাস শত বছর ধরে সরকারের সাথে সম্পৃক্ত। ফলে ইসলামের মূল চেতনায় পর্দা পড়ে গেছে এবং এর ফসল ও অবদানও জনগনের চোখের আড়ালে চলে গেছে।[১]

[১] মাওলানা সাইয়েদ সাবাহ উদ্দীন আবদুর রহমান সংকলিত 'হিন্দুস্তানকে আহদে উস্‌তা কি এক ঝলক' গ্রন্থে এন.এস. মেহতার নিবন্ধ' Islam and the India Civilization. পৃ. ৩১৬-৭

উপরিউক্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের প্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানগণ ভারতবর্ষকে যা দিয়েছেন তা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী কিন্তু তাদের তুলনায় ভারতবর্ষ মুসলমানদেরকে দিয়েছে কম। ভারতবর্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের আগমন ইতিহাসে এমন এক নতুন যুগের সুচনা করেছে যা শিক্ষা, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইতিহাস কখনো এটাকে ভুলতে পারে না।৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে সূফী-দরবেশ এবং ভারতীয় সমাজে তাঁদের প্রভাব

ভারত 'তাসাউফ' এর অন্যতম কেন্দ্র ও উৎসভূমি ঃ

তাসাউফের সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্রীয় ধারা প্রবাহ যদিও ভারতবর্ষের বাইরে সূচিত হয়েছে; কিন্তু তার অত্যধিক বিকাশ, জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন (ভারতের বিশেষ পটভূমি, পরিস্থিতি ও স্বভাব প্রকৃতির কারণে) হিন্দুস্তানেই সাধিত হয়। তাসাউফের এই বৈচিত্রপূর্ণ সিলসিলায় এমন কিছু ভারতীয় শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে যেগুলো স্বতন্ত্র ধারার অধিকারী এবং স্বকীয় পথ প্রণালীতে প্রবহমান। উপরন্তু তাদের মধ্যে এমন কিছু মুজতাহিদ ও ধর্মীয় সংস্কারকেরও আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক ও ইমামের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাসাউফের প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত সিলসিলা সমূহ যথা-তরীকায়ে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া ও সোহরাওয়ারদিয়া ভারতে আবির্ভূত হয়ে ব্যাপক উন্নতি ও পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত হয়েছে। সেগুলো ব্যতীত এমন কিছু সিলসিলাও বিদ্যমান যারা পরিপূর্ণরূপে ভারতেই জন্ম লাভ করেছেন এবং ভারতের মাটিতেই সমাহিত। যেমন-তরিকায়ে মদারিয়া, কালন্দারিয়া, শত্তারিয়া, ও মুজাদ্দেদিয়া। এ সব সিলসিলার সূত্রপাত ভারতে এবং অনন্তর তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র।

একাদশ শতাব্দী হতে বলতে গেলে ভারতই তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে পতাকাবাহীর ভূমিকা পালন করেছে। সে শতাব্দীতে ইমামে রব্বানী শায়খ আহমদ সারহিন্দি (রহ.) এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তান ও স্থলাভিষিক্ত খাজা মাসূম (রহ.) হতে উপকৃত হয়েছে সমগ্র বিশ্ব। তদুপরি খাজা মুহাম্মদ মাসূমের (রহ.) খলিফাগণ ছড়িয়ে পড়েছিলেন ভারত ভূ-খন্ডের বাইরে তথা আফগানিস্তান, ইরান ও তুরস্কে। শায়খ হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভীর (রহ.) খানকায় রোম, সিরিয়া, বাগদাদ, মিশর, চীন, আবিসিনিয়া, সমরকন্দ এবং বুখারার অধিবাসী পর্যন্ত দীক্ষিত হওয়ার লক্ষ্যে গমণ করত। তাঁর অন্যতম খলীফা মাওলানা খালিদ রুমীর (রহ.) মাধ্যমে এই অপূর্ব ধারা প্রসারিত হয় ইরাক, সিরিয়া, কুর্দিস্তান ও সুদূর

তুরস্কে। অদ্যাবধি সে সব দেশে এ সিলসিলা স্বমহিমায় বিদ্যমান। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) শায়খুল আরব ওয়াল আযম উপাধিতে ভূষিত হন। হেজাযবাসীরা এবং হেজাযে আগমণকারী অসংখ্য হাজীগণ তাঁর কাছে অধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। বর্তমান সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ভারতবর্ষের সুবাদে আত্মশুদ্ধির প্রদীপ ও দীপ্যমান খোদাপ্রেমের চর্চা বিদ্যমান। ভারতবর্ষ আজও এ বিষয়ের কতিপয় সুবিজ্ঞ ও একনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সারা বিশ্বের প্রাণকেন্দ্ররূপে চিরোন্নত এবং উৎসুক ও কৌতুহলী শিষ্যদের একমাত্র আশ্রয়ভূমি বলে সমাদৃত।

সূফী দর্শন ও সূফীসাধকদের সাথে মানুষের গভীর সম্পর্ক ঃ

ভারতবর্ষে মুসলিম যুগ সূচিত হয় সূফী সাধকদের অপূর্ব অবদানে। ভারবর্ষে সূফী-সাধকদের মাধ্যমেই ইসলামী যুগের গোড়াপত্তন ঘটে। বিশেষ করে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরীর (রহ.) নিঃস্বার্থ, শক্তিশালী ও দক্ষ হাতের প্রচেষ্টায় এখানে মুসলিম যুগের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনসাধারণ সে সব একনিষ্ঠ ও পূণ্যাত্মা সাধকগণ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রতি পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। উপমহাদেশের একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অসংখ্য খান্‌কাহ ও অধ্যাত্মিক কেন্দ্র খান্‌কা গড়ে উঠে। কেন্দ্রীয় শহরগুলোর বাইরে এমন কোন প্রদেশ বা অঞ্চল পাওয়া বিরল যা এ সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত ছিল। সেসব বুযুর্গ ও খানকা সমূহের প্রতি মানুষের যে পরমশক্তি, শ্রদ্ধা ও গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং তাঁদের প্রতি আকর্ষণের যে রূপ চিত্র ভেসে উঠেছিল; তার কিঞ্চিত ধারণা নিম্নের বিক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে সহজেই অনুমেয়।

"হযরত সাইয়্যেদ আদম বান্নুরী (রহ.) (মৃত্যু ঃ ১০৫৩ হি.) এর খানাকায় প্রতিদিন এক হাজার মানুষ হাযির হতো। খানাকাতেই তাঁরা দু' বেলা আহার সারতেন। এ সব মানুষের সাথে থাকতো শত শত আলেম। *'তাযকিরায়ে আদমিয়া'* নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তিনি ১০৫২ হিজরী সনে যখন লাহোর গমন করেন তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন অনেক শীর্ষস্থানীয়

নেতৃবৃন্দ, পীর-মাশায়েখ ও সর্বস্তরের জনসাধারণ। যাদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। সার্বক্ষণিক তাঁর সান্নিধ্যে থাকতেন জ্ঞান পিপাসু ও ভক্তদের এক বিশাল দল। যা আশঙ্কা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সম্রাট শাহজাহানের হৃদয়পটে। অতএব, সুকৌশলে তিনি কিছু অর্থ সম্পদ তাঁকে হাদিয়া দিয়ে বলেন, আপনি হারামাঈন শরীফে ফরয হজ্ব পালন করতে যান। অতএব, তিনি হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করেন।" মুজাদ্দিদ সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ খলিফা ও সাহেবজাদা মাসুম (রহ.) (মৃত্যু ঃ ১০৭৯ হি.) এর হাতে নয় লাখ লোক তাওবা ও বায়আত গ্রহণ করেন। তদুপরি, প্রায় সাত হাজার লোক খেলাফতে ভূষিত হন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান (রহ.) *'আছারুস্ সানাদীদ'* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বিশিষ্ট সূফী-সাধক হযরত শাহ গোলাম আলী (রহ.) এর সুবিশাল খান্‌কায় প্রায় পাঁচশ'জন ফকীর মিসকীন অবস্থান করতেন। সকলের খাওয়া দাওয়া পোষণ অর্পিত ছিল তাঁর দায়িত্বে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত সংস্কারক ও শায়খে তরীকত হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের (রহ.) প্রতি সাধারণ মানুষের আনাগোনা, ভক্তদের স্রোতপ্রবাহ ও গণজোয়ার ছিল অদ্বিতীয় ও অনন্য। তিনি আত্মশুদ্ধির মিশন ও হজ্বযাত্রার উদ্দেশ্যে নগর ও জনপদ অতিক্রমকালীন পুরো এলাকার দু'একজন ব্যতীত সকল অধিবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাওবা ও বায়আতের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। এলাহাবাদ, মির্যাপুর, বেনারস, গাজীপুর, আজীমাবাদ, পাটনা ও কলকাতায় সামগ্রিকভাবে প্রায় কয়েক লাখ মুসলমান বায়আত ও তাওবা করেছিলেন। ধর্মের প্রতি জনগণের যে সার্বিক গুরুত্বানুধাবন ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার পরিলক্ষিত হয়েছিল তা নিম্নের বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমেয়। উল্লেখ্য যে, বেনারস হাসপাতালের রোগীরা খবর পাঠান, "আমরা পীড়িত ও রুগ্ন হওয়াতে আপনার কাছে যেতে অক্ষম। তাই আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি এখানে আসতে পারলে আমরা বায়আত হতে আগ্রহী। অতঃপর তিনি কলকাতায় দুইমাস যাবৎ অবস্থান করেন। প্রত্যেহ প্রায় এক হাজার লোক তাঁর বায়আত গ্রহনে ধন্য হত এবং তা উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে থাকে। অধিকহারে বায়'আত গ্রহনের সূচী ছিল নিম্নরূপ ঃ

সকাল হতে মধ্য রাত পর্যন্ত ভিড় থাকত নারী-পুরুষের। নামায, খাওয়া-দাওয়া ও মানবিক চাহিদার কার্যাবলী ব্যতীত আর কিছুই করার সুযোগ তাঁর হত না। মাথা পিছু বায়আত করানো তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই সকল বায়'আত প্রত্যাশী একটি বিশাল প্রান্তরে সমবেত হলে তিনি তাশরীফ নিতেন এবং সাত বা আটটি পাগড়ি খুলে তাঁদের হাতে প্রদান করতেন। ভক্তরা তা সশ্রদ্ধে টেনে নিতেন। তিনি উচ্চঃস্বরে আযানের শব্দাবলী উচ্চারণ করাতেন। প্রত্যহ প্রায় সতের-আটার বার এ আগমন ও কর্মধারা সুচারুরূপে পরিলক্ষিত হত।

জীবন ও সমাজের উপর প্রভাব ঃ

যারা পীর-মাশায়েখদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করতো তাদেরকে তাঁরা যাবতীয় পাপ থেকে তাওবা করাতেন। আল্লাহর অনুকরণ ও রাসূলের অনুসরণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিতেন। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, দুশ্চরিত্র, নির্যাতন, সীমালঙ্গন, জনগণের তথা বান্দার হক সমূহের বিনষ্টকরণ থেকে বিরত থাকার তাকিদ দিতেন। সচ্চরিত্র অবলম্বন, দুশ্চরিত্র (তথা-হিংসা বিদ্বেষ, অহঙ্কার, সম্পদের লোভ ও সম্মানপ্রীতি) বর্জন ও শান্তি স্থাপনের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা, সমাজ হিতৈষণা, জনসেবা, পরোপকার, অন্যের অগ্রাধিকার ও অল্পেতুষ্টির শিক্ষা দিতেন। উপরন্তু এই বায়আত সাধারণতঃ স্বাভাবিক ভাবে এক বিশেষ ও গভীর সম্পর্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলো- তিনি সকল আগন্তুক ও যাত্রীর প্রতি উপদেশ দিতেন। তাদের অন্তরে আল্লাহর প্রেম-প্রীতি, তাঁর সন্তুষ্টির প্রতি উৎসাহ, উদ্দীপনা, অনুপ্রেরণা এবং অবস্থার সংশোধনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াস চালাতেন। তাঁর একনিষ্ঠতা, অনুপম চরিত্র, শিক্ষা, তত্ত্বাবধান ও সান্নিধ্যের যে প্রভাব স্বাভাবিক জীবন ও সমাজে পড়েছিল তার এক বাস্তব চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হল। ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা কাজী যিয়াউদ্দীন বারনী আলাঈ যুগের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন ঃ

"সুলতান আলাউদ্দীন আমলে মাশায়েখদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম নিজামুদ্দীন, শায়খুল ইসলাম আলাউদ্দীন, শায়খুল ইসলাম রুকুন উদ্দীনের মাধ্যমে তাসাউফের সিংহাসন সজ্জিত ছিল। পৃথিবী তাঁদের বরকতময় শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা আলোকিত ও প্রাণবন্ত হয়। সমগ্র বিশ্ব তাঁদের কাছে

সানন্দে বায়'আত ও তাওবা গ্রহণ করে। বিপুল সংখ্যক পাপাচারী, বেনামাযী মন্দকাজ বর্জন এবং স্থায়ী মুসল্লির তালিকাভূক্ত হয়ে যায়। আন্ত রিকভাবে তারা ধর্মীয় কাজ-কর্মে আগ্রহ প্রকাশ করে। যার ফলশ্রুতিতে তাদের তাওবা খাঁটি ও যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়। পার্থিব জগতের প্রলোভন ও আসক্তি (যা মূলতঃ মানুষের লাভ ও লোক পুজার উৎস) পীর-মাশায়েখদের সচ্চরিত্র ও দুনিয়া বিমূখতা দেখে তা তাদের অন্তর থেকে হ্রাস পেতে থাকে। বুযুর্গদের ইবাদত ও পারস্পরিক সম্পর্কের বরকতে লোকদের মানসপটে স্থান পেয়েছে সততা ও অকৃত্রিমতা। তাঁদের মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী ও চেষ্টা,সাধনার প্রভাবে খোদাভীরুদের অন্তরে স্বভাব-চরিত্র পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে।"

তিনি আরো বলেন ঃ "আলাঈ আমলের শেষ দিকে সুরা-মদ, প্রেম-প্রণয়, পাপ-অনাচার, জুয়া, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার নামও অধিকাংশ মানুষের মুখে শোনা যায়নি। বড় বড় পাপ সমূহ মানুষের কাছে কুফর সদৃশ মনে হত। মুসলমানরা পরস্পর লজ্জার বশবর্তী হয়ে প্রকাশ্যে সুদের লেনদেন ও মালামাল মজুদ করতে সাহস করত না। দোকানদারের মিথ্যা কথন, মাপে ও ওজনে কম দেয়া ও ভেজাল মিশ্রণের অবসান ঘটলো।[১]"

তরীকতের মাশায়েখ স্বীয় নব মুরিদগণের প্রতি লেন-দেনে স্বচ্ছতা, পাওনাদারদের প্রাপ্য পরিশোধ আর তার দায়িত্বে যদি অন্যের কিছু দাবি-আবদার অসম্পূর্ণ থাকে তা আদায় করার বিশেষ তাগিদ দিতেন। সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নিজামুদ্দীনকেও (রহ.) স্বীয় শায়খ খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জশকর (রহ.) এ মর্মে তাগিদ দেন যে, "প্রতিপক্ষকে খুশি করা ও পাওনাদারকে সন্তুষ্ট রাখতে যেন বিন্দুমাত্র অবহেলা না করো।" তিনি জনৈক ব্যক্তির কাছে বিশ জিতলের ঋণী ছিলেন। আরেকজন থেকে ধার নেয়া একটি কিতাব হারিয়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর তিনি দিল্লি পদার্পন করে প্রথম ব্যক্তির নিকট ঋণ পরিশোধ করার জন্য গেলে সে বলল, মনে হয় আপনি মুসলমানের কাছ থেকে আসছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে গেলে তিনি সে বলল, হ্যাঁ আপনি যেখান থেকে আসছেন সেখানকার

---

[১] বাযমে সূফীয়া, পৃ. ১৯৮-২০২

ফলাফল এরূপ হওয়াই বাঞ্চনীয়।"[১] এসব পীর-মাশায়েখদের সাহচর্য ও পরিচর্যার ফলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের পার্থক্য ব্যতিরেকে এক অপরের সেবা-শুশ্রুষা ও সহযোগিতা করার আগ্রহ ও মানসিকতা সৃষ্টি হয়। হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.) বিপুল সংখ্যক সফরসঙ্গী নিয়ে যখন হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন, দীর্ঘ ও কষ্টকর সফরে প্রয়োজন বশত কোন কাজ সম্পাদন করতে হলে তাতে তিনি লজ্জাবোধ করতেন না। তাঁর এই সফর ছিল গঙ্গা নদীর নৌপথে। মির্যাপুর ঘাটে ছিল তুলাভর্তি নৌকা। তুলার মালিক শ্রমিকদের অপেক্ষায় ছিল; যেন তুলাগুলি বোঝাই করে গুদামে নিয়ে যাওয়া হয়। সাইয়্যেদ সাহেব সাথীদের নিয়ে তুলার বস্তা নামিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলে শত শত মানুষ নৌকায় ঝাপিয়ে পড়ে এবং দু'ঘন্টার মধ্যে নৌকা খালি করে তুলা গুদামের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। জনসাধারণ এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যায়। পরস্পর বলাবলি করতে লাগল "এরাতো আজব লোক! তুলার মালিকের সাথে কোন পূর্বপরিচিতি নেই; একমাত্র আল্লাহর খাতিরেই তারা অনেক কাজ বিনা পারিশ্রমিকে সম্পন্ন করে দিল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ হবে"। [২]

ধারাবাহিকভাবে এই পীর-মাশায়েখদের কৃতিত্ব ও অবদানের বর্ণনা দেওয়া অতি দুষ্কর। তজ্জন্যে প্রয়োজন বিশাল গ্রন্থের। ভারতবর্ষে সমৃদ্ধ ও সুশীল প্রাণবন্ত সমাজ গঠনে (যা ঐ রাষ্ট্রের প্রধান নৈতিক ও চারিত্রিক সম্বল; নিঃস্বার্থ মানবতার সেবক ও সৎ শাসকদের প্রাণকেন্দ্র ; এবং যার দরুণ ভারত ভূ-খন্ড প্রতি সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে সুযোগ্য মনীষীদের উপহার লাভ করে) সেই নিঃস্বার্থ সংস্কারকগণ ও চরিত্র বিনির্মাণকারীদের বিরাট অবদান রয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর ঘটনাবলী বিশদ বিবরণ তরীকতের মাশায়েখ আলোচনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্যতম পথপ্রদর্শক হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর ধর্মীয় ও চারিত্রিক প্রভাবের আলোচনা দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করছি। সাইয়্যেদ সাহেবের হজ্ব যাত্রার আলোচনা পর্বে জনৈক ইতিহাসবিদ বলেনঃ "একদা কলকাতায়

---

[১] ফাওয়াইদুল ফুয়াদ্, পৃ.১৪

[২] সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ,পৃ.২৪৯

এক মুহূর্তের মধ্যে মদ বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। দোকানদাররা ইংরেজ সরকারের কাছে অভিযোগ জানায়, আমরা বিনা দ্বিধায় সরকারের কর আদায় করে থাকি কিন্তু অধুনা আমাদের দোকান-পাট অচল। জনৈক বুযুর্গ সদলবলে এই নগরে পদার্পন করলে শহর গ্রামের সমুদয় মানুষ তাঁর হাতে মুরীদ হয়ে যায় এবং প্রত্যহ মুরীদ হতে চলেছে। তারা যাবতীয় নেশাদায়ক দ্রব্যাদি থেকে তাওবা করছে যার ফলশ্রুতিতে তারা এখন আমাদের মদ্য বিপনীর ধারে কাছেও যায় না।"[১] তরীকতের মাশায়েখ, আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশক এবং তাঁদের চেষ্টা প্রচেষ্টার দরুণ আপামর জনসাধারণ যে সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছিল এবং অসদাচরণ ও অপকর্ম থেকে বিরত ছিল তা একমাত্র তাঁদের নৈতিকতা ও অধ্যাত্মিকতারই ফসল। বিশ্বের কোন প্রতিষ্ঠান, সংবিধান এতো বিপুল সংখ্যক মানুষকে যেমন প্রভাবান্বিত করতে পারে না, তেমনি স্থায়ী কোন নৈতিকতা ও আইন-কানুনের সেতু বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে পারে না।

নির্ভিকতা ও সত্য কথন ঃ

সেই অধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকদের এক অনন্য খিদমত ও কৃতিত্ব ছিল- তাঁরা স্বৈরাচারী সম্রাট জালিম শাসকদের ভুল-ত্রুটি, ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ ও সীমালঙ্ঘনকারী বিষয়াবলীর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাদের সম্মুখে হক কথা ব্যক্ত করেন এবং তাঁদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে সরকার ও সমাজকে বিপজ্জনক পরিণতি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁদের নিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ, অকৃত্রিম ও নিঁখুত গুণাবলীর দরুণ জনমনে সাহস, বিক্রম, নিরাপত্তাবোধ ও বীরত্ব সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের ইসলামী যুগে এরূপ অজস্র দৃষ্টান্তও রয়েছে যে, পীর-মাশায়েখ ও তাঁদের খলিফাগণ মাথায় কাফন বেঁধে এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে *"জালিম সরকারের বিরুদ্ধে সত্য কথনই সর্বোত্তম জিহাদ"* এ হাদীসটি মুতাবিক আমল করতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। নিম্নে মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলের মাত্র দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হলো ঃ মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলে শেখ কুতুব উদ্দীন মুনাওয়ার ছিলেন এক নিভৃতচারী ও চিশতী তরিকার সাধক ও দরবেশ। একদা বাদশাহ্ তাঁর এলাকায়

---

[১] ওকায়ে আহমদী

আসলে তিনি অভিবাদন জানানোর জন্যে উপস্থিত হননি। ফলে বাদশাহ তাঁকে দিল্লিতে তলব করেন। তিনি রাজপ্রাসাদের অলিন্দে পদার্পন করলেই সেনাপতি, অমাত্য ও প্রহরীগণ দু'প্রান্তে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ছিল। তাঁর পুত্র নুরুদ্দীন ছিল অল্প বয়সের। শাহী দরবারের আড়ম্বরতা কখনো সে প্রত্যক্ষ করেনি বিধায় সে ভয় পেয়ে যায়। শেখ কুতুবউদ্দীন তাকে ডেকে বলেন, বাবা নুরুদ্দীন! *'আল আযমাতু লিল্লাহ্'* অর্থাৎ মহত্ত্ব ও জাঁকজমক কেবল মাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য সংরক্ষিত। সাহেবজাদা বর্ণনা দেন যে, এ বাক্য শ্রবণমাত্র আমার অন্তরে যেন এক বিশেষ শক্তি-প্রবাহ সৃষ্টি হয়। ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়ে যায়। যে সব সেনাপতি ও শাসকবৃন্দ তথায় দাঁড়ানো ছিলেন তাদেরকে আমার মেষ সদৃশ মনে হল। বাদশাহ অভিযোগ করলেন, আমি আপনার কাছে গেলে আমার কোন খোঁজ-খবর নেননি; আমার প্রতি সাক্ষাতের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করেননি। উত্তরে শেখ বললেন, আমার মত একজন নগন্য দরবেশ আপনার সাক্ষাত করার অযোগ্য মনে করি, নির্জনে বসে বাদশাহ্ ও মুসলমানদের জন্য দোয়ায় মনোনিবেশ থাকি। অতএব, আমাকে অপারগ মনে করবেন। সাক্ষাৎ পর্ব শেষে সম্রাট এক আমীরকে বলেন, যেসব বুযুর্গের সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে এবং যাদের সাথে আমি করমর্দন করেছি তাঁদের হাতে ছিল এক ধরনের কম্পন ও শিহরণ (বিনয় ভাব)। কিন্তু শেখ মুনাওয়ার এত শক্ত ও স্বাভাবিকভাবে করমর্দন করেন যে, তাঁর হাতের শিহরণের রেশ ও চিহ্ন বলতে নেই। বাদশাহ্ তাঁর খিদমতে একলাখ টংকা (তৎকালীণ মুদ্রা) উপঢৌকন পেশ করেন। শেখ আশ্চর্য হয়ে বলেন, সুবহানাল্লাহ্! (আল্লাহ কত মহান/ কত পবিত্র!) দরবেশের জন্য দু' সের চাল, ডাল ও এক পয়সার ঘিই যথেষ্ট। সে এত সহস্র মুদ্রা দিয়ে কি করবে? অনেক প্রচেষ্টা ও কৌশল চালিয়ে এমনকি বাদশাহ্ মনক্ষুন্ন হবেন একথা বললে পরিশেষে তিনি দু'হাজার টংকা গ্রহণ করেন। তাও তিনি তরীকতের সাথীদের ও নিঃস্ব-অনাথদের মাঝে বণ্টন করে দেন।[১] দ্বিতীয় কাহিনী মাওলানা ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) এর। তিনি সম্রাটের সাহচর্য থেকে দূরে থাকা পছন্দ করতেন। তিনি বারংবার বলতেন যে, আমার শির ওই ব্যক্তির দরবারে কর্তিত ও পতিতাবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ হক কথা বলা থেকে আদৌ

---

[১] সীয়ারুল আউলিয়া, পৃ.২৫৩-৫

পিছপা হবনা, আর তিনিও আমাকে রেহাই দেবেন না। পরবর্তীতে বাদশাহর দরবারে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাদশাহ কিছু নসীহত করতে বললে তিনি বলেন, রাগ দমন করুন। বাদশাহ জানতে চাইলেন, কোন ধরণের রাগ ? তিনি বলেন, পশু সুলভ রাগ। তাতে বাদশাহর চেহারা মলিন হয়ে যায় তবে কিছু বলেননি।

মাওলানা সাহেবকে বাদশাহ নিজ প্লেটে শরীক করেন এবং স্বহস্তে কিছু গ্রাসও তুলে দেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি আহার সম্পন্ন করেন। অতঃপর বাদশাহ তাঁকে বিদায় দেন। [১]

এসব পীর-মাশায়েখ, স্বৈরাচারী রাজাদের শাসনামলে নিজেদের নিস্বার্থপরতা, নির্ভিকতা ও সত্য কথা বলার প্রথা চালু রাখেন। স্বাভাবিক অবস্থায় উলামা-মাশায়েখকে রেহাই না দিলেও তাঁদেরকে দেয়া হত এক বিশেষ সুযোগ। যাতে ফরয আদায় করতে পারে সে সুযোগ দেয়া হত। মুসলিম শাসনের পতনকালে দিল্লির পীর মাশায়েখগণ নিজের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যকে হাতছাড়া হতে দেননি। সম্রাট শাহ আলম একদা খাজা মীর দরদ (রহ.) এর যিক্‌র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। ব্যথার কারনে পা দুটো লম্বা করে দেন। কিন্তু সে বেআদবী খাজা সাহেবের সহ্য হলোনা। অবশেষে তিনি বলেনঃ আপনার এই আচরণ ফকীরের অনুষ্ঠানের নিয়ম বহির্ভূত। বাদশাহ অপারগতা প্রকাশ করে ক্ষমা চান। প্রত্যুত্তরে খাজা সাহেব বললেন, আপনি যদি অসুস্থই হন তাহলে কষ্ট করে এখানে আসার প্রয়োজন কী ? [২]

সাধনা ও স্বাবলম্বন ঃ

এসব সূফী দরবেশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পদ, সরদার ও বিত্তবানদের মূল্যবান উপঢৌকন ও ভূসম্পত্তি গ্রহণ করা থেকে প্রায় বিরত থাকতেন। তাঁরা সাধনা, আত্মনির্ভরশীলতা, অল্পতুষ্টি ও আল্লাহ ভরসা, আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস ও আত্মপরিচিতির এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা ভারতীয় সমাজে কর্মদক্ষতা, অপূর্ব সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার গুণাবলী ও উপাদান সমূহের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। তাঁরা মানবতার সুনাম ও সুখ্যাতিকে সতত

---

[১] সীয়ারুল আউলিয়া, পৃ.২৭১-২

[২] গুল-ই-রা'য়না, পৃ.১৭১।

সুদৃঢ় ও অক্ষুন্ন রাখেন লাভ-লোকসানের বিপনিতে, যেখানে মানুষের ক্রয়-বিক্রয়ও হয়ে থাকে। তাঁদের জীবনের নীতিমালা ও শ্লোগান ছিল নিম্নরূপ ঃ

"আমি স্বীয় ফকিরী পোষাককে রাজা-বাদশাহদের মুকুটের বদলে প্রদান করতে প্রস্তুত নই। আমি আমার দরিদ্রতাকে সুলাইমানী রাজত্বের বিনিময়ে হস্তান্তর করতে রাজী নই। দারিদ্র্যের কষাঘাতে অন্তরে আমি যে তৃপ্তি পেয়েছি, তা রাজা-বাদশাহদের আরাম আয়েশের বিনিময়ে আদৌ অর্পন করব না।"

ভারতবর্ষে সূফীবাদ ও তাসাউফের ইতিহাস সাধনা, আত্মপ্রত্যয়, আত্মপরিচিতি, পরার্থ ও আত্মোৎসর্গের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ ও ব্যাপৃত। কোন তরীকতের সিলসিলা এবং তাসাউফের ইতিহাস সেসব আদর্শ থেকে শূন্য নয়। তবে এ ক্ষেত্রে মাত্র দু'শতাব্দীর (ত্রয়োদশ-চতুর্দশ) কতিপয় ঘটনাবলী প্রদত্ত হলো যা সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের সাথে সম্পর্কিত। যেখানে বস্তুবাদ ও ভোগবাদ স্বীয় শিকড়কে মযবুত করার সুযোগ পেয়েছে। নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া সিলসিলায় হযরত মির্যা জানে জানাঁ দেহলভী (রহ.) নামক এক বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তদানীন্তন দিল্লির বাদশাহ সংবাদ পাঠান যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে বিশাল রাজত্ব দান করেছেন; আপনি তাঁর কিছু অংশ গ্রহণ করুন। উত্তরে তিনি বললেন, মহান আল্লাহ সপ্ত পৃথিবীকে *'মাতা'উদ্দুনিয়া কৃলীল'* তথা পার্থিব সামগ্রী ক্ষুদ্র ও সীমিত বলে ঘোষণা করেন। অতএব, এক সপ্তমাংশের ন্যূনতম অংশ আপনার কর্তৃত্বে এলে আমি সেদিকে লোভের হস্ত সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন কী ? একদা নওয়াব আসিফ জাহ্ বিশ হাজার টাকা হাদিয়া দিলে তিনি তা প্রত্যখ্যান করেন। নওয়াব তা গরীবদের মাঝে বণ্টন করতে বললে তিনি বলেন, সে যোগ্যতা আমার নেই। এখান থেকে বেরিয়ে আপনি নিজেই বন্টন করতে থাকুন, ঘরে পৌঁছতে পৌঁছতে বিলি হয়ে যাবে অথবা ওখানে গিয়ে বন্টন সমাপ্ত করুন। টুংকু রাজ্যের শাসক নওয়াব মীর খান একদা হযরত গোলাম আলী দেহলভী (রহ.) এর খানকাহ্ শরীফের বার্ষিক ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি মোটা অংকের অনুদান দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি বলেন ঃ 'দরিদ্রতা ও সন্তুষ্টির মুখোশ উন্মোচন করতে চাই না। নওয়াব মীর খানকে জানিয়ে

দাও, রিয্ক একমাত্র আল্লাহর হাতে। একদা হযরত মাওলানা ফযলে রাহমান গঞ্জেমুরাবাদী (রহ.) (মৃত্যু ঃ ১৩১৩ হি.) এর দরবারে এক গভর্ণরের আগমন ঘটে। তিনি হুজুরের মুখে চরিত্র সংক্রান্ত বয়ান শুনে মুগ্ধ হয়ে বল্লেন, হুজুর! আপনার সম্মতি পেলে সরকারী তহবিল থেকে আপনার খানকার নামে কিছু অনুদান বরাদ্দ করে দিব। উত্তরে তিনি বলেন, "আমি আপনাদের সরকারী অর্থ নিয়ে কী করব? আল্লাহ তা'য়ালার অনুকম্পায় আমার সম্বল হল- রশির তৈরী একটি খাঁটি, মৃত্তিকার দু'টি লোটা ও দু'টি কলসি। আমার শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ ভুট্টা নিয়ে আসে; তা দিয়ে রুটি বানানো হয়। আমার পত্নী অল্প শাক-সবজী বা ডাল রান্না করে; তা দিয়ে খাবার সেরে নিই। হযরত মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ সাহেব বলেন, রামপুর প্রশাসক নওয়াব কলবে আলী খান একদা আগ্রহ ব্যক্ত করেন যেন রামপুরের মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেব তথায় তাশরীফ নেন। সে ক্ষেত্রে তিনি নওয়াব সাহেবকে বলেন, আপনি কী নযরানা পেশ করবেন? তিনি বললেন, একলাখ টাকা। তখন মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ্ সাহেব মুরাদাবাদ পৌঁছে আরয করেন, হুজুর ! রামপুরে তাশরীফ নেন। সেখানকার প্রশাসক নওয়াব কলবে আলী খান আপনার অন্ধ ভক্ত। তদুপরি এক লাখ টাকা হাদিয়া দেবেন। হুজুর স্বাভাবিক নিয়মে সংলাপ করতে থাকেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আলাপ হলে তা সাধারণ কথা রূপে উড়িয়ে দেন এবং বলেন, আরো মিঞা! লাখ টাকা ডাস্টবিনে নিক্ষেপ কর এবং জেনে রেখো ঃ *'যে অন্তরে দয়ার্দ্রতার প্রকাশ পায় , সে অন্তর রাজকীয় অর্থভান্ডারের চাইতেও উত্তম।'*

জ্ঞানের বিকাশ সাধন ঃ

ভারত বর্ষের পীর-মাশায়েখগণ সর্বদা জ্ঞানের পৃষ্টপোষক ও আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের অনেকেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও জ্ঞানের আধার ছিলেন। প্রথম দিন থেকেই জ্ঞানের প্রতি তাঁদের প্রতি আস্থা ছিল সুদৃঢ় এবং তারা বিশ্বাস করতেন 'জ্ঞানহীন ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পারে না।' যেহেতু মূর্খ সূফী শয়তানের পুতুলের নামান্তর; সেহেতু অনেক যোগ্য ও মেধাবী ছাত্ররা জ্ঞানার্জন সম্পন্ন না করা পর্যন্ত পীর-মাশায়েখগণ তাদেরকে খিলাফত প্রদান করতেন না। যার বিবরণ এই

কিতাবের অন্যত্র দেয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে শিক্ষার বিকাশ ও জ্ঞানের চর্চা মূলতঃ তরীকতের পীর-মাশায়েখের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদানের ফলশ্রুতি। চতুর্দশ শতাব্দীর দু'জন বিখ্যাত পন্ডিত ও গবেষক কাযী আবদুল মুকতাদির কিন্দী এবং শায়খ আহমদ থানেশ্বরী ছিলেন খাজা নাসিরুদ্দীন চেরাগ-ই-দেহলভীর আধ্যাত্মিক শিষ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত উস্তাদ মাওলানা লুতফুল্লাহ্ কুয়েলীর শিষ্যবৃন্দ ও শিষ্যদের শিষ্যকুলের শিক্ষা-দীক্ষার ধারাবাহিকতা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। চিশতী তরীকতের উপরিউক্ত পীর ও বুযুর্গের গভীর সম্পর্ক ছিল খানকাহ্ ও মাদ্রাসার সাথে। এককথায় পীর-দরবেশ ও খানকাহ-মাদ্রাসা ছিল একে অপরের পরিপূরক ও সম্পূরক। জৈনপুরের খানকায়ে রশীদিয়া, লক্ষ্ণৌর মাওলানা পীর মুহাম্মদ সাহেবের মাদ্রাসা, দিল্লির হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভীর শিক্ষাঙ্গণ এবং গাঙ্গুহে মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেবের খানকাহ তার অনন্য উদাহরণ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পরোপকার ঃ

এ সব পীর-মাশায়েখ ও খানাকাহের মাধ্যমে অনেক আল্লাহর বান্দাদের অভাব বিমোচন হতো; অজস্র পরিবার ও ঘর-বাড়িতে জলে উঠতো প্রদীপ, গরম হতো চুলা ও উনুন। বিপুল সংখ্যক মানুষ খানকাতে খেয়ে উদরপূর্তি করতো, বিভিন্ন প্রকারের উপাদেয় খাবারের স্বাদ আস্বাদন করতো। সূফী সাধকদের খাবারের বিছানায় শত্রু-মিত্র, আত্মীয়-অনাত্মীয়, ধনী-দরিদ্র ও দেশী-বিদেশীর কোন ভেদাভেদ ছিল না। খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহ.) এর খাবারের আসরে মহার্ঘ ও বিপুল পরিমাণ খাদ্য আইটেমের কারণে প্রবাদতুল্য ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ শেখ সাইফুদ্দীন সিরহিন্দী (রহ.) এর খানকায় প্রত্যেহ দু'বেলায় এক হাজারের বেশী লোক ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী খাবার গ্রহণ করতো।[১] সাইয়েদ মুহাম্মদ সাঈদ আকন্দ প্রকাশ 'শাহ ভীক' নামক সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিশতী তরিকার এক সাধক সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার বর্ণনা করেন যে, তাঁর যিক্‌র ও সাধনায় স্থায়ীভাবে প্রায় পাঁচশ'জনের ভক্তদল তথায়

---

[১] নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫খন্ড।

আসা-যাওয়ায় থাকত এভাবে প্রায় এক হাজার লোক তাঁর সাথে আহার গ্রহণ করতেন নিয়মিত। তিন হাজারী সৈন্যের মনসবদার ও দিল্লির সম্রাট ফররুখ শিয়রের অনুগ্রহভাজন জমিদার একদা খানকা সংস্কারের জন্যে সত্তর হাজার টাকা হাদিয়া পেশ করেন। তখন হুজুর ওগুলো আপাতত রেখে দিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার নির্দেশ দেন। বিকাল বেলা মিস্ত্রিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা হবে। রওশনদ্দৌলা যখন বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন, শাহভীক তখন দরবেশদের ডেকে সমুদয় অর্থ আম্বালা, থানেশ্বর,সিরহিন্দ ও পানিপথ শহরের বিধবা নারী ও গরীব-দুঃখীর গৃহে পাঠিয়ে দেন। এমনকি একটি টাকা অবশিষ্ট ছিল না। অতপর তাঁকে বলেন, আপনার প্রদত্ত টাকাগুলো নিঃস্ব ও সাধকদের দেয়াতে আপনিও মহাপূণ্যের অধিকারী হয়েছেন। খানকার নির্মাণকাজে আদৌ কি সে সওয়াব অর্জিত হতো ? আমার মত সাধারণ মানুষের জন্য প্রাসাদুপম অট্টালিকার কী দরকার ? একদা সম্রাট মুহাম্মদ ফররুখ শিয়র নওয়াব রাওশনদ্দৌলা ও নওয়াব আবদুল্লাহ্ খানের পক্ষ থেকে পত্রাবলী ও তিন লাখ টাকার চেক আসে। কিন্তু হুজুরের নির্দেশক্রমে সমুদয় অর্থ পার্শ্ববর্তী এলাকার গরীব-দুঃখীদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়।[1] মাওলানা মানাযির হাসান গীলানী (রহ.) সঠিক বলেছেন: 'ইসলামের এসব সূফীদের খানকাহ সমূহ ধনী ও নিঃস্বদের মাঝে সেতু বন্ধনের কাজ দিতো। এসব বুযুর্গদের দরবার এমন ছিল যে, ক্ষমতাসীন রাজা-বাদশাহগণও কর প্রদান করতেন। সুলতানুল মাশায়েখের ঘটনা পর্যালোচনা করুন। যুবরাজ খিযির খান পর্যন্ত সে দরবারে সেবক হিসেবে নিয়োজিত থাকতেন। সুলতান আলাউদ্দীন সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে কর আদায় করতেন। কিন্তু একটি কোষাগার এমনও ছিল যেখানে তাঁকেও রাজস্ব প্রদান করতে হত। এ খানকাহ হতে দেশের সাধারণ গরীব-মিসকীনদের নিকট তাদের ন্যায্য অংশ পাঠানো হতো। এটাই নিম্নের প্রসিদ্ধ বাক্যের মর্মার্থ ঃ *'মালে সুফী সাবিল আস্ত'* 'অর্থাৎ সুফী দরবেশদের অর্থ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফকৃত।' ধনী-গরীবের এ মোহনা অর্থাৎ নিঃস্বার্থ সূফী-দরবেশদের দরবারে ধনী-নির্ধন আমীর-ফকীর উভয়ই একই মর্যাদায় হাযির থাকতেন। তাতে গরীব ও দুঃস্থ মুসলমানদের বিপুল অভাব লাঘব হতো। ইসলামী যুগের কোন কাল এবং

[1] মানাযির আহসান গিলানী, নিযাম-ই-তা'লীম ওয়া তারবিয়াত, ২য় খন্ড, পৃ.২২১-২।

তখনকার ভারতবর্ষের এমন কোন এলাকা ও প্রদেশ ছিল না যেখানে সত্যবাদিতা ও আত্মশুদ্ধিতার এ দল নবীজির অপূর্ব বাণী *'যাকাতের মাল বিত্তবানদের কাছ থেকে নিয়ে ফকীর-মিসকীনদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।"* সে মুতাবিক নিবেদিত প্রাণ ছিলেন না। বিশেষতঃ আমীর-ওমরাহ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের যে সব বুযুর্গদের কোন না কোন কারণে প্রভাব ছিল সেখানে গরীব দুঃখীদের ভাগ্য পরিবর্তন না হয়ে পারেনি।[1]

মানবতার আশ্রয়স্থলঃ

এ সব সুফীয়ায়ে কেরামের শিক্ষা ও সাহচর্যের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ ও জাতীয়তা নির্বিশেষে সব মানুষকে ভালবাসার, তাদের দুঃখে ব্যথিত হওয়ার উদ্দীপনা তৈরী হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিম্নোক্ত অমরবাণীর প্রতি তাঁদের আমল ছিল সুদৃঢ় ঃ

"সৃষ্টিকুল আল্লাহর পরিবার-পরিজন সদৃশ। অতএব, তাদের মধ্যে সেই আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয় যে আল্লাহর পরিবারের নিতান্ত হিতকারী।" এসব পীর-মাশায়েখ ছিলেন গোটা দুনিয়ার মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া (রহ.) একদা নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, 'কোন মানুষ যখন আমার কাছে এসে নিজের সমস্যাবলী ব্যক্ত করে তখন আমিও তাঁর মত ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। কেয়ামতের দিন পরের সন্তুষ্টি ও সেবার ইচ্ছার চাইতে অধিকতর মূল্যবান আর কোন আমল থাকবে না।' যার ফলে এ সব খানকায় ভগ্নহৃদয়ের অধিকারী মানুষের আশ্রয় মিলতো, মিলতো ব্যথার উপশমও। যারা সরকার, সমাজ, গোষ্ঠী কর্তৃক বিতাড়িত হতো, আত্মীয়-স্বজন এমন কি অনেক সময় নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের কাছেও হত উপেক্ষিত ; তারা সে সব বুযর্গদের পায়ে লুটিয়ে পড়ত। ঘরের যাবতীয় আরাম-আয়েশ তথায় উপভোগ করত। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মনঃকষ্ট, উদ্বেগ ও মানসিক অস্থিরতা সেখানে দূরীভূত হত। আহার, ঔষধ, দয়া-যত্ন সবই ছিল সেখানে। হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া (রহ.) কে তাঁর পীর-সাহেব দিল্লি অভিমুখে বিদায় দেয়ার সময় বলেন যে, তুমি হবে এক ছায়াময় বৃক্ষ ; যার ছায়াতলে

---

[1] মানযির আহমদ গিলানী, মুসলমানোকা নিযামে তা'লীম ওয়া তারবিয়াত, ২খন্ড, পৃ.২২০।

খোদার সৃষ্টিরাজি সুখ পাবে। সত্যিই ইতিহাস সাক্ষী যে, সত্তর বছর অবধি দিল্লি ও দূর-দূরান্ত থেকে আগত লোকগণ সে বৃক্ষের ঘণ ছায়াতলে আরাম-আয়েশ উপভোগ করে। এ সব সূফী-দরবেশদের অবদানে ভারতবর্ষের শতাধিক স্থানে এমন ছায়াময় বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল যার ছায়াতলে পরিশ্রান্ত মুসাফির ও পথভ্রষ্ট কাফেলা এক নব জীবনের সন্ধান পেতো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ভারতীয় ভাষা সমূহে আরবীয় প্রভাব

ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য ও চিন্তা-ভাবনাতে মুসলমানগণ কি ধরণের প্রভাব বিস্তার করেছে তা অনুধাবন করার জন্য এটাই দেখতে হবে যে, আরবী ভাষা যা মুসলিম জাতির ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে সমাদৃত তা এদেশের আঞ্চলিক ভাষা সমূহের শব্দভান্ডারে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হল ? নিম্নের আলোচনায় সে সব প্রভাবকে চিহ্নিত করার প্রয়াস পাবো।

চিন্তা, কল্পনা ও ভাবব্যঞ্জনায় পারস্পরিক বিনিময় ঃ

কোন সমৃদ্ধ, সুরুচিপূর্ণ ও মার্জিত ভাষার প্রভাব অন্যান্য ভাষা সমূহে বিস্তার লাভ করা সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে নতুন কোন ঘটনা নয়। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে চিন্তা, কল্পনা, প্রকাশভঙ্গি ও লিখন পদ্ধতি পরস্পর বিনিময় হতে থাকে। জীবন ও উন্নতির প্রাকৃতিক নিয়মও তাই। যদি কোন ভাষা উৎকর্ষের স্বাভাবিক রীতি-নীতি উপেক্ষা করে অন্য ভাষা হতে লাভবান হওয়ার ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেয় এবং নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যে আবদ্ধ থাকাকে গৌরব হিসেবে গ্রহণ করে নেয়; তাহলে সে যেন নিজেকে উৎকর্ষের পথ থেকে দূরে সরিয়ে সংস্কৃতির বন্ধনকে ছিন্ন করে ফেলল। এমন ভাষা জীবনের কাফেলা হতে অনেক দূরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে ভাষা হয়ে যায় স্থির ও সীমিত। সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পীদের পরিবর্তনশীল ও ক্রমবর্ধমান চিন্তাধারা এবং উন্নয়নের পথে ধাবমান জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার যোগ্যতা সে ভাষায় অবশিষ্ট থাকে না।

দেশীয় পোষাকে বিদেশী শব্দভান্ডার ঃ

আমার ধারণা ছিল যে, উর্দূ ভাষা আরবী, সংস্কৃতি, ফার্সী ও তুর্কী ভাষার সমন্বয়ে গঠিত এক মিশ্র ভাষা হলেও তার সিংহভাগ ব্যাপ্ত ছিল আরবী ভাষায়। এ ক্ষেত্রে আমি সে সব শব্দের সাথে পরিচিতি লাভ করি যা উর্দূ ভাষার অন্তর্ভূক্ত হয়েও আসল আরবী রূপের পরিবর্তন ঘটেনি। উপরন্তু

আমার ধারণা ছিল এ ধারাবাহিকতা উর্দূতে সীমাবদ্ধ ছিল যেহেতু উর্দূর সাথে আরবী ভাষা ও শব্দের সাজুয্য রয়েছে। অল ইন্ডিয়া রেডিও এর কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ, তাদের কারণে এ বিষয়ে আমার আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয়। অনুসন্ধানের এই আবেগময় ও স্বতঃস্ফুর্ত যাত্রাপথে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। আবার এমন ব্যক্তিত্বের সাথেও আমার সাক্ষাৎ ঘটে যারা বাহ্যরূপ পরিবর্তন করে দেশীয় পোষাকে নিজেদের সুসজ্জিত করেছে। এ সংক্রান্ত আমার অনুসন্ধানলব্ধ অভিজ্ঞতার বিবরণী পাঠকদের উদ্দেশ্যে পেশ করছি।

মুদ্রা ঃ আসুন, সর্বপ্রথম 'দাম' শব্দের দিকেই আমরা দৃষ্টি দিই। 'দাম' শব্দটি হিন্দী ও উর্দূ উভয় ভাষায় ব্যয় ও ধন-দৌলতের অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূলতঃ তা 'দিরহাম' আরবী শব্দ হতে চয়নকৃত। তবে আরবীতে তা কেবল ধন-দৌলতের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সচরাচর দিরহাম ও দীনার বলা হয়। এর সাথে 'কীরানত' শব্দটির ব্যাপারেও আমরা আলোচনা প্রবৃত্ত হতে পারি। অযোধ্যার প্রাচীন নথিপত্রে 'আনা' 'পাই' এর সাথে ছোট মুদ্রার বিনিময়ে এ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এটা মূলতঃ আরবী 'কীরাত' হতে উদ্ভূত। 'আশরাফী' শব্দটিও আরবী হতে সংকলিত। সুবিখ্যাত আরব ক্যাপ্টেন ইবনে মাজেদ আসাদুল বাহার *'আল-ফাওয়ায়েদ ফি উসুলিল বাহার ওয়াল কাওয়ায়েদে"* উল্লেখ করেন ঃ এটা স্বর্ণ নির্মিত একটি মুদ্রার নাম। অতীতে যার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এবং বর্তমানে তার প্রচলন অব্যাহত রয়েছে।

বৈচিত্রপূর্ণ খাবার ঃ

শব্দের তত্ত্ব উদঘাটন করতে গিয়ে আমার অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়লো 'ফিরনী' শব্দটি ; যা চিনি চাউলের আটা ও দুধের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়। পূর্বে তার নাম ছিল 'আল-মেহলবিয়্যাহ' যা বিখ্যাত আব্বাসীয় সেনাপতি মিহলব ইবনে আবি সফরাহ্ নামের সাথে সম্পৃক্ত। উপরন্তু মুহাম্মদ আল-খাওয়ারযমী বর্ণনা করেন যে, 'আল-ফারানী' রোগীদের সতর্কতামূলক খাবার হিসেবে ময়দার রুটি, দুগ্ধ, চিনির সংমিশ্রনে প্রস্তুত করা হয়। এসব খাবারের মধ্যে 'কলিয়া' এর প্রসঙ্গও উল্লেখ করা যেতে

পারে। মাংস, ঝোল, ও সবজির সাহায্যে প্রস্তুত এক প্রকার উপাদেয় খাদ্য। যা মূলতঃ আরবী শব্দ 'কাল্লিয়া' থেকে নির্গত। কাবাব ও কালিয়া প্রায় এক। কেননা কাবাব শব্দটি মুলত 'আল-কাব্বু থেকে নির্গত। যার অর্থ উল্টানো-পাল্টানো, তাই এই শব্দটি এমন খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয় যা আগুনে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভূনা হয়। আরবী ভাষায় 'কাবাবা' শব্দটি 'আমালুল কাবাব' অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কাবাব বা ভূনা গোস্ত বানানো। এ প্রসঙ্গে 'শূরবা' শব্দটির কথা মনে পড়ে। মূলত তা ছিল 'শারবাহ্' যার অর্থ হচ্ছে পান করা ও এমন বস্তু যা একবারেই পান করা যায়।

আরাম-আয়েশের আসবাব-পত্র ঃ

সালাফা ও হুক্কা শব্দদ্বয়ও খাটি আরবী । আরবরা সালাফা শব্দ দ্বারা আহারের পূর্বে নাস্তাকে বুঝিয়ে থাকে। ঘরের ফার্ণিচার এং অন্যান্য ভোগ-বিলাসিতার আসবাবাদিতেও আরবী শব্দের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করার মত। 'কালীন' (কার্পেট) শব্দটিও 'আলকানী' থেকে উদ্ভূত। এটা 'কালীকালা' এর সাথে সম্পৃক্ত। 'কালীকালা' আর্মেনীয়ার একটি শহরের নাম। বিখ্যাত আরবী লেখক আবু আলী আল-কানী সে শহরে জন্ম লাভ করেন। *'মু'জামুল বুলদান'* নামক গ্রন্থে ইয়াকুত আর রুমী লিখেন, 'কালী' নামের কার্পেটগুলো কালিকলা শহরেই তৈরী হতো। উচ্চারণ কঠিন হওয়াতে কেবল বলা হতো 'কালী'।

নির্মাণ কুশলী ঃ

গৃহাভ্যন্তরীণ আসবাব পত্রে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো গৃহ নির্মাতার প্রতি। কারণ গৃহ ও প্রাসাদ সুন্দর,দৃষ্টিনন্দন হওয়ার পেছনে তারই মেধা ও শ্রম বেশী। এক্ষেত্রে হিন্দি 'রাজ' শব্দটি আমাকে বিস্মিত করে দেয়। এটা মূলতঃ একটি মাত্র অক্ষরের পরিবর্তন সহকারে আরবী 'আর-রায' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আরবি ভাষায় তার অর্থ প্রধান মিস্ত্রী। তার মূলরূপ হল, 'আর-রায়েয'। এভাবে নিপুন কারিগরের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে মিস্ত্রী শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। যা মূলতঃ আরবী শব্দ 'মিসতিরীর' পরিবর্তিত রূপ।

আরবী ভাষায় মিস্ত্রী বলা হয় ঐ কারিগরকে যে দেয়াল সমূহকে সোজা রাখার লক্ষ্যে সর্বদা নিজের মিসতার (রোলার) রাখে।

নির্মাণের যন্ত্রপাতি ও উপকরণঃ

মিস্ত্রী ও কারিগরদের পেশায় 'খারাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মূলতঃ খরতুন বা খারাত থেকে যা রূপান্তরিত ; যার অর্থ কাঠ বা লৌহ সামগ্রীকে সমান করা। নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারের হিসাব নিতে গিয়ে 'সাহুল' শব্দটি স্মৃতিপটে ভেসে উঠল। 'সাহল' এক ধরনের ক্ষুদ্র লৌহ পিন্ড, সুতার এক পাশে বেধে দেয়াল সোজা হয়েছে কিনা নির্ণয় করা হয় এর দ্বারা। বিখ্যাত গবেষক খাওয়ারেযমী স্বীয় গ্রন্থ *'মাফাতীহুল উলূম'*-এ 'সাকুল' নামের এক যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তা এক রকম ভারি বস্তু যা রশির এক পার্শ্বে বেঁধে মিস্ত্রীরা বিশেষ কাজে ব্যবহার করে। এরূপ 'কুনী' শব্দটিও 'আলকুনিয়া' শব্দ থেকে নির্গত। খাওয়ারেযমী সে সম্পর্কে লিখেন যে, এর মাধ্যমে সমকোণ বের করা হয়।

আরো কিছু দৃষ্টান্ত ঃ

ভারতে বহুল প্রচলিত 'কলঈ' শব্দটি (বার্ণিশ) আরবী। ভারতে এ শব্দটি শ্বেতবর্ণের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে *লিসানুল আরব* এর বিজ্ঞ গ্রন্থকারের মন্তব্য লক্ষণীয়। তিনি বলেন, 'কলঈ' উন্নত মানের সীসা বিশিষ্ট এক প্রকারের ধাতু বিশেষ। গভীর শুভ্রতার ক্ষেত্রেও শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। 'আল-কিলউ' এক প্রকারের ধাতু। যার মাধ্যমে উন্নত মানের সীসা তৈরী হয়। 'আহদী' শব্দটি প্রয়োগ হয় এমন অলস ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে সংসারে বোঝা হয়ে পড়েছে। কোন মেহনত না করার কারণে আরবীতে এর অর্থ একা বা একাকী। রাজা-বাদশাহদের দ্বারে দ্বারে কিছু লোক কেবলমাত্র প্রহরী হিসেবে নিয়োজিত থাকে; মালিকের উচ্ছিষ্টের উপরই তারা প্রতিপালিত হয়। তাই তাদের 'আহদী' নামে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ এমন লোক যারা অলস ও পক্ষাঘাতগ্রস্থদের ন্যায় অনর্থক সময় কাটায়। অনুরূপভাবে 'তামাশা' শব্দটি হিন্দি ভাষায় চিত্ত বিনোদনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুলত তা আরবি শব্দ 'তামাশি' থেকে রূপান্তরিত, যার অর্থ

বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ঘুরে বেড়ানো। ফার্সি ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী এর 'শীন' এর যেরকে যবর দিয়ে পাল্টালে 'তামাশা'য় রূপান্তরিত হয়। 'তামান্নী' থেকে 'তামান্না'। যেসব আরবী শব্দ হিন্দি ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং সংক্ষিপ্তালোচনায় তার বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সাইয়েদ সুলাইমান নদভীকে (রহ.) উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন যে, তিনি এ বিষয়ে চুলচেরা ও প্রাণান্তকর গবেষণা পূর্বক অনেক মনোমুগ্ধকর দৃষ্টান্ত পেশ করেন।

এখনো গবেষণা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যারা নিবেদিত প্রাণ; তাঁদের জন্য রয়েছে অনুসন্ধানের প্রশস্ত ও মুক্ত ময়দান। তবে শর্ত হলো, যারা এ মহৎকর্মের উদ্যোগ ও পতাকা বহন করবেন, তাঁরা যেন আরবি ও হিন্দি উভয় ভাষাতে পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী হন। সাথে সাথে প্রাচীন ও আধুনিক তত্ত্ব-উপাত্ত সম্পর্কে থাকতে হবে তার অবাধ দখল। আরবী ভাষা ও সাহিত্য ভান্ডারে রক্ষিত প্রাচুর্য আহরণে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। অসম্পূর্ণতা, তাড়াহুড়া ও আপাতঃদৃষ্টি পরিহার করতে হবে। দূর-দূরান্তের পরিভ্রমণে, আরব মরুভূমি থেকে শুরু করে ইসলামী বিশ্বের প্রধান নগর সমূহে এবং সিন্ধু প্রান্তর ও গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা হয়ে আরব সাগরের প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেক মনযিল ও পর্যায়ে একজন অনুসন্ধিৎসু পরিভ্রাজককে এসব শব্দ ভান্ডারের সাথে পরিচিতি লাভে সচেষ্ট থাকতে হবে। এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, ভারতীয় ভাষা সমূহে ব্যাপক আরবী ভাষা এবং ভারতীয় সাহিত্যে সুনিপুন ভাবে নিজের পথ করে নিয়েছে। আরবী ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার মুকাবিলায় এবং আরবী শব্দ সমূহ ভারতীয় ভাষায় ও ভারতীয় মানুষের জীবনধারায় এমনভাবে মিশে গেছে যে, এ বিষয়ে পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে তা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ
ভারতে ইসলামী সভ্যতা

সভ্যতা রূপায়নে দু'টি উপকরণ ঃ

প্রতিটি দেশের মুসলিম সভ্যতা দু'ধরণের উপকরণের (Factors) কর্মফলাফল ও তার প্রভাব প্রতিপত্তির সমষ্টি। উপকরণ দ্বয়ের এক: ধর্মীয় বিশ্বাস, ইসলামী জীবন বিধান ও নৈতিকতা। দুই: দেশের স্থানীয় সভ্যতার প্রভাব ও লোকালয়ের অপরাপর উপাদানের মাখামাখি মেলামেশা। প্রথম উপকরণ (ধর্মীয় বিশ্বাস, ইসলামী জীবন বিধান ও নীতিবোধ) পৃথিবীর নানা দেশের মুসলিম সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মুসলিম জাতি দুনিয়ার যে কোন রাষ্ট্র বা জনপদে বসবাস করুক কিংবা তাদের ভাষা ও বেশভূষা ভিন্ন হোক, কিন্তু এই যৌথ কৃষ্টি সকলের মধ্যে অবশ্যই বিদ্যমান। যার ফলে তাঁদের এক পরিবারের সদস্য ও প্রতিটি স্থানে একই সংস্কৃতির অনুগত পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় উপকরণ, সংস্কৃতির সে অধ্যায়, যা তাদেরকে ভিনদেশীয় ভ্রাতৃমহলে স্বকীয়তা দান করে। ফলে পরিচয় পাওয়া যায়, তারা কোন দেশের অধিবাসী। ভারতের মুসলমানও এ সর্বজনীন মূলনীতির ব্যতিক্রম নয়। তাদের সভ্যতা যা শতাব্দীর পর শতাব্দী সুদীর্ঘ সময় লালিত হয়েছে। ভারতবর্ষ ইসলামের অবদানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্টত্ব ও সুকৃতিত্বের প্রতীক। ভারতবর্ষে ইসলামী সভ্যতা কোন অপরিচিত মুসাফিরের ন্যায় নয় বরং স্থায়ী ও নিরাপদ নাগরিকের মতো নিজের অবস্থানকে পরিস্থিতি, প্রয়োজন, প্রাচীন রীতি ও আধুনিক পরিবেশ অনুযায়ী সুশৃংখল করেছে এবং নিজের পরিবেশের স্থায়িত্ব ও নতুনত্বের মাত্রা দান করেছে।

কোন জাতি বা সম্প্রদায়কে তার অন্তর্নিহিত খোদায়ী প্রভাব ও এমন চারিত্রিক বিধান থেকে বঞ্চিত করা বা বিমুখ করার প্রয়াস, যার মধ্যে দুনিয়ার সকল মানুষই সম্মিলিত ভাবে জড়িত, নিতান্ত অমার্জিত উদ্যোগ। এটা তার আত্মিক অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বে (Universality) থেকে বঞ্চিত রাখার নামান্তর। এভাবে কোন জাতি বা সম্প্রদায়কে তার নিজস্ব পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং পারিপার্শ্বিক

প্রভাব থেকে মুক্ত করে জীবনাতিপাতের আমন্ত্রণ এক ব্যর্থ ও অপ্রাকৃতিক প্রচেষ্টা যা একেবারে অগ্রহণযোগ্য।

ইব্রাহিমী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ঃ

প্রথম যৌথ উপাদানের (আকায়েদ, ইসলামী জীবন ও নৈতিকতার) দিক দিয়ে ভারতের মুসলমানও দুনিয়ার অপরাপর মুসলমানগণের ন্যায় এক বিশেষ সভ্যতার অধিকারী। যার অভিব্যক্তির জন্য 'ইব্রাহিমী সভ্যতা'র চেয়ে অধিক উপযোগী ও ব্যাপক কোন শব্দ নেই। ইবরাহিমী সভ্যতার তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলো তার পুরো ধ্যান-ধারণা ও জীবনধারায় এক বিশেষ প্রতিপত্তি সৃষ্টি করেছে। এ প্রতিপত্তি মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয় এবং মানুষের সচেতন কর্মকান্ড তার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। ইবরাহিমী সভ্যতার তিন মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঃ

এক ঃ আল্লাহর অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাস, সর্বদা অন্তরে তার অনড়াবস্থান ও মুখে তার সম্যক প্রকাশ।

দুই ঃ একত্ববাদে পূর্ণাস্থা (যেভাবে ইবরাহিমী ধারা আম্বিয়ায়ে কেরাম [আ.] শিক্ষা দিয়েছেন,

যার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পবিত্র কুরআনে রয়েছে)

তিন ঃ নৈতিক উৎকর্ষ, মানবিক সমতার বাধ্যবাধকতা ও শাশ্বত কল্পনা, যা কোন মুসলমানের

স্মৃতিশক্তি থেকে কখনো বিলুপ্ত হতে পারে না। এসব স্বতন্ত্র বিষয়াদিই একমাত্র ইবরাহিমী

সভ্যতাকে দুনিয়ার অপরাপর সভ্যতার বিপরীতে এক অভিনব রূপে চিত্রিত করেছে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য সমূহ এত প্রকাশ্য ও প্রাঞ্জল ধারায় অন্য কোন সভ্যতায় পাওয়াই মুস্কিল।

মুসলিম জীবনের পদে পদে আল্লাহর স্মরণ ঃ

আল্লাহর অস্তিত্বের দৃঢ়প্রত্যয়, সর্বদা অন্তরে তাঁর অনড়াবস্থান ও মুখে তাঁর সম্যক প্রকাশ এমন এক সার্বজনীন স্বকীয়তা, যা মুসলিম জাতির

পুরো সংস্কৃতি ও পুরো জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মুসলিম সভ্যতা ও সামাজিক ব্যবস্থা নানা ফ্যাশনের পরিধেয় বস্ত্র স্বরূপ, যা নানা রুচিবোধ, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও বাহ্যিক প্রভাবে প্রভাবিত। কিন্তু ঐসব পরিধেয় যেন এক বর্ণের পাত্রে রঞ্জিত তাই একটি সুতোর আঁশও এমন নেই, যেখানে সে রঙের ছোয়া লাগেনি। মুসলিম সংস্কৃতি ও সমাজের স্তরে স্তরে আল্লাহর নাম ও তাঁর ধ্যান শিরা-উপশিরার রুধির ধারার ন্যায় প্রবহমান। মুসলিম সন্তান ভূমিষ্ট হলে, সর্বপ্রথম তার কানে আযান দেয়া হয়। এভাবে সদ্যোজাত শিশু তার নামেরও আগে সর্বপ্রথম আল্লাহর নামের সান্নিধ্য ও পরিচিতি লাভে ধন্য হয়। সপ্তম দিনে মাসনূন তরিকায় তার আকিকা উদযাপিত হয়, তখন তার একটি ইসলামী নাম নির্ধারণ করা হয়। সে নামই নির্বাচিত হয় যার মাধ্যমে শিশুর গোলামীর স্বীকৃতি ও আল্লাহর একত্বের ঘোষণার হয় কিংবা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় তাওহিদবাদীদের (আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসারীগণের) নামই নির্ণিত হয়। শিশু শিক্ষার উপযোগী হয়, মক্তবে যায়, তখন আল্লাহর নাম ও কুরআন শরীফের আয়াত দ্বারা তার শিক্ষার সূচনা হয়। এখনও এ রীতি ভারতীয় মুসলিম সমাজে 'বিসমিল্লাহ পাঠ' বা 'বিসমিল্লাহ করা' নামে প্রচলিত রয়েছে। বিয়ের সময় আল্লাহ নামের মর্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, দুই কর্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন মানব মানবী পরপস্পর মায়া মমতার বন্ধনে চির দিনের জন্য আবদ্ধ হয়। "আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট প্রার্থনা কর, আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর।"[১] বিয়ের মাসনূন খুৎবায় আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের আলোচনা করা হয়, যেমন আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) এর বংশধারায় নারী পুরুষ রূপে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেন, আল্লাহ পাকের আনুগত্য সহকারে জীবন ও মরনের নির্দেশ দেয়া হয়। এভাবে ঈদোৎসব, পবিত্র আনন্দের মহান বার্তা নিয়ে যখন মুসলিম উম্মাহর দুয়ারে এসে উপস্থিত হয় প্রতি বছরে, তখন আবালবৃদ্ধবণিতা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতার্জন করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন লেবাস পরিধান পূর্বক আল্লাহর মহত্ত্ব গীতি সরবে (তাকবীরাতে তাশরীক) পাঠ ও দু'রাক্আত শুকরানা নামায আদায়ের আদেশ প্রদান করা হয়। তারপর ঈদুল আযহাতেও আল্লাহর নামে কুরবানী করার উৎসাহ প্রদান

---

[১] সুরায়ে নিসা, আয়াত ঃ ১

করা হয়েছে। যখন জীবন সায়াহ্নে সে কঠিন মুহূর্তের আবির্ভাব ঘটে তখন আল্লাহর সে পবিত্র নাম উচ্চারণে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সকল মুসলিম নর-নারীর সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা এটাই, তাঁর শেষ শব্দ বা বাক্যের যেন পরিসমাপ্তি ঘটে আল্লাহর পবিত্র নাম নিয়ে এবং সে নাম জপে জপে সে যেন ইহকাল ত্যাগ করে। মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সকল জ্ঞানী-গুনী মুসলমানের মুখে সহসা কুরআনের সে প্রসিদ্ধ বাক্যটি শুনা যায় *"ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন"* অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো'।[১] যখন শেষ বিদায়ের পালা (জানাযার নামায) আসে তখন শুরু হতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ নামেরই উচ্চারণ ঘটে এবং মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, নিজের জন্য আল্লাহর আনুগত্যের জীবন যাপন ও দুনিয়া হতে ঈমানের সাথে বিদায়ের প্রার্থনা জানানো হয়।

চিরনিদ্রায় লাশ সমাহিত করার সময় মুসলমানগণ একবাক্যে একথাই বলে, "আল্লাহর নাম এবং তাঁর পয়গাম্বর (সা.) এর আদর্শ ও নমুনায় কবরস্থ করা হচ্ছে।" লাশের চেহারাটা ইবাদত ও তাওহীদের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রাভিমূখী করা হয়, যা বাইতুল্লাহ্ (কা'বা) বলে সকলের কাছে পরিচিত। মুসলমান দুনিয়ার যে প্রান্তে গোরস্থ হোক না কেন, চেহারাটা হবে ঐ কেন্দ্রাভিমূখী। সমাধিস্থ মুসলমানের পাশ দিয়ে যখন কোন মুসলমান হেঁটে যায়, তখন ফাতেহা পাঠের মাধ্যমে শাহী দরবারে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সারকথা, এভাবে আল্লাহর নাম ও ধ্যান মুসলিম জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে , নিশ্বাসে, বিশ্বাসে, কদমে কদমে ধ্বনিত হয়। উল্লিখিত বিষয়াদি জীবনের কতক স্বকীয় কাল মাত্র। প্রাত্যহিক জীবনেও আল্লাহর নাম মুসলমানের মুখে মুখে সদা প্রতিধ্বনিত হয়। যেমন তারা খাওয়া দাওয়া শুরু করে এবং তাঁরই নাম ও কৃতজ্ঞতায় সমাপ্ত করে। যাদের জীবনে সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ সম্যক বিদ্যমান, তাদের পানাহার, বস্ত্র পরিবর্তন, শৌচাগারে গমনাগমন সবখানে আল্লাহর ভাবনাই পরিলক্ষিত হয়। হাঁচি আসলে বলে, *"আলহামদুলিল্লাহ্"*। জবাবে দু'আর সুরে বলে, *"ইয়ারহামুকাল্লাহ্"* ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা, জীবনের এক মুহূর্তও আল্লাহর যিক্‌র থেকে মুক্ত থাকে না। *'মাশাআল্লাহ্'* (যা আল্লাহ

---

[১] *সূরা বাকারা আয়াত ঃ ১৫৬*

চান) *'ইনশা'আল্লাহ'* (যদি আল্লাহ চান) *'লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্'* (পাপ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি কারও নেই; হ্যাঁ যাকে আল্লাহ্ বাঁচিয়ে রাখেন এবং আনুগত্যের শক্তিও কারও নেই; হ্যাঁ যাকে আল্লাহ সাহায্য করেন।) ইত্যাদি বাক্যগুলো কেবল বর্ণিত আযকার ও অযিফা নয়; বরং ওই সব দেশের ভাষার অঙ্গ ও প্রতিদিনের কথোপকথনে পরিভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে যেখানে দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান বসবাস করে আসছে এবং যেখানে তাদের সভ্যতা কার্যকর রয়েছে।

উল্লিখিত সব বিষয়, আল্লাহর যিকির ও তার প্রতি মুসলিম সভ্যতার মোড় ফেরানোর প্রকৃতপক্ষে কতক বাহানা মাত্র। কোন সভ্যতার সামাজিক ব্যবস্থা, তার ভাষা, আচার-ব্যবহার ও তার দৈনন্দিন জীবন মুসলিম সভ্যতার ন্যায় আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর সম্যক উপস্থিতির বেশে কখনও ফুটে উঠেনি। ভারতীয় মুসলিম সভ্যতার প্রথম বিশ্বজনীন উপাদান আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাস ও অন্তরে তাঁর উপস্থিতি, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতীক ও নিদর্শন হিসেবে প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিভাত হয়।

সর্বজনীন নিদর্শন একত্ববাদের বিশ্বাস ঃ

মুসলিম সভ্যতার দ্বিতীয় বিশ্বজনীন নিদর্শন ও প্রতীক একত্ববাদের বিশ্বাস, যা তাদের আকায়েদ (ধর্মমত) থেকে আ'মাল (কর্মকান্ড) এবং ইবাদত-বন্দেগী থেকে উৎসব পালনাবধি স্তরে স্তরে পরিদৃষ্ট হয়। তাদের মসজিদের মিনার চূড়া হতে প্রত্যহ পাঁচবার এ মতাদর্শের ঘোষণা হয়, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদত-বন্দেগীর উপযোগী নয়। তাদের ঘর-বাড়ি, মনোহর দৃশ্যভূমি সবই ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিমা পূজা ও বহু ইশ্বরবাদের নিদর্শন হতে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা অত্যন্ত বাঞ্চনীয়। ছবি, ভাস্কর্য ও প্রতিমা তাদের জন্য একেবারেই নিষিদ্ধ। এমনকি মুসলিম শিশু কিশোরের খেলনাপাতিতেও তা কঠোরভাবে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্মীয় উৎসবাদি হোক বা রাজকীয় আনন্দানুষ্ঠান, রাজনৈতিক নেতা কিংবা ধর্ম গুরুর জন্ম দিনে পালন পতাকা উত্তোলন পর্ব, ছবি, প্রতিমূর্তি ও প্রতিমার সামনে মাথা ঝোঁকানো কিংবা তাদের পুষ্পমাল্যার্পণ মুসলিম জাতির জন্য সম্পূর্ণ হারাম

ও তাদের সভ্যতার চেতনা পরিপন্থী। মুসলিম জাতি যেখানেই স্বীয় ইসলামী সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে উপর্যুক্ত কর্মাদি থেকে কঠোরভাবে দূরে থাকবে। উৎসব অনুষ্ঠানে শপথ ও অঙ্গিকার গ্রহণে,বয়জ্যেষ্ঠদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে এবং বিনম্রতা প্রকাশে হিজাযী তাওহীদের সীমালঙ্ঘণ ও অন্য জাতির অনুকরণ ইসলামী চেতনা ও আদর্শ হতে বিচ্যুতির নামান্তর।

তৃতীয় নিদর্শন, ভদ্রতা, মহত্ত্ব ও মানবজাতির সমতায় বিশ্বাস ঃ

ভারতীয় ইসলামী সভ্যতার তৃতীয় বিশ্বজনীন নিদর্শন হচ্ছে, মানুষের মর্যাদা, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস। সে বিশ্বাসের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হচ্ছে, মুসলমানগ বর্ণ বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার অভ্যাস ও রীতি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। মুসলমানগণ অন্যলোকের সাথে অবাধে খেতে প্রস্তুত, অপরকে নিজের খাদ্যে সঙ্গী করতে অভ্যস্ত। ভিন্ন মতের বহুলোক সংকোচহীনভাবে এক থালায় বসে আহার করে। একে অপরের উচ্ছিষ্ট খায় ও ঝুটা পানি পান করে। 'ধনী-গরীব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে' এক সারিতে নামায আদায় করে। নিম্নবংশীয়, অথচ জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি ইমাম হতে পারবে আর উচ্চ বংশের ভদ্র-শিষ্ট ও উর্ধ্বতন আমীর-উমারাহগন তারই ইমামতিতে নামায পড়তে বাধ্য।

গৌণ ও আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

পূর্বোক্ত মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমূহের সাথে, সে ইবরাহিমী সভ্যতার কতক গৌণ ও আনুষাঙ্গিক বৈশিষ্ট্য সমূহ বিদ্যমান, যা দুনিয়ার সকল মুসলমানদের মধ্যে সম্মিলিত ভাবে পরিলক্ষিত হয়, যেমন- ডান হাতে ভাল কাজ সম্পাদন, ডান হাতে পানাহার ও ডান হাতে আদান-প্রদান। এভাবে পোষাক-পরিচ্ছদেও কিছু বিধি-নিষেধ রয়েছে যেমন- জামা-কাপড় দ্বারা শরীর পরিবৃতি, হাঁটু সমাচ্ছাদিত ও পায়ের গিঁট অনাবৃত থাকা, পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা এবং পবিত্রতা রক্ষায় সতর্কতা অবলম্বন ইত্যাদি। সাধারণভাবে যেখানে ইসলামী সভ্যতা স্বীয় মূলনীতিতে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে উক্ত বিধি-নিষেধের অনুসরণ লক্ষণীয়।

উক্ত বিধি-বিধানের বিরোধিতা সভ্যতার দূর্বলতা ও বাহ্যিক প্রভাবের ফলাফল বিবেচিত হবে।

চিত্রকলা বিষয়ে ইসলামী নীতিমালা ঃ

ইসলামী সভ্যতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, বাস্তব অনুরাগ ও ঐকান্তিকতা। ইসলাম চিত্রকলা ও সুকুমার বৃত্তির চর্চা ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেছে। ইসলামী সংস্কৃতি, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য, সৌষ্ঠবপূর্ণ রুচিবোধকে মূল্যায়ন করেছে। কিন্তু যেসব বিলাস সামগ্রী ইউরোপীয়রা চিত্রকলা (Fine Arts)খেতাবে ভূষিত করেছে, তার কতিপয় দিক ইসলামী সভ্যতার দৃষ্টিকোণে অবৈধ। যেমন-নৃত্যশিল্প, প্রাণীর চিত্রাঙ্কণ, মূর্তি নির্মাণ, ভাস্কর্য স্থাপন ইত্যাদি। ইসলাম এ বিষয়ে সতর্কতা ও ন্যায় সঙ্গত নির্দেশনা দিয়েছে। সুর সঙ্গীতের গুনগুন ও গুঞ্জরণ এক বিশেষ শর্তসাপেক্ষে সতর্কতার সাথে বিহিত ও বৈধ। শিল্পকলায় সর্বদা নিমগ্ন থাকা ইসলামী সভ্যতার চেতনা ও তাৎপর্য বিরোধী এবং খোদাভীতি, পরকাল ভাবনা ও চারিত্রিক উন্নতির পথে বাধা যা একজন মুসলমানের কাছে আশা করা যায়। ইসলামী সভ্যতা ও শরীয়তের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান না থাকলে ভারতের মুসলমানগণ এমন এমন জনপদে ভারসাম্যপূর্ণ নীতির উপর টিকে থাকা অসম্ভব ছিল। ভারতের অধিবাসীরা আদিকাল থেকে শিল্পকলা ও সুকুমার বৃত্তির চর্চায় অনুরাগী এবং এগুলো তাদের উপাসনার এক বিশেষ অঙ্গ। উক্ত সঙ্গতিপূর্ণ নীতি সর্বাবস্থায় মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

ইসলামের চারিত্রিক নীতি ঃ

ইসলামী আদর্শিক নীতিমালার সেব সব অধ্যায়,যা বিশেষভাবে মুসলিম সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে এবং তাকে একটি বিশ্বজনীন সমতা ও একতা দান করেছে তা হচ্ছে, আতিথেয়তা, পরোপকার ও বদান্যতা। এগুলো প্রকৃত পক্ষে ইসলামী সভ্যতার গোড়াপত্তনকারী সায়্যিদিনা ইব্রাহীম (আ.) এর মানসিক বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবগত সুরুচিবোধেরই পরিচায়ক। কুরআন মজীদে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আলোচনায় যার বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। *'তোমরা কি সে সব মেহমানদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত? যাঁদের*

ইব্রাহীম সশ্রদ্ধ আতিথ্যদানে ধন্য হয়েছেন।'[১] ওই সব জাতির মধ্যে যারা বংশপরম্পরায় ও বিশ্বাসগত দিক থেকে তাঁর উত্তরসূরী ও প্রতিনিধি এবং যারা তাঁর সভ্যতায় প্রভাবিত, অতিথি সেবা ও মেহমানদারীর এমন এক ব্যাপক যোগ্যতা ও আগ্রহ পাওয়া যায়, যা সে সময়ের সকল ইতিহাসবিদ ও পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করেছে। তাঁদের লেখা ও বর্ণনায় এর ব্যাপক আলোচনাও বিদ্যমান। মধ্যএশিয়ার সেসব দেশে এখনও যার অধিবাসীরা পাশ্চাত্য সভ্যতায় নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেনি, আজও তাঁদের মধ্যে মেহমানদারীর এক অপরূপ ঝলক লক্ষ্য করা যায়। যা কখনও ইবনে বতূতা, কখনও ইবনে জুবাইর কে স্বদেশের সহানুভূতি ও ভালবাসার পরশ দিয়ে ধন্য করেছে।

ভারতের মুসলমান ইসলামী সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ও ইসলাম প্রচারের সময়-কাল থেকে দূরবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় মেহমানদারী ও মেজবানী রুচিবোধে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মেহমানের আনাগোনা, মুসলমানের পারিবারিক রীতি, যার কমবেশি প্রচলন আজও বিদ্যমান। জাগতিক পরিবর্তন যদিও তার মধ্যে বড় ধরণের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে, তার পরেও সকল মুসলমান অন্য যে কোন মুসলমানের গমনাগমনে আনন্দ উপভোগ করেন এবং তার সেবা ও মেহমানদারীকে সৌভাগ্য ও ইসলামী আদর্শ মনে করে।

মুসলিম সভ্যতায় ভারতীয় প্রভাব ঃ

ভারতে দীর্ঘকাল অবস্থান, নাগরিকত্ব গ্রহণ এখানকার সভ্যতা ও সামাজিকতা এবং অপরাপর সম্প্রদায়ের সংমিশ্রনের যে প্রভাব মুসলমানদের জীবনে ও সভ্যতায় ফুটে উঠেছে তার অন্যতম হচ্ছে, এমন এক বহুল প্রচলিত, অমায়িক, সর্বজনীন ভাষা, (উর্দু) যার মধ্যে আরবী, ফার্সি, তুর্কি ও সংস্কৃতের অনেক শব্দ ভান্ডার ও রূপ-মাধুরী নিহিত রয়েছে। ভাষা নিজের বিচিত্রধারা, নান্দনিকতা ও মনোহারিতায় খুবই চমৎকার। দ্বিতীয়তঃ অভিজাত শ্রেণী ও শহরবাসীর সে পরিধেয়, যা ভারতের উৎপাদিত এবং যা সুরুচি ও মার্জিত স্টাইলের এক সুদৃষ্টান্ত।

---

[১] সূরা যারিয়াত, আয়াত ঃ ২৪।

পক্ষান্তরে সে সামাজিকতা ও সভ্যতা, যা দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, হায়দ্রাবাদ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় শহরে মুঘল শাসনের শেষ দিকে প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্যে মেধা, উৎকৃষ্টতা, চমৎকারিত্ব ও মার্জিত গুনাবলী পরতে পরতে দৃষ্টিগোচর হয়। পিতা-মাতার প্রতি অগাধ সম্মান প্রদর্শন, তাদের সামনে লজ্জাশীলতা ও শিষ্টাচারের বিশেষ নিয়ম, নারীদের অত্যধিক পর্দা ও বিশেষ জীবনধারা যেমন কতক বৈশিষ্ট্য, যা অধিকাংশ ভিনদেশীয় মুসলমানগণের মধ্যে অনুপস্থিত। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভারতের বিশেষ অবস্থা, শাসক শ্রেণীর উন্নত রুচিবোধ ও প্রাচীন রীতিনীতির বিরাট দখল রয়েছে। সর্বদা একই বংশ ও সমশ্রেণীর পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পারিবারিক বিশেষ নিয়ম-নীতি ও সীমারেখার বাইরে না যাওয়া ভারতের মুসলিম সভ্যতার এমন কতক বিশেষত্ব, যার মধ্যে ভারতের গোষ্ঠীগত রীতিধারা ও সামাজিক স্থায়ী কাঠামোর অত্যধিক কর্তৃত্ব রয়েছে। বহির্ভারতের মুসলমান, যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে শুধু আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখে, একই গোত্রে বিবাহ সম্পাদনের পক্ষপাতী নয়, তারা এ প্রথাকে অদ্ভূত এবং ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করে। বিয়ে, মৃত্যু ও অন্যান্য উৎসব- অনুষ্ঠানের অত্যধিক গুরুত্বদান, তাতে সামর্থের চেয়ে বাড়তি ব্যয় এবং আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ পন্থায় উদযাপন করা ইত্যাদিও ভারতীয় সভ্যতা ও সামাজিকতার বিশেষত্ব, যা মুসলিম জাতিকে এ অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। অথচ এসব বিষয়ে ইসলামী রীতি ও আদর্শ একেবারেই সাদাসিধে। এভাবে প্রভূ ও ভৃত্যের মাঝে এমন দূরত্ব যেন তারা ভিন্ন জাতের দু' প্রাণী, সাথে সাথে মাঝে-মধ্যে তাদের সাথে অচ্যুত সুলভ ব্যবহার ইত্যাদি সবই ভারতে ইসলামী সভ্যতার পতনকালের স্মারক, জমিদারী প্রথা, মাতব্বরী ভাবধারা এবং অন্য কৃষ্টির সংমিশ্রনের ফলশ্রুতি ও ভারতীয় বৈশিষ্ট্য। এভাবে পেশার ভিত্তিতে সামাজিক বিভাজনও ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। মাটি ও এখানকার সভ্যতা ও উত্তরাধিকার সংস্কৃতি ভারতের মুসলমানদেরকে অজস্র বহুমূল্য- উপহার দিয়েছে, যা ভারতীয় ইসলামী সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও গৌরবমন্ডিত স্বত্বাধিকার। ভারতীয় মুসলমানগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ও তার ক্ষতিকর আক্রমণের মুকাবিলার ক্ষেত্রে এহেন সফলতা এবং নিজেদের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত রাখে ইত্যাদি গুণাবলী

অন্যান্য মুসলিম দেশে বিরল। এভাবে তাদের চিন্তার গভীরতা ও সূক্ষ্মতা, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি সবই ভারতের শক্তির ফলাফল, যা বহুকাল থেকে এ অঞ্চলে ক্রিয়াশীল রয়েছে। ভারতের মুসলমানগণ একটি নতুন ইসলামী ভারতীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছেন এবং এমন নীতিধারার রূপ দিয়েছেন যার মধ্যে ইসলামের বিশ্বজনীন সভ্যতা ও দর্শন একই সাথে পরিলক্ষিত হয়।

সাথে সাথে ইসলামী চিন্তাধারা ও নৈতিকতা অপরাপর অতিথি সভ্যতা অনেক পরিবর্তনও গ্রহন করেছে। যদিও এসব সভ্যতা ও বিজয়ী জাতির জীবনধারার বৈশিষ্ট্যের সাথে ভারতের পুরনো সভ্যতার কোন সম্পৃক্ততা নেই। ভারতের এক সংবেদনশীল কবি ও জাগ্রত মুসলিম বিবেক খাজা আলতাফ হোসাইন হালী (রহ.) তার কবিতায়ও এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন।[১] বাস্তবতা হল এই, কোন সভ্যতা অন্য সভ্যতাকে কেবল প্রভাবিত করে নিজে প্রভাব গ্রহন করে না, বিশ্ব ইতিহাসের এমন ঘটনা বিরল কাহিনী। এটা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি বিরোধী। কারণ মানব জীবন আদান-প্রদানের মর্যাদাপূর্ণ নীতিতে বিশ্বাস করে। আর এরই মাঝে তার বিকাশ, উন্নতি, বিশালতা ও পরিবর্তনের রহস্য নিহিত রয়েছে।

---

[১] দ্রষ্টব্য হালীর কবিতা " শিকওয়ায়ে হিন্দ" কুল্লিয়াতে হালী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা সব ধরনের ক্রটি ও দূর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলনা। বিষয়ের বিচারে এর বিভিন্ন দিক সমালোচনার যোগ্য ও সংশোধনের মুখাপেক্ষী ছিল। কিন্তু যারা এ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক ও উদ্ভাবক তাঁদের অস্থি-মজ্জায় মিশে যাওয়া চিন্তাধারা ও ধর্মীয় চেতনার কারণে এর মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল যা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। বক্ষ্যমান নিবন্ধে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে তার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট আলোচনা করা হবে। কয়েকটি শিরোনামের অধীনে ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসের হাজারো পাতাজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য-অগুনতি দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলীর কিছু অংশ তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

নিষ্ঠা ও ত্যাগ ঃ

নিষ্ঠা ও ত্যাগ ছিল প্রাচীন যুগের শিক্ষকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেহেতু শিক্ষা দান ও শিক্ষা অর্জনের পরকালীন সওয়াব এবং শিক্ষকদের ধর্মীয় মর্যাদা তাদের মন-মেজাযে মিশে ছিল, তাঁদের বিশ্বাস ও ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল সেহেতু তাদের সবাই না হলেও এমন লোকের সংখ্যা মোটেও কম ছিলনা, যারা শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন পূণ্যলাভের আশায় পঠন পাঠনে লিপ্ত ছিলেন এবং এটাকেই সবচেয়ে বড় ইবাদত ও সৌভাগ্য মনে করতেন। অনেক শিক্ষক চরম দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনে দিনাতিপাত করতেন। ভারতীয় উলামাদের জীবনী মূলক প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে যেসব মহান শিক্ষকদের দুনিয়া বিমূখতা, ত্যাগ তিতিক্ষা, দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়। সেরকম একটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করছি। প্রখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসবেত্তা মাওলানা গোলাম আলী আযাদ তার *'মা'আছিরুল কিরাম'* শীর্ষক গ্রন্থে বিলগ্রামের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মীর সৈয়দ মুবারক (মৃ. ১১১৫হি.) জীবনের একটি ঘটনা স্বীয় উস্তাদ তুফাইল মুহাম্মদ বিলগ্রামীর জবানীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

“একদিন আমি মীর সৈয়দ মুবারকের খেদমতে হাযির হলাম। তিনি অযু করতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে আসলে আমি এর কারণ জানতে চাইলাম। অনেকক্ষণ পীড়াপীড়ির পর হুযুর বললেন, তিনদিন ধরে একটি দানাও মুখে দিইনি। অথচ এসময়ে তিনি কারো কাছে তাঁর অভাবের কথাও প্রকাশ করেননি, কিছু গ্রহণও করেননি। একথাশুনে আমার খুবই করুনা হল। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেলাম এবং হুযুরের পছন্দনীয় খাবার তৈরী করে নিয়ে এলাম। প্রথমে তিনি খুব হাসিখুশি ও মুহাব্বত দেখালেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন। এর পর বললেন, যদি কিছু মনে না কর একটি কথা বলব ? আমি বললাম, অবশ্যই। এধরনের খাবারকে সূফীদের পরিভাষায় *‘তা’আমে ইশরাফ’* (যে খাবারের প্রতি অন্তর লালায়িত থাকে) বলা হয়। ফেক্‌হর দৃষ্টিতে যদিও এমন খাবার হালাল তদুপরি তিনদিন অনাহারে থাকার পর তো শরীয়তে মৃত খাওয়াও হালাল। কিন্তু তাসাউফের নীতি অনুসারে *‘তা’আমে ইশরাফ’* জায়েয নয়।

একথা শুনার পর আমি আর কিছু না বলে মজলিস থেকে উঠে গেলাম। খাবারগুলোও বাইরে নিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ দরজার বাইরে দাড়িয়ে আমি খাবারগুলো নিয়ে আমি আবার ভেতরে ঢুকলাম এবং বললাম খাবারগুলো নিয়ে যখন আমি বাইরে চলে গেলাম তখন কি আপনার মনে খাবারগুলো পুনরায় ফিরে আসার কোন আশা ছিল ? তিনি বললেন, না। এবার আমি সবিনয়ে আরয করলাম, তবে তো এ খাবার আপনার কামনা ছাড়াই এসেছে। সুতরাং এ গুলো খাওয়াতে আশা করি আপনার কোন আপত্তি নেই। কারণ এগুলো *‘তা’আমে আশরাফ’* নয়। আমার এই ব্যাখ্যাটি হুযুরের খুবই ভাল লাগল। বললেন, তুমি খুব চালাকি করেছো এর পর তিনি আগ্রহ ভরে সে খাবার গ্রহন করলেন।

এঘটনাটি অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত মনে হলেও ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে শিক্ষকদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, নিষ্ঠা, নির্মোহতা ও সীমাহীন অভাব-অনটনের প্রমাণবহ এরকম অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যায়। যা ছিল সে শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষকদের নিষ্ঠা ও ত্যাগের আরেকটি ঘটনা যা এক শতাব্দী পরের তাও কম বিস্ময়কর নয় ঃ

"মাওলানা আবদুর রহীম (মৃ. ১২৩৪হি.) রামপুরে এক মাদ্রাসায় পড়াতেন। রোহিলা খন্ডের ইংরেজ গভর্ণর মিষ্টার হকিংস তাকে মাসিক আড়াইশ রুপি বেতনে ব্রেলী কলেজে অধ্যাপনার প্রস্তাব দিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কিছু দিনের মধ্যে বেতন আরো বাড়ানো হবে, পদোন্নতিও হবে। তিনি অপরাগতা প্রকাশ করে বললেন, 'রিয়াসত' থেকে আমি যে দশ রূপী করে পাই তা বন্ধ হয়ে যাবে। হকিংস বললেন আমি তো আপনাকে এর চেয়ে বহুগুন বেশী দিচ্ছি। এর তুলনায় ঐ সামান্য বেতনের কী মূল্য আছে? এবার তিনি অপরাগত প্রকাশ করে বললেন, আমার বাড়িতে একটি কুল গাছ আছে যার ফল খুবই মিষ্ট এবং আমার প্রিয়। ব্রেলীতে আমি তা খেতে পারবনা। ইংরেজ সাহেব এবারও মাওলানার মনের কথা বুঝতে ব্যর্থ হলেন। বললেন, রামপুর থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে। আপনি ব্রেলীতে বসেই ঘরের গাছের কুল খেতে পারবেন। এবারও মাওলানা বললেন, আরেকটি সমস্যা আছে, তা হলো আমার যে ছাত্রটি রামপুরে আছে তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাবে। আর আমি সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। ইংরেজ সাহেব এবারও হার মানলেন না। বললেন, তার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবো ব্রেলীতে সে আপনার কাছে পড়বে এবং নিজেকে গড়ে তুলবে। অবশেষে মাওলানা তাঁর তূনীরের শেষ তীরটি নিক্ষেপ করলেন যার কোন জবাব ছিলনা ইংরেজ সাহেবের কাছে। বললেন, আপনার সব কথাই সত্য কিন্তু শিক্ষাদান করে বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কে কী জবাব দিব আল্লাহর কাছে ?"

(দ্রঃ <u>ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানো কে উরুজ ও যাওয়াল কা আছর উদ্ধৃতি নুযখাতুল খাওয়াতির, পৃ.৩২৪</u>)

লেখা-পড়ায় আত্মমগ্নতা ঃ

পঠন-পাঠনে প্রাচীন যুগের শিক্ষকদের মনোযোগ ও আত্মমগ্নতা এত গভীর ছিল যে, বাস্তব দৃষ্টান্ত ও ঘটনা বর্ণনা করা ছাড়া তা কল্পনাও করা যায়না। পঠন পাঠনই তাদের আত্মার খোরাক, ইবাদত ও জীবনের একমাত্র ব্রতে পরিণত হয়েছিল। জীবনের দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম সময় রাত-দিন একাকার করে তারা লেখা-পড়ায় আত্ম নিমগ্ন থাকতেন। আলেমকুল শিরোমনি আল্লাম ওজীহুদ্দীন গুজরাটী ৬৫/৬৭ বছর পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছেন। মৌলানা আবদুস সালাম লাহোরী, মোল্লা আবদুল হাকীম

শিয়ালকোটী, মৌলানা আলী আসগর কন্নোজী এদের প্রত্যেকের শিক্ষকতার সময় ছিল ৬০ বছর। মৌলানা আহমদ আমীটভী যিনি মোল্লা জিয়ূন নামে সমধিক পরিচিত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দরস দিয়ে গেছেন।

শিক্ষকদের সবটুকু সময় (মানবিক প্রয়োজন ও অল্প বিশ্রাম ব্যতীত) দারস ও তাদরীসেই কাটতো। কোন কোন আলেমতো খাবার সময় এমনকি চলাফেরার সময়ও পড়াতেন। মোল্লা আবদুল কাদের বাদাউনী নিজেদের উস্তাদ আবদুল্লাহ বাদাউনী সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি যখন সওদা করতে বাজারে যেতেন তাঁর পেছনে পেছনে ছাত্রদের একটি বিশাল জামা'আত থাকতো। সেই অবস্থাও তিনি তাদের পড়াতেন। শেষযুগের এক প্রখ্যাত আলেম ও শিক্ষক মাওলানা আবদুল হাই ফিরিঙ্গী মহল্লী ফজরের নামাযের পূর্বে কিছু ছাত্রদের সময় দিতেন এবং একটি ক্লাস নিতেন। প্রাচীন যুগের অনেক শিক্ষককেরই এমন অভ্যাস ছিল।
(মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ,পৃ.৫৬)

ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক ঃ

ছাত্রদের সাথে শিক্ষকদের এমন গভীর সম্পর্ক থাকতো যে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যার দৃষ্টান্ত বিরল। শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে আপন সন্তানতূল্য স্নেহ করতেন। অধিকাংশ সময় তাদের পড়ালেখার খরচ বহন করতেন। সম্রাট আকবরের আমলের রাজ চিকিৎসক এবং বিখ্যাত শিক্ষক হাকীম আলা গিলানী সম্পর্কে *"তাযকিরায়ে ওলামায়ে হিন্দ"* এর গ্রন্থকার লিখেছেনঃ 'তিনি সর্বক্ষণই দরসে লিপ্ত থাকতেন ছাত্রদের ছাড়া খাবার গ্রহন করতেন না।' মৌলানা আফযাল জৌনপুরীর সাথে ছাত্রদের এমন সম্পর্ক ছিল যে, তাঁর অন্যতম ছাত্র মোল্লা মুহাম্মদ জৌনপুরীর ইন্তেকাল হলে তিনি যার পর নাই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। মৌলানা গোলাম আলী আযাদ বিলগ্রামী লিখেছেন, ৪০দিন পর্যন্ত তাঁকে কেউ হাসতে দেখেননি। ৪০দিন পর পর তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্রের সাথে একত্রিত হয় পরপারে পাড়ি জমালেন। আলেমকুল শিরোমনি মৌলানা আবদুল আলী বাহরুল উলূমকে মুন্সী সদরুদ্দীন যখন বিহার আসতে বললেন এবং আকর্ষণীয় বেতনের প্রস্তাব দিলেন তখন তিনি বললেন, আমার সাথে

একশ' ছাত্র আছে, যতক্ষণ না তাদের খাবার ও আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে আমার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। যখন মুন্সী সাহেব সব ছাত্রদের দায়িত্ব গ্রহন করতে সম্মত হলেন-তিনি তাশরীফ আনলেন। মাদ্রাজের নবাব সাহেব মাওলানা সাহেবের জন্য মাসিক এক হাজার রূপী নির্ধারণ করেছিলেন যার সবটাই তিনি ছাত্রদের জন্য ব্যয় করতেন। লাখনৌর ফিরিঙ্গী মহল্লায় বসবাসরত তার পরিবার-পরিজনের কাছে এর কোন অংশ পৌঁছতোনা। এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য তার ছেলে মাওলানা আবদুন নাফে' মাদ্রাজে গেলেন এবং পিতার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন কিন্তু মাওলানা তার নিয়মের ব্যত্যয় ঘটালেন না। ফলে সাহেবজাদা ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে লাখনৌ ফিরে আসেন।

শিক্ষকদের সাথে ছাত্রদের সম্পর্ক ঃ

শিক্ষকদের সাথে ছাত্রদেরও এমন সম্পর্ক ছিল যা সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও আন্তরিকতার চূড়ান্ত রূপ। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ঘটনাটি ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে থাকবে। একবার মোল্লা নিজামুদ্দীন ফিরিঙ্গী মহল্লীর মৃত্যুর সংবাদ রটে গেল। এখবর শুনে সৈয়দ যারীফ আযিমাবাদী নামের তার এক ছাত্র কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সৈয়দ কামালুদ্দীন আযিমাবাদী নামক অন্য এক ছাত্র এ শোক সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু বরণ করেন। পরে জানা গেল এ খবর ভুল ছিল। এধরণের ঘটনা বিরল কিন্তু তা সেকালের ছাত্রদের আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততা, শিক্ষকদের প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধার প্রমান বহন করে। সেকালের ওলামায়ে কেরাম নিজেদের রচিত গ্রন্থে শিক্ষকদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকেই তাঁদের সম্পর্কের গভীরতা আঁচ করা যায়।

সমকালীন রাজা-বাদশাহ ও ক্ষমতাসীনদের মূল্যায়ন ঃ

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সমকালীন রাজা-বাদশাহ , আমির-ওমারাহ ও নামি দামী ব্যক্তিবর্গ, বড় বড় আলেমদের সেবা ও তাদের আরামের ব্যবস্থা করতে পারাকে নিজের জন্য পরম সৌভাগ্য ও সাফল্য মনে করতেন। ভারতবর্ষে ইসলামী শাসনামলের ইতিহাস এসব রাজা-বাদশাহ ও আমির-ওমারাহদের সম্মান প্রদর্শনের

ঘটনায় ভরপুর। *"তারিখে ফিরিশতা"* এর লেখক মুহাম্মদ কাছেম বিজাপুরী লিখেছেন ঃ

"একবার আলেমকুল শিরোমনি কাজী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী অসুস্থ হয়ে পড়লে সুলতান ইব্রাহীম শরক্বী তাঁকে দেখতে গেলেন। কুশল জিজ্ঞাসা ও প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ করার পর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন। এর পর এক গ্লাস পানি চাইলেন পানির গ্লাসটি মাওলানার মাথার উপর থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে পানিটুকু নিজে পান করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্! কাজী সাহেবের রোগটি আমাকে দিন এবং তাঁকে সুস্থ করে দিন।"

(তারীখে ফেরেস্তা, ৪খ.পৃ. ৬৭৭)

আমীর ফতহুল্লাহ্ শিরাজীর মৃত্যুতে শোকবাণী দিতে গিয়ে সম্রাট আকবর লিখেছিলেন ঃ "যদি ইংরেজরা তাঁকে বন্দী করে মুক্তিপণ স্বরূপ আমার পুরো রাজকোষ দাবী করে বলতো তবুও আমি এ সওদা বড় সস্তা ও লাভজনক মনে করতাম। এ মহামূল্যবান কুহিনুরের সামনে অন্য সব কিছুকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করতাম।"

সম্রাট শাহজাহান মোল্লা আবদুল হাকীম শিয়ালকুটীকে দুইবার রৌপ্যের সাথে আর কাজী মুহাম্মদ আসলাম হারভী (আল্লামা মীর জাহিদের পিতা) কে একবার স্বর্ণের সাথে পরিমাপ করেছেন। এটা ছিল প্রাচীন রাজা-বাদশাহ কর্তৃক যোগ্য লোকদের স্বীকৃতির একটি পন্থা। 'আগসানে আরবায়া' এর লেখক মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ্ ফিরিঙ্গী মহল্লী মাওলানা বাহরুল উলূমকে মাদ্রাজে দেয়া রাজকীয় সম্বর্ধনার চিত্রায়ন করেছেন এভাবে ঃ

"....মাওলানা সাহেবকে বহনকারী পাল্কী যখন রাজপ্রাসাদের কাছে পৌছল তিনি নামতে চাইলেন নবাব ওয়ালাজাহ্ ইশারায় বললেন, জনাব তাশরীফ রাখুন, এর পর নিজে এগিয়ে এসে পাল্কীতে কাঁধ লাগিয়ে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সিংহাসনের উপর নিজের জায়গায় তাঁকে বসালেন। এর পর মাওলানার পদচুম্বন করে বললেন, আমার কী সৌভাগ্য যে, আমার বাড়িতে আপনার পবিত্র পদধূলি পড়েছে! সত্যি আপনি আজ আমার বাড়ি আলোকিত করেছেন।"

সমকালীন রাজা-বাদশাহ্ ও প্রতাপশালী নৃপতিগণ ছাড়াও বড় বড় জমিদারগন মাদ্রাসার সব খরচ বহন করা ও ছাত্র-শিক্ষকদের খিদমত করার সুযোগ পাওয়াকে নিজেদের জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতেন। তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও উৎসাহের ফলে দেশের আনাচে কানাচে অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মাওলানা গোলাম আলী আযাদ বিলগ্রামী নিজের এলাকা অযোধ্যার তৎকালীন অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

“সমগ্র অযোধ্যা ও এলাহাবাদ অঞ্চলের প্রতি ৫০/১০ ক্রোশ অন্তর অন্তর সরকারী বৃত্তি ও জায়গীর প্রাপ্ত উচ্চ বংশীয় অভিজাত শ্রেণীর লোকজন বসবাস করতেন। তাঁরা মসজিদ' মাদ্রাসা ও খানকাহ গুলো আবাদ করে রাখতেন। আর শিক্ষকরা সর্বত্র জ্ঞানের আলো বিতরণে ব্যস্ত থাকতেন। এভাবে তাঁরা সবখানে জ্ঞান অর্জনের প্রতি মানুষের মনে গভীর আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতেন। জ্ঞান পিপাসু ছাত্ররা দলে দলে এক শহর থেকে অন্য শহরে সফর করতেন। যেখানেই ইলম অর্জনের সুযোগ পেতেন লুফে নিতেন। প্রত্যেক এলাকার জনগণ এসব ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ এবং এই মোবারক জামা'য়াতের খিদমতের জন্য দু'পায়ে খাড়া থাকতেন। এটাকে পরম সৌভাগ্য মনে করতেন।

আত্মশুদ্ধি ও আহ্লে দীলের সাথে সম্পর্ক ঃ

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার যারা কর্ণধার তাঁদের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো- ইলমী যোগ্যতা, পান্ডিত্য জগতজুড়া সুনাম-সুখ্যাতির পাশাপাশি তাঁরা আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিও মনোনিবেশ করতেন। তাঁরা ইল্মে যাহির অর্জনের জন্য যোগ্য শিক্ষক ও দক্ষ আলেমের সাহচর্য যেমন অপরিহার্য জ্ঞান করতেন-তেমনি নিজেদের আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অর্জনের জন্য খাঁটি পীর-আওলিয়া ও অধ্যাত্মিক সাধকদের দরবারে ধর্না দেয়াকেও আবশ্যক মনে করতেন। এতে করে তাঁদের সুনাম-সুখ্যাতি ও মর্যাদা কোন ভাবে ক্ষুন্ন হতোনা। একদিকে যুগের রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের সামনে তাদেরকে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ও রাজকীয় মন-মেজাযে দেখা যেতো অপরদিকে

তাঁদের অধ্যাত্মিক গুরু পীর-মাশায়েখদের সামনে দেখা যেতো পরম বিনয়ী ও নিষ্প্রাণ দেহের মতো। আত্মগৌরব ও বিনয়ের এই দুই বিপরীতমূখী গুণের দূর্লভ সমাবেশ ছিল সেসব নিষ্ঠাবান আলেমদের চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে এই বাস্তবতাটি কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা যে, যেসব ব্যক্তিত্বকে আল্লাহ তা'লা সার্বজনীন গ্রহনযোগ্যতা, সমাদর ও অমর খ্যাতি দান করেছেন এবং যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতে বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ইলমের খিদমত করে গেছেন তাঁদের সাথে সমকালীন কোন না কোন পীর-বুযুর্গের সাথে অবশ্যই সম্পর্ক ছিল। সর্ব প্রথম ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র গুলোতে তিন জন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়। তাদের ছাত্র-শিষ্যরাই পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে জ্ঞানের প্রদ্বীপ জ্বেলে রেখেছিলেন। তাঁরা হলেন, মাওলানা আবদুল মুক্তাদির কিন্দী থানেশ্বরী (মৃ.৭৯১ হি.) তাঁর ছাত্র মাওলানা খাজগী দেহলভী (মৃ.৮০৯) এবং শেখ আহমদ থানেশ্বরী (মৃ.৮০১)। এ তিনজনই *'চেরাগে দেহলী'* (দিল্লির প্রদীপ) নামে খ্যাত শেখ নাসির উদ্দীন এর দীক্ষাপ্রাপ্ত মুরীদ ছিলেন।

শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অপর এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন আল্লামা ওজীহুদ্দীন নাসরুল্লাহ্ গুজরাটী (মৃ.৮৯৮ হি.) যিনি জীবনের ৬৭টি বছর আহমদাবাদে মা'কুলাত ও মানকুলাত পড়ানোর মধ্যে অতিবাহিত করেন। তার জীবদ্দশাতেই তাঁর ছাত্ররা আহমদাবাদ থেকে লাহোর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং নিজ নিজ স্থানে ইল্মের খিদমতে নিয়োজিত ছিল। জীবদ্দশাতেই তিনি *উস্তাজুল আসাতিজা* অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন। জাহানাবাদ, জৌনপুর ও লক্ষ্ণৌ শহরের আশে পাশে তিনিই ছিলেন একমাত্র জ্ঞানের প্রদীপ যার আলোয় সমগ্র অঞ্চল আলোকিত ছিল। তিনি ছিলেন শেখ মুহাম্মদ গাউস গোয়ালিয়ারী এর একজন বিশিষ্ট মুরীদ ও খলিফা। তিনি তাঁর পীরের আন্তরিক দোয়া লাভে ধন্য হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে শাহ পীর মুহাম্মদ লাখনোভী এবং মাওলানা গোলাম নকশবন্দ উভয়ে চিশতিয়া তরিকার বায়আত ও এযাযত প্রাপ্ত ছিলেন। তাঁরা একই সাথে মাদ্রাসা ও খানকার কাজ করতেন।

ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে আফগানিস্তান-ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সর্বজনগ্রাহ্য পাঠ্যক্রম ও সিলেবাসের সফল প্রবর্তক মোল্লা নিজামুদ্দীন সাহালভী (রহ.) (মৃ.১১৬১ হি.)। কাদেরিয়া সিলসিলার বিখ্যাত পীর সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক বানসাভী (রহ.) এর একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্যই ছিলেন না বরং এ মহান সাধকের আক্বিদা-বিশ্বাসই ছিল তাঁর জীবন দর্শন। তাঁর ভালবাসায় তিনি ছিলেন আকণ্ঠ নিমজ্জিত। *'মানাক্বিবে রাজ্জাকিয়া'* গ্রন্থের প্রতিটি শব্দে পীরের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষানিকেতন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা ও দেওবন্দ সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ আল্লামা কাসেম নানুতুভী (রহ.) ও তাঁর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও মুরুব্বী আল্লামা রশীদ আহমদ গংগোহী (রহ.) উভয়ে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কীর (রহ.) খলিফা ছিলেন। নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আহমদ আলী মুংগীরী (রহ.) ছিলেন মাওলানা ফজলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী (রহ.) এর খলিফা । এভাবে ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে প্রতিটি সন্ধিক্ষণে কোন না কোন অধ্যাত্মিক সাধক ও পীরের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। যার সুদৃষ্টি সে কাজের মধ্যে ইখলাস, লিল্লাহিয়্যাত ও সার্বজনীন প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

এটাও বড় শিক্ষণীয়, লক্ষণীয় এবং কাকতালীয় নয় যে, অধিকাংশ বড় বড় নামকরা আলেমদের এমন সব অধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের সাথে সম্পর্ক ছিল যারা অনেক সময় লোকসমাজে আলেম হিসেবে পরিচিত ছিলেন না এবং আলেম হিসেবে তাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিও ছিলনা। যেমন- সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) এর সাথে সৈয়দ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) ও আবদুল হাই বোরহানভী (রহ.) -এর মতো যুগের অদ্বিতীয় আলেমের সম্পর্ক, সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক বানসাভীর সাথে মোল্লা নিজামুদ্দীনের (রহ.) মতো জগদ্বিখ্যাত আলেমের সম্পর্ক। হযরত ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মক্কীর (রহ.) সাথে মুজতাহিদ পর্যায়ের আলেম মাওলানা কাসেম নানুতুভীর (রহ.) সম্পর্ক। এ বিস্ময়কর বাস্তবতা সেসব মহান আলেমের নিষ্ঠা, অকৃত্রিম সত্যানুসন্ধিৎসা ও হৃদয়ের বিশালতার

প্রমাণ বহন করে। আর এই নিষ্ঠা ও লিল্লাহিয়্যাতই তাদের প্রতিটি কাজকে সুপ্রসারিত, সুদৃঢ় ও সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার পাশাপাশি অধ্যাত্মিক প্রয়োজন ও রোগ-ব্যাধির অনুভব ও তার প্রতিকারের জন্য স্বপ্রণোদিত উদ্যোগ এবং ইলমে সাথে সাথে একনিষ্ঠতা অর্জন ও আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ার অধীর আগ্রহ সৃষ্টি করা ছিল সেই প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি আলোকোজ্জল বৈশিষ্ট্য। যার একটি সুফল ছিল এই যে, সেই শিক্ষাব্যবস্থার জিম্মাদার আলেমদের সাথে সাধারণ মানুষের একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যা তাঁদের জীবনকে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় সুফল ছিল এই যে, তাঁরা সমকালীণ পূঁজিবাদী তৎপরতার লোভনীয় হাতছানি এবং শাসক শ্রেণীর সাথে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে অনেক নৈতিক দূর্বলতা থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, যা সাধারণ জ্ঞান ও মেধার মাধ্যমে সম্ভব নয়। যে একাগ্রতা-নিষ্ঠা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে সেইসব ওলামায়ে কেরাম ৭/৮শ' বছর পর্যন্ত নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এলাকার পর এলাকা আলোকিত করেছেন। তা ছিল সেই সাহচর্য, আধ্যাতিক সাধনা ও আত্মশুদ্ধিরই ফল যা তারা সেই সব আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ও মহান ব্যক্তিদের সংস্পর্শে লাভ করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত আরবী মাদ্রাসাগুলোতে লেখা-পড়া শেষ করে কোন অধ্যাত্মিক পীরের সাহচর্য লাভ করে আত্মশুদ্ধি করার একটি রীতি চালু হয়ে যায়। এমন একটি নিয়ম হয়ে যায় যে, কিছু সময় সেসব অধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলোতে অতিবাহিত করে এমন কিছু পূর্ণতা অর্জন করা শুধু মাত্র জ্ঞান অর্জন করে লাভ করা সম্ভব নয়। মাওলানা লুত্‌ফুল্লাহ্‌ সাহেবের দরসগাহে ইলম অর্জন করে ছাত্ররা পূর্বাঞ্চলের হেদায়তের কেন্দ্র মাওলানা ফজলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর (রহ.) খেদমতে উপস্থিত হতেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মাদ্রাসাগুলোর (দেওবন্দ সাহারানপুর) ছাত্রদের ঝোঁক ছিল থানাভোন ও গংগোহ এর দিকে, যেখানে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (রহ.), হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগোহী এবং তাঁদের খলিফারা শিক্ষা-দীক্ষা ও দাওয়াত প্রসারের কাজে নিমগ্ন ছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বর্তমান প্রাণকেন্দ্র ও তাদের শিক্ষা আন্দোলন সমূহ

দারুল উলূম দেওবন্দ ঃ

১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন ও জিহাদের (যার নেতৃত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ) বিপর্যয়ের পর বিশেষতঃ মুসলমানদের মাঝে হীনমন্যতা, পরাজয়ের গ্লানী ও হতাশার এক ব্যাপক মহামারী পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ সরকারের (যারা ধর্মীয়ভাবে খ্রিস্টান ছিল) সফলতার প্রেক্ষিতে খ্রিষ্টান মিশনারী এবং ধর্মযাজকদের সাহস অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এবং তাঁরা পরিস্কার ভাষায় এই দম্ভোক্তি করতে শুরু করে যে, এই ভারতবর্ষ ঈসা মসীহ্ (আ.) এর উপহার ও তাঁর প্রদত্ত আমানত এবং এদেশে খ্রিস্টধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে তাঁরা অঙ্গিকারাবদ্ধ। অপরদিকে মুসলমানদের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা, জীবন দর্শন ও সংস্কৃতির প্রভাবে ধর্মীয় ও চারিত্রিক বিশৃংখলা দেখা দেয়। স্বীয় ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এবং সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আগামী প্রজন্ম নিশ্চিতভাবে স্বীয় ধর্ম বিশ্বাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি তাহযীব-তামাদ্দুন এবং শরীয়ত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এহেন পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের ওলামায়ে কেরাম ধর্মীয় ও শিক্ষাগত সম্পদের সুরক্ষা এবং মুসলমানদের ধর্মীয় বন্ধন হিফাযত এবং চেতনাবোধের সংরক্ষণকল্পে এমন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন আবশ্যক মনে করলেন যা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর ধর্মীয় ও চারিত্রিক পতনকে রুখতে সক্ষম হবে এবং এসব শিক্ষাঙ্গন থেকে এমন সব সুদক্ষ ইসলামী পন্ডিত সৃষ্টি হবেন যাঁরা ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী হবেন। যাঁদের মধ্যে একই সাথে দাওয়াতী হৃদয়, সৈনিকসুলভ খিদমত এবং ইসলামী জ্ঞানের বিকাশ ও মানসিকতা বিদ্যমান থাকবে পূর্ণমাত্রায়। যাঁরা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই এদেশে মুসলমানদের ধর্মীয় খিদমত, পথনির্দেশনা, জ্ঞানের প্রসার ও সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবেন। এ ধারাবাহিকতায় দারুল উলূম

দেওবন্দ সর্বপ্রথম এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রাথমিক অবস্থায় দারুল উলূম দেওবন্দ ছোটখাট মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়, যার কোন গুরুত্ব ছিলনা কিন্তু মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষক-কর্মচারীদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও আন্তরিকতার ফলে দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হয়। বর্তমানে দারুল উলূম দেওবন্দ বড় মাপের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তথা পুরো এশিয়ার সবচে বড় দ্বীনি দরসগাহে পরিণত হয়েছে। ১২৮৩ হিজরীতে সাহারানপুরের এক পল্লী দেওবন্দ নামক এলাকার এক ছোট মসজিদের চত্বরে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপিত হয়। শুরুতে এটি একটি ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ছিল যা দেওবন্দের এক বুযুর্গ হাজী মুহাম্মদ আবেদ সাহেব (রহ.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু যাবতীয় উন্নয়ন, খ্যাতি, সর্বজনগ্রহণযোগ্যতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুভী (রহ.) এর অনুপম নিষ্ঠা, উঁচু মাপের লিল্লাহিয়্যাত, সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস, দূরদৃষ্টি, এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনার পবিত্র ফসল। প্রারম্ভকাল থেকেই তিনি এর সকল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকান্ডে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর সমুদয় মেধা, প্রতিভা, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তিকে এতে কেন্দ্রীভূত করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দারুল উলূম দেওবন্দ উঁচুমাপের নিষ্ঠাবান ব্যবস্থাপক ব্যক্তিবর্গ ও বুযর্গ আসাতিজা-শিক্ষকমন্ডলীর সহযোগিতায় ধন্য হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে তাকওয়া, পবিত্রতা, নিষ্ঠা, বিনয়-বিনম্রতার প্রাণ পুরো পরিবেশকে জীবন্ত করে রাখে। এসব মহৎগুণাবলীতে সমৃদ্ধ মহান শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে মাওলানা ইয়াকুব নানুতুভী, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী, মুফতী আযীযুর রহমান দেওবন্দী, মাওলানা গোলাম রাসূল বেলায়তী, মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা আসগর হোসাইন দেওবন্দী এবং মাওলানা এজায আলী সাহেব প্রমুখের নাম অবিস্মরণীয়। দারুল উলূম দেওবন্দের কর্মপরিধি দিন দিন বিস্তৃত হতে চলেছে। তার খ্যাতি এর শিক্ষক মন্ডলীর জ্ঞান গভীরতা, যোগ্যতা, তাকওয়া, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে তাদের বুৎপত্তির আলোচনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশঃ যুগ-যুগান্তরে। যার ফলে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের প্রচুর সংখ্যক জ্ঞান পিপাসু ছাত্র জ্ঞানার্জনের মহান লক্ষ্য নিয়ে দারুল উলূমে ভর্তি হয়। ১৩৮০ হিজরী সালের পরিসংখ্যান মতে ছাত্রসংখ্যা ছিল দেড়হাজার

বর্তমানে এ সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক'শ বছরের ইতিহাসে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে ৫হাজার নিয়ম মাফিক সনদ অর্জনকারী ছাত্র রয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহ থেকে আগত ছাত্রদের সংখ্যা ৫ শতাধিক। যার মধ্যে দাগিস্তান, আফগানিস্তান, কীব, বুখারা, কাজান, রাশিয়া, আজারবাইজান, মধ্য এশিয়া, এশিয়া মাইনর, তিব্বত, চীন, ভারত সাগর উপকূলীয় রাষ্ট্র সমূহ সহ অন্যান্য দেশের ছাত্র রয়েছে।

ভারতীয় মুসলমানদের জীবনধারায় দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তানদের সংস্কারধর্মী কর্মকান্ডের সুদূর প্রসারী প্রভাব সুস্পষ্ট। বিদআত-কুসংস্কারের মূলোৎপাটন, আক্বিদা বিশ্বাসের সংস্কার, তাবলীগে দ্বীন ও ভ্রান্ত সম্প্রদায় সমূহের সাথে জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক ইত্যাদি তাঁদের ঐতিহাসিক অবদানের স্বর্ণালী অধ্যায়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিত্ব রাজনীতির ময়দানে এবং প্রিয় স্বদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা সত্যোচ্চারণ ও নির্ভিক ভুমিকা পালনে ও পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টান্তকে নবরূপে জাতির সামনে উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন।
ইসলামের উপর অবিচল-দৃঢ়পদ, হানাফী মাযহাবের উপর বলিষ্ঠ ও অনঢ় অবস্থান পূর্বসূরীদের বর্ণনার সযত্ন সংরক্ষণ এবং সুন্নাত বিরোধী ক্রিয়াকলাপের প্রতিরোধ দারুল উলূম দেওবন্দের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে।

মাদ্রাসা মাযাহারুল উলূম ঃ

অপর বৃহৎ ইসলামী শিক্ষা নিকেতন মাদ্রাসা মাযাহারুল উলূম সাহারানপুরে অবস্থিত। ছাত্রসংখ্যা এবং ইসলামী শিক্ষার নিবিড় পরিবেশ বিচারে দারুল উলূম দেওবন্দের পরই এর অবস্থান। ১২৮৩ হিজরী সালে মাওলানা সা'আদত আলী সাহেব সাহারানপুরীর পবিত্র হস্ত মুবারকে এর ভিত্তি স্থাপিত। মাওলানা মুযহির নানুতুভীর নামে (সামান্য পরিবর্তন সহ) এর নামকরণ করা হয় মাযাহারুল উলূম। মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী এবং মাওলানা আশরাফ আলী

থানভী (রহ.) এর পবিত্র পৃষ্ঠপোষকতায় ধারাবাহিকভাবে ধন্য এ প্রতিষ্ঠান। এর সুযোগ্য নিষ্ঠাবান শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে মাওলানা সাবিত আলী, মাওলানা ইনায়েত আলী, মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া কান্দলভী, মাওলানা আবদুল লতীফ সাহারানপুরী, মাওলানা ইলিয়াস দেহলভী,মাওলানা আবদুর রহমান কামিলপুরী, শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া এবং মাওলানা আসাদুল্লাহ সাহেবের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাদ্রাসা মাযাহারুল উলূম স্বীয় বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, মূলনীতি, আক্বিদা-বিশ্বাসের বিবেচনায় দারুল উলূম দেওবন্দের অভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী। এখান থেকেও বিপুল সংখ্যক নিষ্ঠাবান জ্ঞান সেবক সৃষ্টি হয়েছেন, যারা হাদীস শাস্ত্রের খিদমতে গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য অবদান রেখেছেন এবং একাধিক হাদীস বিষয়ক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন । এখানকার বিপুল সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক স্বীয় জীবনধারা, অল্পেতুষ্টি এবং ধর্মের উপর অবিচলতায় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

দরসে নিজামীর অন্যান্য মাদ্রাসা সমূহ ঃ

ভারতবর্ষে দারুল উলূম দেওবন্দ এবং মাযাহারুল উলূম ছাড়াও এ পদ্ধতির অনুসারী বিপুল সংখ্যক দ্বীনি মাদ্রাসা রয়েছে যেখানে উক্ত মাদ্রাসাদ্বয়ের সিলেবাস (দরসে নিজামী) অনুসারে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে দারুল উলূমের শিক্ষাসংক্রান্ত সম্পর্ক রয়েছে। এসব মাদ্রাসা ধর্মের প্রসার, জ্ঞানের বিকাশ, আক্বিদার সংস্কার এবং মুসলমানদের ধর্মীয় খিদমত আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখে যাচ্ছে। এসব মাদ্রাসার মধ্যে উত্তর ভারতের মুরাদাবাদ এর শাহী মাদ্রাসা এবং দারভাঙ্গার এমদাদিয়া মাদ্রাসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আহলে হাদীস মতাবলম্বীদেরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাদ্রাসা রয়েছে। এর মধ্যে মাদ্রাসা রহমানিয়া দিল্লি, জামেয়া সালাফিয়া বেনারস, মাদ্রাসা আহমদিয়া সালাফিয়া, লাহরিসরাই (দারভাঙ্গা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারত বিভক্তির পর দিল্লির মাদ্রাসা রহমানিয়া বন্ধ হয়ে যায়। লাহারিসরাই এবং বেনারসের মাদ্রাসা স্বীয় খিদমতে রত আছে।

সরকারী, আধা সরকারী মাদ্রাসা সমূহের মধ্যে মাদ্রাসা আলিয়া রামপুরা, মাদ্রাসা আলিয়া কোলকাতা, মাদ্রাসা শামসুল হুদা পাটনা অন্যতম বৃহৎ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত। এককালে রামপুরা আলিয়া মাদ্রাসা এবং কোলকাতা মাদ্রাসা উঁচুমাপের শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতো। এর সুযোগ্য, বিজ্ঞ, মেধাবী, প্রতিভাবান ছাত্র-শিক্ষকগণের সুখ্যাতি সর্বত্র সুবিদিত। শিয়া-ইসনা আশরিয়াদেরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাদ্রাসা রয়েছে। শিয়ামতাবলম্বীদের অধিকাংশ শিক্ষাকেন্দ্র লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত। এসব মাদ্রাসার মধ্যে সুলতানুল আউলিয়া মাদারিস, মাদ্রাসা নাযেমিয়া এবং মাদ্রাসাতুল ওয়ায়েজীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতে (যেখানে জনগণের মাঝে ধর্মীয় চেতনা শিক্ষানুরাগ তুলনামূলক অধিক মাত্রায় বর্তমান) প্রচুর সংখ্যক আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। হায়দ্রাবাদে মাদ্রাসা নিযামিয়া, উমনাবাদ এর জামেয়া দারুস সালাম, ভেলোরের "আল-বাকিয়াতুস সালিহাত" বিশেষভাবে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। এককালে মাদ্রাসা জামালিয়া এক বহুমাত্রিক ও উন্নয়নশীল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতির প্রথম কাতারে ছিল। দীর্ঘদিন ধরে তা বন্ধ রয়েছে। সম্প্রতি এটি পুনরায় চালু করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে। মালাবার অঞ্চলে যা বর্তমান নতুন বৃহৎ এলাকা কেরালার অন্তর্ভূক্ত, প্রবল ধর্মানুরাগ ও আরবী ভাষার সাথে নিবিড় সম্পৃক্ততায় সমগ্র ভারতের সর্বাধিক অগ্রসর জনপদ হিসেবে পরিচিত। এই এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার মধ্যে রওজাতুল উলূম, মদীনাতুল উলূম, সুল্লামুস্ সালাম সহ আরো কতিপয় মাদ্রাসা রয়েছে যা কালিকাট এবং তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত। এতদঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, স্থানীয় ভাষা মালইয়ালম ও ইংরেজীর পরই আরবীর স্থান। যেটি দ্বিতীয় অগ্রগণ্য ভাষা হিসেবে মুসলমানদের স্কুল কলেজ সমূহে পড়ানো হয়ে থাকে। কেরালা সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয় আরবী ভাষার জন্য স্বতন্ত্র পাঠ্যক্রম পর্যন্ত তৈরী করেছে যা চমৎকাররূপে সফল হয়েছে।

গুজরাটেও রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন পুরাতন মাদ্রাসা। এর মধ্যে ডাভিলের জামেয়া ইসলামিয়া এককালে সেখানকার বৃহৎ ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যার সম্মানিত

শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে দারুল উলূম দেওবন্দের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী ও (রহ.) মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী (রহ.) প্রমুখের নাম প্রণিধানযোগ্য। রান্দিরের জামিয়া হোছাইনিয়া, জামিয়া আশরাফিয়া, ছাপী ও অনিন্দের কতিপয় আরবী মাদ্রাসা সমূহ এবং তারাকসীরের ফালাহ-ই-দারাইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ভারতের স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে দারুল উলূম হায়দ্রাবাদ, জামিয়া সুবুল আস-সালাম হায়দ্রাবাদ, জামিয়া সুবুল আর-রাশাদ, বাংলোর এবং জামিয়া মুহাম্মদীয়া মালিগাঁও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুরূপ অন্যান্য শহরগুলোতে বড় বড় আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জামিয়া পর্যায়ের বিদ্যাপীঠ অবস্থিত। বিহারে জামিয়া রহমানিয়া মুঙ্গিরা, দারবাঙ্গা মাদ্রাসা ইমদাদিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১]

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ ঃ

খ্রিষ্টান মিশনারীর সাথে ধর্ম বিষয়ক বিতর্কের বিখ্যাত বিতার্কিক তাবলীগী ও বিতর্ক বিষয়ক সাময়িকী *'তুহফায়ে মুহাম্মদীয়া'* এর সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা প্রধান, অনুভূতিপ্রবণ গভীর অধ্যবসায়ী, গবেষক সুলভ প্রতিভার অধিকারী মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী কানপূরী মুঙ্গিরী উপলব্ধি করলেন, ইউরোপীয় সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাবের মুকাবিলায় আধুনিক দায়ী এবং ইসলামের যোগ্য মুখপাত্র সৃষ্টির জন্য প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি, প্রাচীন ইলমে কালাম তথা অলঙ্কার শাস্ত্র এবং পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট কার্যকর ও ফলপ্রসূ নয়। এর জন্য প্রয়োজন একটি ব্যাপক সংস্কারকৃত শিক্ষাক্রম। যাতে অকেজো প্রাচীনপন্থী শিক্ষানীতির সংস্কার এবং ফলপ্রসূ-উপকারী নতুনত্বের সংযোজন হবে।

এটাই ছিল সেসময়কালের প্রেক্ষাপট যখন ফিক্‌হ বিষয়ক বিভিন্ন মতাদর্শ ও মাযহাব অবলম্বী মুসলমানদের যেমন- হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস প্রভৃতির মধ্যে পারস্পরিক বিতর্ক ছিল তুঙ্গে। যার

[১] নানা অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ক্রমশ অব্যাহত রয়েছে। যার সঠিক পরিসংখ্যান তৈরী দুঃসাধ্য কাজ। প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান গুলোর নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফলশ্রুতিতে অরাজকতা, দীর্ঘ মামলা-মোকাদ্দামা এবং মুসলমানদের মনগড়া বাড়াবাড়ির ধারা অব্যাহত ছিল।

তিনি উপলব্ধি করলেন, যতদিন মুসলমানরা, ওলামা ও শিক্ষিত সমাজ শিক্ষামূখী, উদার মানসিকতা, খুটিনাটি ও বিচ্ছিন্ন বিষয়াদির ব্যাপারে উদারতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম না হবেন ততদিন এ সমস্যার সমাধান হবেনা। দু'টি লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমকালীন ওলামায়ে কেরামের সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শে প্রথমে ১৩১০ হিজরীতে *'নাদওয়াতুল উলামা'* নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অতঃপর ১৩১২ হিজরীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র লক্ষ্ণৌতে সমকালীন সমমনা ওলামায়ে কেরাম ঘনিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় *'নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ'* প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের অধিকাংশ সংস্কারমনা, আন্তরিক-দরদী, নেতৃত্বস্থানীয় ওলামা, অগ্রসর আধুনিক শিক্ষিত মহল এবং জাতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফোরামের সচেতন পৃষ্ঠপোষগণ এ আন্দোলনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন।এবং ব্যবস্থাপনা ফোরামের সদস্য হিসেবে কার্যকরি পরিষদের কর্মতৎপরতার পরিসরে কর্মী হিসেবে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে আল্লামা শিবলী নো'মানী, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানী, মাওলানা আবদুল হক হক্কানী, মাওলানা শহা সুলাইমান ফুলওয়ারী, মুন্শী আতহার আলী কারকুবী, মুনশী ইহতেশাম আলী কারকুবী, মাওলানা ইব্রাহীম আরভী, কাজী মুহাম্মদ সুলাইমান মানসূরপূরী, মাওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী, স্যার রহীম বক্‌শ, মাওলানা মসীজ্জামান খান, (উস্তাদ মীর মাহবুব আল খান নেযাম দক্ষিণাত্য), মাওলানা খলিলুর রহমান সাহারানপূরী, (পুত্র মাওলানা আহমদ আলী সাহেব মুহাদ্দিস) , মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই হাসানী (রহ.), নবাব সাইয়েদ আলী হাসান খান, (পুত্র নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালের রাজা) এবং মাওলানা হাকীম ডা. সৈয়দ আবদুল আলীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১] " প্রত্যেক প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি থেকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত

---

[১] সর্বশেষ উল্লিখিত ৫জন যথাক্রমে নদওয়াতুল উলামার পরিচালক ছিলেন, ডা. সাইয়েদ আবদুল আলীর আমলে নদওয়াতুল উলামা সার্বিকভাবে ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। (মৃত্যু ঃ ৭ মে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ)

অবস্থান এক ধরণের বিদ'আত ও বিকৃতি।" এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের লাগামহীন আধুনিক পন্থা- যারা মনে করে "প্রত্যেক নতুন বস্তু সমাদর যোগ্য ও পূরণো মানেই পরিত্যাজ্য" দ্বীনি মাদ্রাসা সমূহের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচী বিষয়ক এধরণের বিপরীতমূখী চিন্তাধারার মাঝামাঝিই 'দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা'র অবস্থান। এর প্রতিষ্ঠাতাগণ উপলব্দি করতে সক্ষম হন যে, প্রাচীন ও আধুনিকতার বাড়াবাড়িমূলক অবস্থান, ওলামায়ে কেরামের প্রবল মতানৈক্য ও বিভক্তি, একদেশদর্শিতা ও ফিক্হী মতবিরোধের তীব্রতা ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস ও পতনকেই তরান্বিত করবে। নতুন ও পুরনোর সমন্বয় এবং ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থার মূলনীতির উপর নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ-এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এর দায়িত্বশীলবৃন্দের চিন্তাধারা ছিল দ্বীন একটি শ্বাশত ও চিরন্তন বস্তু যাতে পরিবর্তন- পরিবর্ধনের কোন অবকাশ নেই কিন্তু জ্ঞান ও শিক্ষা বরাবরই পরিবর্তনশীল। যাতে সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন একটি স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা। 'নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ'-এর প্রকৃত লক্ষ্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতভূক্ত বিভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীর মাঝে (যারা আকীদা ও ইসলামের মৌলিক বিষয়াদিতে একই বিশ্বাসের অনুসারী) ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা। সূচনালগ্ন থেকেই 'নাদওয়াতুল উলামা' ইসলামী শিক্ষা ও পাঠ্যক্রমকে পরিবর্তনশীল এবং প্রয়োজন অনুপাতে পরিমার্জন, সংস্কারের উপযোগী মনে করে। দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা একটি চিরন্তন সংবিধান ও জীবন পথের শ্বাশত গাইডবুক হিসেবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে ও দীর্ঘমেয়াদী পাঠ্যসূচীতে তা অন্তর্ভূক্ত করেছে। আরবী ভাষা ও সাহিত্যকেও একটি জীবন্ত ও গতিশীল ভাষা হিসেবে গুরুত্ববহ বিবেচনায় মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। কারণ আরবী ভাষাই কুরআন-হাদীস বুঝার চাবিকাঠি ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের রহস্য উন্মোচন সহায়িকা। নদওয়াতুল উলামা কখনো আরবী ভাষাকে মৃত ভাষা (যে ভাষায় কথা বলার ও লেখার লোক পৃথিবীতে দূর্লভ) হিসেবে ভাবেনি অথচ ভারতবর্ষ আরবীর সাথে ঠিক এমন আচরণই করে যাচ্ছিল। যেসব প্রাচীন বিষয়াদির উপকারিতা কালের প্রবাহে হ্রাস পেয়েছে নাদওয়া সে সব বিষয় পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দিয়েছে অথবা তার পরিমাণ অনেক কমিয়ে দিয়েছে তার স্থলে

এমনসব আধুনিক বিষয় সংযোজন করেছে যা বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহর বৈশ্বিক পরিসরে খিদমত আঞ্জাম দিতে সক্ষম এমন আলিমদের জন্য অতীব জরুরী।

সূচনালগ্ন থেকেই দারুল উলূম একটি ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে আসছে, আধুনিক পৃথিবীর সামনে বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে প্রভাববিস্তারশীল পন্থায় ও নতুন ধাঁচে উপস্থাপন করতে সক্ষম একটি দাওয়াতী কাফেলা সৃষ্টি করা হবে। আলহামদুলিল্লাহ্! নদওয়া তার লক্ষের পথে সন্তোষজনক সাফল্য অর্জন করেছে এবং খুব স্বল্প সময়ে এমন সব ইসলামী পন্ডিত- ওলামা তৈরী হয়েছে যারা আধুনিক ইসলামী দুনিয়ার জন্য অনুসরণ যোগ্য। এসব সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ইসলামী সাহিত্য, অলঙ্করণ শাস্ত্র, ইতিহাস, সীরাতে নববী (স.) প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ সৃষ্টি করে পৃথিবীকে চমৎকৃত করেছেন।

দারুল উলূম থেকে সৃষ্ট এসব ভূবনখ্যাত প্রতিভার মধ্যে মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.) ও মাওলানা আবদুল বা'রী নদভীর (রহ.) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত ব্যক্তি আল্লামা শিবলী নো'মানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান *'দারুল মুসান্নিফীন'* আজমগড়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানেই দারুল উলূম নদওয়ার সুযোগ্য সন্তানরা ইসলামী সাহিত্য, ইতিহাস এবং ইসলামী গবেষণামূলক বিভিন্ন রচনাকর্ম এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশনার জন্য পেশ করেছেন। অতঃপর তিনি ভূপাল সরকার ও পাকিস্তানে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গবেষণা বিষয়ক খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। দ্বিতীয়োক্ত আধুনিক দর্শন শাস্ত্রে উঁচু মাপের শিক্ষক, পন্ডিত ও হায়দ্রাবাদ উসমানিয়া ইউনিভার্সিটির বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মূল্যবাবন, তথ্যবহুল ও গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয় ছাড়াও 'নদওয়াতুল উলামা' লক্ষ্মৌ থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক লেখক, গবেষক, শিক্ষা ও সামাজিক পরিমন্ডলে অগ্রণী ভুমিকা পালনকারী ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি হয়েছেন।

নাদওয়াতুল উলামা কেবল আরবী ভাষা ও সাহিত্যে নিজেদের প্রণীত স্বীয় প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পাঠদান করে যাচ্ছে তা নয় বরং এ প্রতিষ্ঠান থেকে সৃষ্ট সুযোগ্য ও প্রতিভাবান লেখকদের আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক উন্নত আরব বিশ্বে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে এবং একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ভূক্ত রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানেরই সৃষ্ট বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও লেখক-গবেষকদের প্রবর্তিত নতুন ধারা আরব বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে ও অনুসরণযোগ্য হিসেবে ঈর্ষণীয় গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থায় নদওয়াতুল উলামার চিন্তাধারা ও বৈপ্লবিক কার্যক্রম ঃ

নাদওয়াতুল উলামার সবচেয়ে বড় অবদান হলো পাঠক্রমের সেই নতুন রূপরেখা যা এখানে প্রণীত হবার পর বহু সংখ্যক মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ তা সাদরে গ্রহণ করেছে। অতঃপর সেটা অথবা তার আদলে নতুন সিলেবাস প্রবর্তন ও প্রণয়ন করেছে। এই সিলেবাস সাম্প্রতিক কালের বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোতে প্রচলিত সিলেবাসগুলোর সর্বজন গ্রাহ্য মূলনীতিকে গ্রহণ করেই বিন্যাস করা হয়েছে, শিক্ষার দ্বিমূখী ধারাকে এক ধারায় কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে এবং সমকালীন জীবন সমস্যার সমাধানে যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয় সংযোজন করা হয়েছে। সিলেবাসকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক এ ধারাবাহিক ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এবং এতে ধর্মীয় বিষয়াদি স্বীয় কলেবরে অক্ষুন্ন রেখে আনুষঙ্গিক বিষয়াদিকে প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করে পাঠ্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গ এবং চাহিদা পূরণের উপযোগী করে সাজানো হয়েছে।

এর ফলশ্রুতিতে নদওয়াতুল উলামা থেকে এমন বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিভাধর যোগ্য ব্যক্তি সৃষ্টি হয়েছেন যারা কেবল উর্দু ভাষাতেই নয় আরবী ভাষায়ও স্বীয় অনন্য যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আরবী ভাষায় তাঁদের রচনাকর্ম ও সৃজনশীল অবদানকে শিক্ষিত ও বিদগ্ধ মহল সপ্রশংস স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁরা গবেষণা ও সাহিত্য বিষয়ক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক

একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং নাদওয়াতুল উলামার চিন্তা-চেতনার আলোকে পরিচালিত ডজন খানেক মাদ্রাসা দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশের বাইরে মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে নেপালের দারুল উলূম নুরুল ইসলাম জিলপাপুর, বাংলাদেশে দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া, মালয়েশিয়ায় দখ্বতি তারবিয়্যা আল ইসলামিয়া সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশের অভ্যন্তরে দারুল উলূমের মডেলে 'দারুল উলূম তাজুল মাসাজিদ' ভূপাল, 'কাশেফুল উলূম' আওরঙ্গাবাদ, 'জামিয়া ইসলামিয়া' বাটকল, 'ফালাহুল মুসলিমীন' রায়বেরেলী সর্বশ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা তথা ইসলামী বিদ্যাপীঠ হিসেবে সুপরিচিত।

মাদ্রাসাতুল ইসলাহ্ সরাইমীর ঃ

১৯০৯ ইংরেজী সালে দারুল উলূমের পদ্ধতি অনুসরণে আজমগড় জিলার সরাইমীর অঞ্চলে মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রহ.) মাদ্রাসাতুল ইসলাহ এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এ মাদ্রাসায় কুরআনের তাফসীর ও চর্চাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। মাওলানা হামীদুদ্দীন (রহ.) স্বীয় তাফসীরে যে পদ্ধতির ভিত্ রচনা করেছেন, মাদ্রাসার শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্ররা ঠিক এ পদ্ধতি অনুসরণ করেই অধ্যয়ন করে থাকেন। অনাড়ম্বর বসবাস ও শিক্ষার অনুকুল পরিবেশের বিবেচনায় এটি শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা।

জামেয়াতুল ফালাহ্ আজমগড় ঃ

একই মূলনীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে আজমগড়ের বলইয়ারগঞ্জে গড়ে উঠে জামেয়াতুল ফালাহ্। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশেষ শিক্ষিত মহলের মনোযোগ বরাবরই সম্পৃক্ত। কচি-কাঁচা ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এখানে ব্যাপক ও সমৃদ্ধ ব্যবস্থাপনা রয়েছে। সাম্প্রতিককালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জামেয়া ইসলামিয়া মুজাফফরপূর নামে আরেকটি মাদ্রাসা। এটি প্রচুর সম্ভাবনাময় একটি প্রতিষ্ঠান।

দারুল উলূম ভূপাল ঃ

ভূপাল ভারতের বড় ধরণের শিক্ষা-দীক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল। ১৯৪৮ সালে বিভিন্ন রাজ্যের ভারত ইউনিয়নে অন্তর্ভূক্তির কারণে মনে হয়েছিল ;

শুধু ভূপাল নয় বরং পুরো মধ্যবর্তী অঞ্চলে (বর্তমান মধ্যপ্রদেশ) দ্বীনি শিক্ষার প্রদীপ নিভে যাবে কিন্তু ভাগ্যক্রমে কতিপয় দরদী, দূরদর্শী, আত্মপ্রত্যয়ী ওলামায়ে কেরামের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়। ১৩৭৯ হিজরীতে মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নাদভীর (রহ.) (যিনি তৎকালীন বিচারপতি ও জামেয়া আহমদিয়ার প্রধান হিসেবে সেখানে অবস্থান করতেন) দিক নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মাওলানা ইমরান খান সাহেবের সাহস, ব্যাপক প্রচেষ্টা ও প্রয়াসে ভূপালের বৃহৎ পরিসর সম্পন্ন মসজিদ 'তাজুল মাসাজিদ'-এ নদওয়াতুল উলামার চিন্তাধারা এবং এরই পাঠ্যক্রম অনুসরণে দারুল উলূম নামক মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা মধ্য প্রদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ মাদ্রাসা এবং মাওলানা ইমরান খানের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়ে আসছে।

আধুনিক শিক্ষার মুসলিম প্রতিষ্ঠান ঃ

দারুল উলূম দেওবন্দের পদ্ধতি অনুসৃত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের বিপরীতে মুসলমানগণ আলীগড়, দিল্লি এবং হায়দ্রাবাদে বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম তরুণ-যুবকদের আধুনিক ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ, বিদেশী ভাষা শিক্ষা, সরকারী বিভিন্ন পদে অংশ গ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতিতে যথাযথ অংশ গ্রহণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এসব প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করা হয়।

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ঃ

মুসলমানদের আধুনিক চিন্তা চেতনা, জাতীয় মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে সক্রিয় অংশ গ্রহণে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ভারতবর্ষের বৃহৎ আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বিশিষ্ট মুসলিম দিকপাল ও বরেণ্য শিক্ষাবিদ স্যার সৈয়দ আহমদ খান মাদ্রাসাতুল উলূম নামে এটা প্রতিষ্ঠা করেন, পরে তা সাধারণ সমাজে আলীগড় কলেজ নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৭৫ সালে সিপাহী বিপ্লবের পর মুসলমানরা শিক্ষা, সংস্কৃতির পরিমন্ডলে বিপর্যয় ও পতনের মুখোমূখী হয়। ইংরেজদের

বিজয়ের প্রেক্ষাপটে তাদের ব্যাপক হতাশা, সর্বপ্লাবী অনিশ্চয়তা ও ভবিষ্যত সম্পর্কে মারাত্মক নিরাশার প্লাবন দেখা দেয়। সরকার মুসলমানদের বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখতো, মুসলমানদের ব্যাপারে সরকারী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বাভাবিক ও ব্যাপার। ফলে সরকারী চাকুরীসহ যেকোন কর্মকান্ডে মুসলমানদের অংশগ্রহণের সকল দরজা ছিল প্রায় রুদ্ধ। অথচ সাম্প্রতিক অতীতেই মুসলমানদের হাতে ছিল ক্ষমতার বাগডোর কিন্তু আজ তাঁদের ক্ষমতার অলিন্দ ও কর্মব্যবস্থার আশ পাশ থেকে পর্যন্ত দূরদূরান্তে নির্বাসিত করা হয়েছে নির্মম ভাবে। স্যার সৈয়দ আহমদ খান অত্যন্ত সুক্ষ্ণ, সচেতন স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বীয় দূরদৃষ্টির আয়নায় মুসলমানদের শৌর্য বীর্য ও ক্ষমতার সুর্য অস্ত মিত হবার দৃশ্য অবলোকন করলেন। মুসলমানদের এ করুণ অবস্থাদৃষ্টে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং স্বীয় চিন্তাধারার আলোকে এ পরিস্থিতির পরিবর্তনের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তিনি ভাবলেন, যতদিন মুসলমানগণ উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষা অর্জন না করবে, নিজেদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে প্রয়াসী না হবে, জীবনযাপনের প্রণালী, লেবাস-পোষক ও জীবনাচারের মানসম্মত নেতৃত্বের রঙে রঙিন না হবে ততদিন পর্যন্ত না তাদের হীমন্যতা দূর হবে ; আর না এদেশের বহিরাগত শাসকগণ তাদের সমীহ ও শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। তাঁর চিন্তাধারা রূপায়ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি প্রতিষ্ঠা কররেন এই ইসলামী বিদ্যাপীঠ, যা ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে আলীগড় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুসলিম ইউনিভার্সিটি তার লক্ষ্যার্জনে সন্তোষজনক সাফল্য অর্জন করে । সারাদেশের বিপুল সংখ্যক সম্ভ্রান্ত, (Aristrocrate) স্বচ্ছল মুসলিম পরিবারের সন্তানেরা এ শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে আসে এবং লেখাপড়া শেষে সরকারী উচ্চ থেকে উচ্চতর পদগুলোতে তাঁরা অধিষ্ঠিত হন। মুসলিম ইউনিভার্সিটি রাষ্ট্রের রাজনীতি বিশেষতঃ মুসলিম রাজনীতিতে পথনির্দেশক হিসেবে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। এখান থেকেই উঠেছিল সর্বভারতীয় অভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপরীতে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক আন্দোলন, যার নেতৃত্ব সম্ভ্রান্ত ও সুশীল মুসলিম সমাজের হাতে। ভারত বিভাগের পরও আলীগড় ও মুসলিম ইউনিভার্সিটি স্বমহিমায় ও বিপুল বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে আজো।

এতে নানা দিক এর প্রভূত উন্নতিও সাধিত হয়েছে। এতে সংযোজিত হয়েছে চিকিৎসা অনুষদ, প্রকৌশল অনুষদ ও আধুনিক নানা বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। মুসলমানদের সংশ্লিষ্টতা আছে এমন ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে এটি সর্ব বৃহৎ শিক্ষাঙ্গন। পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় এই ভার্সিটি অন্যান্য ভার্সিটির উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।

জামিয়া মিল্লিয়া দিল্লি ঃ

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির কতিপয় কৃতি ছাত্র খেলাফত আন্দোলনের সময় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথক হয়ে যায়; তাঁরা ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন ; যার নামকরণ করা হয় 'জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া' যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.) পরে এটি দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। এই শ্রেণীটির নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহার (রহ.)। তাঁর অন্যতম সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন হাকীম আজমল খান মরহুম এবং ডা. মুখতার আহমদ আনসারী। এখানকার শিক্ষক মন্ডলীর দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও কুরবানীর মানসিকতা অনন্য ও ভাস্বর হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ ডা. জাকির হোছাইন খানের নেতৃত্বে (প্রাক্তণ রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী ভারত) এবং তাঁর বিজ্ঞ নির্দেশনায় এ প্রতিষ্ঠান প্রতিকূল ও বৈরী চিন্তার ভয়াবহ তুফান এবং জটিলতর সংকট মুকাবিলা করেছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান, শিক্ষার সাহিত্যের পরিমন্ডলে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বর্তমানে এটি কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণত হয়। এতে মুসলিম ছাত্রের তুলনায় হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জামেয়া উসমানিয়া হায়দ্রাবাদ ঃ

জামেয়া ইসলামিয়া হায়দ্রাবাদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এখানে উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয় যা ভারতের জ্ঞান চর্চার ভাষা। আধুনিক জ্ঞান, দর্শন, হিকমাত, মনস্তত্ত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজ তত্ত্ব, ইতিহাসের এক বিশাল ভান্ডার, অন্যভাষা থেকে

উর্দুতে অনূদিত হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন শাস্ত্রগত পরিভাষাগুলোর উর্দু রূপান্তর এবং প্রণয়নের কাজ আঞ্জাম দেয়ার মহান কর্তব্য সমাধা হয়ে যায়। অনুরূপভাবে এ প্রতিষ্ঠান উর্দু ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ভারতের কতিপয় সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলী এবং বিশেষজ্ঞ শাস্ত্রবিদ এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার খিদমত করেন।[১] পরিবর্তনের হাওয়া লেগে এটিও অন্যসব ইউনিভার্সিটির মত গতানুগতিক ও একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং উর্দুর পূর্বেকার সেই গুরুত্বও আর বাকী নেই। এসব বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও মুসলমানরা বিভিন্ন জায়গায় ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে কিছু স্বাতন্ত্রিক ব্যতিক্রম বাদে সাধারণতঃ সরকারী পাঠ্যক্রম ও বিষয়াদিই পড়ানো হয়। উত্তর ভারতের প্রায় প্রতিটি বড় শহরেই এ ধরণের ইন্টারমেডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজ অবস্থিত। দক্ষিণ ভারত, মাদ্রাজ ও কেরালাতে অনেক মুসলিম কলেজ রয়েছে, যার মধ্যে মাদ্রাজের নিউ কলেজ, ট্রিচিনিপলীর জামাল মুহাম্মদ কলেজ, করনুলের উসমানিয়া কলেজ এবং ক্যালিকটের অদূরে ফারুক কলেজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে আজমগড়ের শিবলী কলেজও উল্লেখ করার মতো প্রতিষ্ঠান।

দারুল মুসান্নিফীন আজমগড় ঃ

মাওলানা মানযূর নো'মানী ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে আজমগড়ে এক মর্যাদাশীল শিক্ষা ও প্রকাশনা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন, যা *'দারুল মুসান্নিফীন'* নামে নামকরণ করা হয়। এর জন্য তিনি স্বীয় ব্যক্তিগত বাগান ও বাংলো ওয়াকফ করে দেন। তাঁর পর ২৫০ বছরের অধিককাল পর্যন্ত মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভীর (রহ.) সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুদক্ষ পরিচালনায় ধন্য ও সমৃদ্ধ হয় এই একাডেমী। এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ লেখক ও গবেষকগণ মাযহাব, ইতিহাস ও সাহিত্যের নানা বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন; যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্ততঃ উর্দু ভাষায় শীর্ষ

---

[১] যথা মাওলানা সাইয়েদ মানাযির আহসান গিলানী (রহ.) চেয়ারম্যান- দ্বীনিয়াত বিভাগ, মাওলানা আবদুল বা'রী নদভী, শিক্ষক-দ্বীনিয়াত ও আধুনিক দর্শন, প্রফেসর ইলিয়াস বারণী, শিক্ষক- সমাজ বিজ্ঞান, ডা. খলিফা আবদুল হালীম, অধ্যাপক- আধুনিক শাস্ত্র, ড. মীর ওয়ালিউদ্দীন (দর্শন) ড. হামীদুল্লাহ্, (রাষ্ট্রনীতি) ,হারুন খান শিরওয়ানী ড. রকীবুদ্দীন সিদ্দিকী, (হিসাব বিজ্ঞান), ড. মুহিউদ্দীন কাদেরী জূর, (উর্দু), ড. সাইয়েদ আবদুল লতীফ (ইংরেজী)।

শ্রেণীর গ্রন্থ। এখানে লিখিত কতিপয় গ্রন্থ অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থ থেকেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠ ও অনন্য, যা ছাড়া কোন কুতুবখানা বা গ্রন্থাগার পূর্ণতার দাবী করতে পারেনা। বিখ্যাত শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকী *'আল-মারুফ'* ও দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশিত হয়, যার সম্পাদক মাওলানা সুলাইমান নদভী (রহ.)। তাঁর পর তাঁর সুযোগ্য ছাত্ররা যথাক্রমে এ দায়িত্বপালন করেন। যাদের মধ্যে মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদভী, মাওলানা আবদু সালাম কিদওয়ায়ী নাদভী, এবং সাইয়্যেদ সাবাহ উদ্দীন আবদুর রহমান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নদওয়াতুল মুসান্নিফীন দিল্লি ঃ

দিল্লিতে অবস্থিত 'নাদওয়াতুল মুসান্নিফীন' এ শ্রেণীরই অপর শিক্ষা সংস্থা। যা ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক কয়েক ডজন গ্রন্থ প্রকাশ করে। দেশের শিক্ষিত ও ধর্মীয় মহলে এসব গ্রন্থ ব্যাপক সমাদর লাভ করে। এর প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকদের মধ্যে মাসিক *'বুরহান'* সম্পাদক মাওলানা মুফতী আতীকুর রহমান উসমানী ও মাওলানা সাইয়েদ আহমদ আকবরাবাদীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মজলিস-ই- তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে
ইসলাম নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ ঃ

কতিপয় বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন ও ইসলামের চৌকস দাঈর প্রচেষ্টায় ১৯৫৯ ইংরেজীতে নদওয়াতুল উলামার চৌহদ্দিতে প্রতিষ্ঠিত হয় মজলিসে-ই-তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-ই-ইসলাম। এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো, আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীকে যারা ইসলামী মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে গেছেন, ইসলামের আবেদন, বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠত্বের সাথে নতুন ভাবে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া। এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ভাষায় বেশ কিছু গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ প্রবন্ধ আধুনিক শিক্ষিত লোকদের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে, যাতে তাঁরা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পান। *'নতুন তুফান ও তার প্রতিকার'* নামক এক পুস্তিকা দিয়েই কার্যক্রম শুরু হয়। এই পুস্তিকা যা দিয়ে অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরম্ভ ; আধুনিক শিক্ষিতদের ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরত্ব ও ইসলামী আক্বিদা, আমল প্রভৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা যে

ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তা চমৎকারভাবে এতে চিত্রায়িত হয়েছে এবং ক্রমশ এর ফলে ইসলামের সাথে আধুনিক শিক্ষিতদের বন্ধন শিথিল হবার বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে সার্থকভাবে। আর এই বন্ধনকে পুনঃউজ্জীবিত ও সুদৃঢ় করার মহান লক্ষ্যে এধরণের পরিশীলিত প্রবন্ধ-পুস্তিকার রচনা ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে তা প্রকাশ ও প্রসার করা একটি অতীব জরুরী কর্তব্য। এতে ইসলামী চিন্তাধারা, সংস্কৃতি এবং দ্বীনের স্বরূপ হৃদয়গ্রাহী ও মনোজ্ঞ রীতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এটা সময়ের এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ও দাবীও বটে। উপরিউক্ত লক্ষ্য হাসিলের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইসলামী শিক্ষাবিদদের মনোযোগ ও পারস্পরিক মতবিনিময় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। উল্লিখিত আমার ছোট পুস্তি কাটি আরবী, উর্দু এবং ইংরেজী তিন ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছে এবং বেশ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এর পর থেকে এই প্রতিষ্ঠান বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতে শুরু করে। আনুমানিক ৩২/৩৩ বছরে আড়াই শ'-এর মত গ্রন্থ এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়ে সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে। কতিপয় গ্রন্থের ইংরেজী, আরবী, ফার্সি, তুর্কী, ফরাসী, ইন্দোনেশিয়ান ও হিন্দী ভাষায় অনুবাদও প্রকাশিত হয়। এসব গ্রন্থ শিক্ষিত মহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। এসব কিতাবাদির লেখকদের মধ্যে এমন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদগণও আছেন যাদের রচনাকর্ম ও গ্রন্থ সর্বত্র ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, শরয়ী বিধানের গুঢ়রহস্য, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী গবেষণা ও চিন্তাধারা, ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলাম ও অনৈসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক বিশ্লেষণ, মুসলিম দেশ সমূহে দাওয়াতী সফরের ইতিবৃত্ত, দাওয়াতী বক্তৃতা সমূহ এবং এ ধরনের বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইংরেজীতে এর নাম ঃ Academy of Islamic Research & Publication আরবীতে 'আল-মাজমাউল ইসলামী আল-ইলমী'। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও তার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা ও সার্বিক তৎপরতার জন্য একটি স্বতন্ত্র পরিষদ রয়েছে। এর সাথে দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষিত মহল এবং লেখক-গবেষকগণ সম্পৃক্ত আছেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার অঙ্গনে

অবস্থিত। নাদওয়াতুল উলামা এবং প্রতিষ্ঠার পরস্পর সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ।

আলীগড় মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স ঃ

মুসলিম এডুকেশনাল কন্‌ফারেন্স ভারতবর্ষের মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রাচীনতম শিক্ষা সংস্থা, যা ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমদ খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষের মুসলমানদের মাঝে শিক্ষা ব্যাপক প্রসার ও মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাদি সমাধান করা। মুসলমানদের শিক্ষা ও রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টিতে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা চোখে পড়ার মতো। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগের আন্দোলনের সৃষ্টি এখান থেকেই হয়। ১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হওয়ার পর এ প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিধি ও তৎপরতা অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। অতীতে ভারতবর্ষের বিখ্যাত ও মর্যাদাশীল শিক্ষাবিদ, রাজনীতিকগণ বিশেষত স্যার সাইয়েদ আহমদ খান, নবাব ভিকারুল মুলক, নবাব সদর ইয়ার জঙ্গ, মাওলানা হাবীবুর রহমান শিরওয়ানী প্রমুখ এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁরা স্বীয় যুগে এ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ছিলেন।

ধর্মীয় শিক্ষাবোর্ড ও শিক্ষা কাউন্সিল ঃ

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর যদিও নিজের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় সংবিধান বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমতা ভিত্তিক নীতিমালা ও নাগরিক মর্যাদা প্রদান করেছিল এবং তাদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের অঙ্গীকার করেছিল। এসব কিছুর পরও বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এসে এমন কতিপয় শিক্ষানীতি মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়, যা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নাস্তিক্যের দ্বার উন্মোচন করে দিলো, এটা তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও মৌলিক নীতিমালার বীজকে অঙ্কুরেই নিঃশেষ করে দেয়ার নামান্তর।[1] এসব ভয়ঙ্কর সংকট মুকাবিলা এবং তাদের জাতীয় অস্তিত্ব, চেতনা ও মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর প্রদেশ

---

[1] বিস্তারিত জানার জন্য "মুসলমানদের বর্তমান সমস্যা ও তার প্রতিকার" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ধর্মীয় শিক্ষাবোর্ড এবং ধর্মীয় শিক্ষা কাউন্সিল। ধর্মীয় শিক্ষা কাউন্সিল বিভিন্ন পেশা ও চিন্তাধারার নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের পথনির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় শিক্ষা আন্দোলনের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

দায়েরাতুল মা'আরিফ হায়দ্রাবাদ ঃ

ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র গুলোর মধ্যে দায়েরাতুল মা'আরিফ হায়দ্রাবাদ এর অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিষ্ঠান ধর্ম, ইতিাস ও শিক্ষা বিষয়ক বেশ কিছু অমূল্য গ্রন্থ প্রাচীন গ্রন্থাগারের অতল গহ্বর থেকে বের করে এনে প্রকাশনা ও পরিবেশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে দেশের শীর্ষ পুরোধা ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ হোসাইন বিলগ্রামী, মোল্লা আবদুল কাইয়ুম, ফযীলত জঙ্গ মাওলানা আনওয়ার খান, হায়দ্রাবাদের সাবেক প্রধান উস্তাদ মীর উসমান আলীর প্রাণান্তকর প্রয়াসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 'দায়েরাতুল মা'আরিফ' হাদীস বর্ণনাকারীগণের ইতিবৃত্ত, ইতিহাস, হিসাব বিজ্ঞান এবং দর্শন শাস্ত্রের এমন দেড় শতাধিক কিতাব পাঠকের খিদমতের উপস্থান করে যা ইতোপূর্বে প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলো। শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ, প্রাজ্ঞ শিক্ষক মহল, বিদগ্ধ গবেষক শ্রেণী এতদিন এসব গ্রন্থের কেবল নাম শুনে আসছিলেন। 'দায়েরা' এর উদ্যোগের সুবাদে এই প্রথম গ্রন্থগুলো আলোর মুখ দেখলো। ওলামায়ে কেরাম ও বিশ্লেষক মহল এসব গ্রন্থ থেকে প্রভূত উপকৃত হচ্ছেন। 'দায়েরা' এর এই কার্যক্রম শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সর্বোপরি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য এটি চিরন্তন ও যুগান্তকারী শিক্ষা কার্যক্রম এবং তাদের উন্নত জ্ঞান, অভিরুচি ও ধর্মীয় কৃতিত্বের সাক্ষর হয়ে থাকবে।[১] প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বরেণ্য ও শীর্ষ শিক্ষাবিদগণ এই গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের মহান খিদমতগুলোর সপ্রশংস স্বীকৃতি দিয়েছেন। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে জামেয়া আল-আযহার এর একটি শিক্ষা প্রতিনিধি দল ভারত

---

[১] মাওলানা সাইয়েদ হাশেম নদভী, ডা. আবদুল মুয়ীদ খানের পরিচালনায় এ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ব্যাপী তার মহান খিদমত আঞ্জাম দিয়ে এসেছে। আর্থিক টানাপোড়েন ও প্রতিকূলতার মাঝেও এটি আজো টিকে আছে।

সফরে আসলে প্রতিনিধি দলের প্রধান দায়েরাতুল মা'আরিফ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ

"ইসলামী রচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান যে অবদান

রেখে চলেছে তা আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছি।"

পূর্ববর্তী ওলামা এবং গবেষকদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় গ্রন্থ যা এ যাবতকাল যবনিকার আড়ালে ছিল এবং যেসব গ্রন্থাবলীর চিহ্ন পর্যন্ত হারিয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু এসব গ্রন্থের নামের গুঞ্জরণ মৃদু অনুরণিত হচ্ছিল। জ্ঞান পিপাসু অন্তর ও অনুসন্ধিৎসু প্রতিভা এসব গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবার জন্য ছটফট করছিল উদগ্র তৃষ্ণায়। দায়েরাতুল মা'আরিফ এর উৎসাহী কর্মী ও শিক্ষানুরাগী দায়িত্বশীলগণ এসব গ্রন্থরাজি কেবল খুঁজে বের করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং ফলপ্রসূ সংযোজনে সুসমৃদ্ধ করে তা প্রকাশ করেছেন। একাজে একদিকে তারা বিশাল ব্যয় বহুল প্রকল্পের ঝুঁকি নিয়েছেন এবং অন্যদিকে পরিমার্জন, বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেধা ও প্রতিভার অসামান্য পরিশ্রমের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

দারুত তারজুমাহ্ মরহুম ঃ

উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হায়দ্রাবাদ কর্তৃক যখন উর্দূ ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখন ১৩৩৫ হিজরী মুতাবিক ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে দারুত তারজুমাহ'র ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান ৩৫৮টি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এসব গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, আইন শাস্ত্র, জীববিদ্যা, দর্শন, মানতিক, মনস্তত্ত্ব, প্রকৃতি, নৈতিকতা, হিসাব বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে। দারুত তারজুমাহ'র গুরুত্বপূর্ণ অবদান সমূহের অন্যতম হল, শিক্ষার পরিভাষা সমূহের ব্যাপক প্রচলন ও উর্দুতে তা ভাষান্তরের খিদমত আঞ্জাম দেয়া; যার মাধ্যমে ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতিটি ফোরাম উপকৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষাবিদ, লেখক-গবেষক এ প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষাবে জড়িত ছিলেন। এদের মধ্যে ডা. মাওলানা আবদুল হক, মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, মাওলানা আবদুল্লাহ্

আল-ইমাদী, মাওলানা ওয়াহিদুদ্দীন সলিম পাণিপথী, মাওলানা ইনায়েতুল্লাহ্ দেহলভী, মাওলানা মাসউদ আলী মাহভী এবং কাজী তিলমীয হোসাইন গোরকপুরী সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দারুত তারজুমাহর বার্ষিক বাজেট ছিল ২,৬১,৪১৫ রুপি। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের পতনের পর এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। অগ্নিসংযোগে গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হয়। ফলে কোটি কোটি টাকার পূঁজির এই বিশাল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যায়।

জামাআতে ইসলামীর পাঠ্যক্রম ও মুসলিম সন্তানদের চাহিদা ঃ

ইসলামী সাহিত্যের প্রসারে ভারতীয় জামায়াতে ইসলামী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। উর্দূ এবং হিন্দি ভাষায় বলিষ্ঠ ইসলামী সিলেবাস ও পাঠ্যসূচীর গ্রন্থাবলী রচনা ও বিন্যাসকর্মে মুসলিম সন্তানদের প্রয়োজন পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে জামায়াতে ইসলামী ভারত। এই সব পাঠ্যক্রম বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরের বেশ কিছু বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

প্রাচীণ গ্রন্থাগার সমূহ ঃ

ভারতীয় মুসলমানদের প্রবল শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগের নিদর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের মর্যাদা ও খ্যাতির মাধ্যম হিসেবে সুপরিচিত সেই ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গ্রন্থাগার সমূহ; যা মুসলমানদের শেষ যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের মুসলিম নেতৃবর্গ, নবাবগণ ও উলামায়ে কেরাম বড় বড় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রতি অত্যধিক আগ্রহে মনোযোগ দিতেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য গ্রন্থগার অবস্থিত। সাম্প্রতিক কালের সর্ববৃহৎ ইসলামী পাঠাগার ও গ্রন্থাগার বাংকীপুর ও পাটনার খোদাবখস লাইব্রেরী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভারতে প্রাচীন শিক্ষা আন্দোলন ঃ কেন্দ্র ও বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ ঃ

ভারতের মুসলিম যুগে প্রচলিত পাঠ্যসূচীর বিন্যাস এবং সেই পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধনের ইতিহাস খুবই দীর্ঘ ও সুক্ষ্ম। কারণ তা আটশ' বছরের জ্ঞান ও শিক্ষার এমন এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা যার বিষয়গুলো ইতিহাস, মনীষীদের জীবনী, বুজুর্গদের মুখের বাণী এবং তাদের লেখাতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। একইভাবে সেই পাঠ্যসূচীর প্রবর্তক, শিক্ষক এবং শিক্ষাকেন্দ্র গুলোর তালিকাও সুদীর্ঘ। মুসলমান রাজা-বাদশাহ, আমীর, হিতাকাঙ্ক্ষী, বিদ্যোৎসাহী ও মধ্যবিত্ত লোকেরাই গ্রাম-গঞ্জে, জায়গায়-জায়গায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এখন সেগুলোর সঠিক সংখ্যা ও ধরণ বা পদ্ধতি জানার উপায় নেই।[১]

এ পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন সময় যে সব পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে এবং তা এ ক্ষেত্রে যেসব পরিবার-খান্দানের কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে সেসবের বিবরণও এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের অওতা বহির্ভূত। গোটা বিষয়টাই গবেষণামূলক। এখানে ভারতের মুসলিম যুগের এক খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ মাওলানা হাকীম আবদুল হাই (রহ.)-এর এতদ সংশ্লিষ্ট একটি লেখার অংশ বিশেষ উপস্থাপিত হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সংযোজন-বিয়োজন সহকারে। এতে দেশব্যাপী ইলমী আন্দোলন এবং আন্দোলনের পরিবর্তন ও অগ্রগতির এমন একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাঠকের চোখের সামনে এসে যাবে যা ভারতের সাধারণ ইতিহাসের গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায়না। মাওলানা মরহুম এক লেখায়[২] বলেন ঃ 'ইতিহাস বলে, ভারত বিজেতাদের সাথে

---

[১] মাওলানা সায়্যিদ আবদুল হাই (রহ.) সাহেব স্বীয় মূল্যবান পুস্তক 'জান্নাতুল মাশারিক'-এ অত্যন্ত পরিশ্রম করে এসব মাদ্রাসার অনুসন্ধান চালিয়েছেন যার আলোচনা ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থে কোথাও মৌলিক আবার কোথাও প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। তাতে প্রায় ১০৩ টি মাদ্রাসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেছেন। উল্লেখ্য, তার মধ্যে একটি মহিলা মাদ্রাসাও ছিলো এবং প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে দানশীলা মহিলাও ছিলেন।

[২] আন্-নদওয়া (প্রথম যুগ) ১৯০৯ ইং ষষ্ঠ খন্ড, নং-১, এ লেখাটি আলাদা পুস্তকাকারে 'ভারতের পাঠ্যক্রম ও তার পরিবর্তন সমূহ' শিরোনামে নদওয়াতুল উলামা হতে প্রকাশিত হয়েছে।

সাথে এদেশে ইলম তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আগমন ঘটেছিল। সুতরাং ইরান ও মাওয়ারাউন্নাহার অঞ্চল সমূহে যুগ-যুগান্তরে প্রবাহিত পরিবর্তনের হাওয়া এখানকার পাঠ্যক্রমেও লাগতো। নিম্নে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাসঙ্গিক আলোচনা পেশ করা হলো ঃ

❋সিন্ধু ও মুলতান ঃ

সর্বপ্রথম সিন্ধু ও মুলতানের মরুভূমিতে ইলমের আলো জ্বলে। এ আলোর ঝিকিমিকি পরবর্তীতে এতোই বৃদ্ধি পায় যে, সারা ভারতে তার প্রভা ছড়িয়ে পড়ে। গজনোবা এর রাজারা যখন লাহোরকে ভারতের রাজধানী বানালেন তখন এ রাজধানী শহরও প্রায় সর্বপ্রথম জ্ঞানের এ আলো থেকে উপকৃত হয়।

❋দিল্লি ঃ

যখন দিল্লি জয় হলো, রাজা-বাদশাহদের মূল্যায়ন পেয়ে যোগ্য আলিম-উলামা চারদিক থেকে দিল্লি আসতে থাকেন। এক সময য দিল্লিতে এমন বড় বড় মর্যাদাবান উলামার সমাগম হয়ে গেলো যাদের খ্যাতি শুনে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসতো এবং উপকৃত হতো। গিয়াস উদ্দীন বলবনের সময় শামসুদ্দীন খাওয়ারজমী, শামসুদ্দীন কৌশজী, বুরহানুদ্দীন বলখী, বুরহানুদ্দীন বাযায, নজমুদ্দীন দেমশকী, কামালুদ্দীন জাহেদ এর মত বিশজন এমন যোগ্য আলেম ছিলেন যাদের ইলম ও শ্রেষ্টত্বের কারণে দিল্লির অলিগলিগুলো কর্ডোবা ও বাগদাদের রূপ পরিগ্রহ করে। আলাউদ্দীন খলজীর যুগে জহীরুদ্দীন ভকরী, ফরীদুদ্দীন শাফেঈ, হামীদুদ্দীন মুখলিস, শামসুদ্দীন নাজী, মুহীউদ্দীন কাশানী, ফখরুদ্দীন হান্সুভী, ওয়াজীউদ্দীন রাজী, তাজুদ্দীন মুকাদ্দাম এর মত ছয় চল্লিশজন এমন উঁচু মানের আলেম ছিলেন যাদের সম্পর্কে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ জিয়াউদ্দীন বারণীর মন্তব্য হলো, 'সমকালীন পৃথিবীতে তারা ছিলো নজীরবিহীন।'

মুহাম্মদ শাহ তুঘলকের সামনে মুঈনুদ্দীন উমরানী, কাজী আবদুল মুকতাদির, মাওলানা খাজাগী শায়খ আহমদ থানেশ্বরী-এর মত সুযোগ্য আলেমরা ছিলেন যাদের লালন-পালনের ছোঁয়া পেয়ে শিহাবুদ্দীন

দৌলতাবাদী *'মালিকুল উলামা'* (উলামারাজ) হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। সারা দুনিয়ার দৃষ্টি যখন তাঁর দিকে নিবদ্ধ ছিলো ফিরোজ শাহের সময় জালালুদ্দীন রূমী তাশরীফ আনলে তাঁকে শাহী মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব সোপর্দ করা হলো। নজমুদ্দীন সমরকন্দীও সে সময়ে দিল্লি এসেছিলেন এবং দীর্ঘ দিন স্বীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা দিয়ে জ্ঞান পিপাসুদের ধন্য করতে থাকেন। সিকান্দার লোদীর যুগে শায়খ আবদুল্লাহ্ ও আজীজুল্লাহ খ্যাতিমান আলিমদ্বয় মুলতান থেকে এসে মানতিক ও হিকমাত এর মান বাড়িয়ে প্রচলিত পাঠ্যক্রমে জোরদার ভূমিকা রাখেন।

বাদশাহ আকবরের আমলে শাহ্ ফতহুল্লাহ সিরাজী আসলে *'আযদুল মালিক'* (বাদশাহর সহযোগী) উপাধি লাভে সম্মানিত হন। শুধু তাই নয় ; তাঁর আগমনে সারা দেশে ধুম পড়ে গেলো। একই সময়ে হাকীম শামসুদ্দীন এবং তার ভাগিনা হাকীম আলী গিলানীর মাধ্যমে চিকিৎসা বিদ্যার প্রসার ঘটে। আর শায়খ আবদুল হকের মাধ্যমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ইলমে হাদীসের আলো।

শাহজাহান ও আলমগীরের শাসনামলে মীর জাহেদের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের আলো বিকিরিত হচ্ছিলো চারিদিকে। তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সমূহ এ শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটে যোগ করেছিল সৌভাগ্যের সব পালক। দরসে নেযামিয়ার ভিত্তি তাঁর জোরদার হাতেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাঁর ধারাবাহিক শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন কাজী মুবারক এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ সাহেবের প্রসিদ্ধ খান্দান আর এ খান্দানেই জন্ম নিয়েছেন জনাব শাহ আবদুল আজীজ, শাহ রফীউদ্দীন, শাহ্ আবদুল কাদির, মাওলানা আবদুল হাই, শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল, মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক, মাওলানা রশীদুদ্দীন খান, মুফতী সদরুদ্দীন খান, মাওলানা মমলূকুল আলী প্রমুখ আলেম ও শিক্ষাবিদগণ।

✸ লাহোর ঃ

লাহোরে ইলমের চর্চা ও প্রচার-প্রসার দিল্লির আগেই ঘটেছিল। তবে দিল্লির পরবর্তী অগ্রগতির সামনে তা কিছুদিনের জন্য চাপা পড়েছিল। পরে

অবশ্যই সামনে গিয়েছিল। সুতরাং জালালুদ্দীন, কামাল উদ্দীন, মুফতী আবদুস সালাম, মোল্লা আবদুল হাকীম শিয়ালকুটী প্রমূখ খ্যাতিমানদের কারণে দীর্ঘদিন পর্যন্ত লাহোরে ইলমের চর্চা অব্যাহত ছিলো। এ সময়ে হাজার হাজার জ্ঞান পিপাসু ছাত্র তাঁদের দ্বারা উপকৃত হয়।

❋জৌনপুর ঃ

প্রাচ্যাঞ্চলীয় বাদশাহদের আমন্ত্রণে জৌনপুরে শায়খ আবুল ফাতেহ শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী, মাওলানা আল-হাদাদ, উস্তাদুল মুলক মুহাম্মদ আফজাল, *'শামসে বাজেগা'* প্রণেতা মাওলানা মাহমূদ, দেওয়ান আবদুর রশীদ, মুফতী আবদুল বাকী, মোল্লা নুরুদ্দীন এর মতো যোগ্য আলেমরা কালের পরিক্রমায় জন্ম নিয়েছেনএবং তাঁদের শিষ্যরা গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়েন।

❋গুজরাট ঃ

'গুজরাটে *'মাজমাউল বিহার'* এর লিখক শায়খ মুহাম্মদ তাহের পাটনী, শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন আলভী গুজরাটী, মোল্লা নূরুদ্দীন প্রমূখ আলেমরা ইলমের বারি ধারা বর্ষণ করেছেন। একই সময়ে নিউতনী নিবাসী কাজী যিয়াউদ্দীন গুজরাটে এসে শায়খ ওয়াজীহুদ্দীনের নিকট লালিত হন। পরবর্তীতে দীর্ঘ তরবিয়তের ইলমী তোহফা স্বদেশবাসীর জন্যে বহন করে নিয়ে যান। তাঁর দ্বারা শায়খ জামাল উপকৃতহন, যার কাছে জ্ঞান অর্জন করেন মোল্লা লুতফুল্লাহ। শেষোক্ত আলেমের শিষ্যদের মধ্যে *'নুরুল আনওয়ার'* রচয়িতা মোল্লা জিয়ুন, মোল্লা আলী আসগর, মোল্লা মুহাম্মদ জামান, কাজী আলীমুল্লাহ্ খুব বেশী প্রসিদ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই দীর্ঘ কালব্যাপী পঠন পাঠন ও অধ্যাত্ম সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন।

❋এলাহাবাদ ঃ

কাজী মুহাম্মদ আসিফ, শায়খ মুহাম্মদ আফযল, শাহ খূবুল্লাহ্ , শায়খ মুহাম্মদ তাহের, হাজী মুহাম্মদ ফাখের জায়ের, মৌলভী বরকত, মৌলভী যাফরুল্লাহ এবং অন্যান্য সুযোগ্য আলেমগণ দীর্ঘদিন পঠন-পাঠনের

ময়দান সরগরম রাখেন এবং প্রায় একশ' বছর পর্যন্ত এর চর্চা চলে স্বচ্ছন্দ গতিতে।

✸লক্ষ্ণৌ ঃ

লক্ষ্ণৌতে সর্বপ্রথম শায়খ আযম ইলমের হাদিয়া জৌনপুর থেকে নিয়ে আসেন। অতঃপর শাহ্ পীর মুহাম্মদ শিক্ষকতার মাহ্ফিল আলোকিত করেন এবং তাঁর শাগরেদ মোল্লা গোলাম নকশবন্দ তাতে খুব আলো দেন। একই সময়ে শায়খ কুতুবুদ্দীন সাহালভীরও ঢঙ্কা বাজছিলো সর্বত্র। তিনি ছিলেন আবদুস সালাম দেভী ও মুহিব্বুল্লাহ্ এলাহাবাদীর সিলসিলার অন্যতম খ্যাতনামা আলেম। শায়খ কুতুবুদ্দীনের শাহাদাতের পর তাঁর সুযোগ্য সাহেবজাদা মোল্লা নেজামুদ্দীন ইলমের নহর বইয়ে দিয়ে লক্ষ্ণৌকে ইলমের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন এবং সেখানে তিনি যে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করেছিলেন তা ভারতের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাদরে গৃহীত হয়। একই খান্দানে মোল্লা হাসান, বাহরুল উলূম, মোল্লা মুবীন, মুফতী যহুরুল্লাহ্, মৌলভী ওয়ালী উল্লাহ্, মুফতী মুহাম্মদ আসগর, মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ, মৌলভী নঈমুল্লাহ্, মৌলভী নুরুল্লাহ, মৌলভী আবদুল হাকীম, মৌলভী আবদুল হালীম, মৌলভী আবদুল হাই প্রমুখ- এমন এমন যোগ্য শিক্ষক জন্ম নিয়েছেন যাদের উপমা অন্যকোন খান্দানে পাওয়া মুশকিল।

✸অউধের এলাকা ঃ

এ খান্দানের শিষর‍্যাও ভারতের প্রতিটি কোণায় কোনায় জ্ঞানের আলো বিস্তারে কোন ত্রুটি করেননি। কুতুবুদ্দীন শামসাবাদী, কুতুব উদ্দীন গোপামুঁয়ী, মুহিব্বুল্লাহ্ বিহারী, আমানুল্লাহ্ বেনারসী, মৌলভী ইয়াদুল্লাহ্, মৌলভী ফযল ইমাম, মৌলভী ফযলে হক ও তাঁদের নয়নমনি মৌলভী আবদুল হক প্রমুখ- সবাই সেই জ্ঞান সাগর হতে পরিতৃপ্ত ছিলেন।

অউধের প্রতিটি গ্রামে ছিলো ইলমের চর্চা সম্প্রসারিত। এ রকম কোন দূর্ভাগা পাওয়া কঠিন ছিলো যেখানে ইলমের আলো পৌছেনি। সব চেয়ে প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ ছিলো ঃ জায়েস, আমেঠী, হরগা, নিউতনী, গোপামূঁ,

বিলগ্রাম, সিন্দালিয়া, কাকুরী, প্রভৃতি। এ সব স্থানে এত বেশী আলিম জন্ম নিয়েছেন যাদের নযীর পাওয়া ছিল অন্যান্য দেশে দূরূহ ব্যাপার।

পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন স্তর ঃ

এখানে সহজতর প্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রচলিত পাঠ্যক্রমের চারটি যুগের বর্ণনা করা সমীচিন মনে করি। প্রতিটি যুগে যেসব বই-পুস্তক প্রচলিত ছিলো ছিল তার বিবরণও যতটুকু সম্ভব ইতিহাস থেকে, বিভিন্ন স্তরের মাশায়িখ হতে, কবিদের আলোচনা থেকে উপস্থাপন করলে ভাল হয়।[১] দেখতে এ কাজটা হালকা মনে হলেও কিন্তু হাজার হাজার পৃষ্ঠা মন্থন করার পর যে ফলাফলে আমরা পৌছেছি তাই পাঠক মহলের উদ্দেশ্যে পেশ করছি।

প্রথম যুগ ঃ

এ যুগের সূচনা হিজরী সপ্তম শতাব্দী হতে আর এর শেষ দশম শতাব্দীর তখন হয় যখন দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়ে যায়। প্রায় দু'শ' বছর পর্যন্ত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অর্জন শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি মনে করা হতো। বিষয় সমূহ হচ্ছে নাহু-ছরফ, বালাগাত, ফিক্‌হ, উসূলে ফি্‌হ, মানতিক, তাসাউফ, তাফসীর ও হাদীস। এ যুগের স্বনামধন্য আলিমদের জীবনী অনুসন্ধানে জানা যায় যে, আমাদের যুগে 'মানতিক' ও 'ফালসাফা' যেমন শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি তেমনি সে যুগে ছিল ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ।

দ্বিতীয় যুগ ঃ

হিজরী নবম শতাব্দীর শেষদিকে শায়খ আবদুল্লাহ ও শায়খ আযীযুল্লাহ মুলতান থেকে আগমন করেন।[২] শায়খ আবদুল্লাহ দিল্লিতে এবং শায়খ আযীযুল্লাহ অবস্থান নেন সাম্বলে। সুলতান সিকান্দার লোদী হৃদয় উজাড় করে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। এমনকি স্বয়ং বাদশাহ শায়খ আবদুল্লাহর দরসের হালকায়ে অংশ গ্রহন করতেন। তাঁর আগমনে দরসের

---

[১] এ বইয়ে এমন সব পাঠ্য বই সমূহের তালিকা বাদ দেয়া হয়েছে। যেহেতু তা শুধু গবেষকদেরই প্রিয় বিষয়। বিস্তারিত জানার জন্যে মূল লেখা দ্রষ্টব্য।

[২] আলিমদ্বয় মূলতানের পার্শ্ববর্তী এলাকা তুলাম্বার অধিবাসী ছিলেন।

ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হবে এ আশঙ্কায় তিনি মসজিদের এক কোণে বসে তাঁর বক্তব্য শুনতেন। দরস সমাপ্ত হলে শায়খের খিদমতে গিয়ে সাক্ষাত করতেন।

এ শায়খদ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও পান্ডিত্বের কারণে এবং পাশাপাশি বাদশাহর আন্তরিক মূল্যায়নে খুব দ্রুত তাঁদের ইলমী খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তারা 'ফযিলতের' মান আরো একটু বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কাজী ইয্দ রচিত *'মাতালে'* ও *'মাওয়কিফ'* গ্রন্থদ্বয় এবং সাকাকী রচিত *'মিফতাহুল উলূম'* তাদের দরসে সংযোজিত করেন। খুব অল্প সময়ে এসব গ্রন্থের বহুল প্রচলন ঘটে ।

এ যুগেই মীর সায়্যিদ শরীফের ছাত্ররা *'শারহে মাতালে'* এবং *'শরহে মাওয়াকিফ'* [১] ব্যাখ্যাগ্রন্থ দ্বয় চালু করেন। আল্লামা তাফতাযানীর শাগরেদরা *'মুতাওয়াল'* ও *'মুখতাসার'* [২] এর গোড়াপত্তন করলেন এববং প্রচলন করেন *'তালভীহ'* [৩] ও *'শরহে আক্বায়েদে নাসাফী'* [৪] গ্রন্থ সমূহের। এ সময়ে *'শারহে বেকায়া'* [৫] এবং *'শারহে মোল্লা জামী'* [৬] ধীরে ধীরে পাঠ্যক্রমে ডুকে পড়ে।

এ যুগের সব চেয়ে শেষ; তবে সব চেয়ে খ্যাতনামা আলেম শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী ভারত থেকে আরব তাশরীফ নিয়ে যান। যেখানে তিন বছর অবস্থান করে মক্কা-মদীনার আলেমদের নিকট হাদীসের তাকমীল করেন এবং সে ইলমী তোহফা নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি এবং তাঁর সন্তানরা সর্বদা ইলমের প্রচার প্রসারের চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা জনপ্রিয়তা লাভে ব্যর্থ হয়। এ সম্মান পরবর্তী যুগে

---

[১] ইলমে কালামের দু'টি মৌলিক গ্রন্থ।

[২] অলঙ্কার শাস্ত্রের দু'টি প্রসিদ্ধ বইয়ের নাম ; যা এখনো প্রাচীন পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

[৩] উলূমে ফিকাহ।

[৪] ইলমে আক্বায়েদ।

[৫] ফিকহে হানাফী।

[৬] মানতিকের রঙ মিশ্রিত আরবী ব্যাকরণের একটি গ্রন্থ।

জনাব শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী (রহ.) এর ভাগ্যে জোটে। তিনি এ ইলমের প্রচার প্রসার ঘটান সফলতার সাথে।

তৃতীয় যুগ ঃ

দ্বিতীয় যুগে পাঠ্যক্রমে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বেড়েই গিয়েছিল ফলে তাঁরা ফযিলতের মাপকাঠিকে আরো উন্নত করার আগ্রহী ও প্রত্যাশী ছিলেন। সুতরাং শাহ্ ফতহুল্লাহ্ শিরাজীর আগমনের সাথে সাথে শিক্ষাকেন্দ্র গুলোতে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে। একদিকে 'দরবারে আকবরী; তাঁকে *'ইযদুল মালিক'* (বাদশাহ সহযোগী) উপাধিতে অভিষিক্ত করে স্বীয় মূল্যায়নের প্রমাণ দেয়। অন্যদিকে সেই শাহ ফাতহুল্লাহ্ শিরাজী পাঠ্যক্রমে যেসব পরিবর্ধন করেছিলেন তা নিঃসংকোচে মেনে নেন তৎকালীন আলিমগণ। নিতান্ত অন্যায় হবে যদি এখানে আমরা শায়খ ওয়াজীহ্ উদ্দীন আলভী গুজরাটীকে বিস্মৃত করি। এ বুযুর্গ গবেষক দাওয়্যানীর পরোক্ষ শাগরেদ ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম পরবর্তী আলেমদের রচিত গ্রন্থাদির প্রচলন ঘটিয়েছেন। ইলমের এ ঝর্ণাধারা হতে শুধু গুজরাটই সিক্ত হয়নি বরং তার ছিটেফোটা মধ্যভারত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। নিউতনীর বাসিন্দা কাজী জিয়া উদ্দীন গুজরাট থেকে ইলমী তোহফা নিয়ে আসেন। আর শায়খ জামাল তাঁর কাছ তা অর্জন করে দূর-দূরান্ত ছড়িয়ে দেন। শায়খ জামাল এর যোগ্য ছাত্র মোল্লা লুতফুল্লাহর কাছ থেকে মোল্লা জিয়ূন, (নুরুল আনওয়ার রচয়িতা), মোল্লা আলী আসগর, কাজী আলীমুল্লাহ্, মোল্লা মুহাম্মদ জামান প্রমূখ আলেমগণ ইলম হাসিল করেন। এদের প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিকতা ও পঠন পাঠনের যোগ্য ব্যক্তিত্ব। তবে যখন শাহ্ ফতহুল্লাহ্ শিরাজী দরসটি চালু করেন তখনই তা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। পরে তাঁর শিষ্য এবং শিষ্যদের শিষ্যরা সারা ভারত ছড়িয়ে পড়লে তাঁর দরসেরও প্রচার-প্রসার ঘটে। শাহ্ ফতহুল্লাহর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন মুফতী আবদুস সালাম। তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত লাহোরে বসে হাজার হাজার জ্ঞানপিপাসুকে ইলম দান করেন। তবে হাজারে এক-দুই জনই এমন হতো যারা খ্যাতি ও স্থায়ীত্বের ডিগ্রী পেতো। 'দিওয়াহ্' অঞ্চলের মুফতী আবদুস সালাম ও এলাহাবাদের শায়খ মুহিব্বুল্লাহ ছিলেন সেই দু'-একজন সৌভাগ্যবানদের

মধ্যে যারা লাহোর থেকে জ্ঞানের মশাল এনে এতদঞ্চলে দরস-তাদরীসের শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আমল কায়েম করেন। প্রসিদ্ধ 'দরসে নিজামিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিযামুদ্দীনের সম্মানিত পিতা শায়খ কুতুবুদ্দীন সাহালভী পরোক্ষ ভাবে এ দু'জনেরই সুযোগ্য শাগরেদ ছিলেন।

শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ দেহলভী (মৃত্যু. ১১৭৪ হি.) এ যুগের সর্বশেষ; তবে সব চেয়ে ধীমান ও মেধা সম্পন্ন আলেম ছিলেন। শাহ্ সাহেব ব্যাপক ভাবে আরব দেশে সফর করেন। সেখানে কয়েক বছর থেকে শায়খ আবু তাহের মাদানীর নিকট ইলমে হাদীস সমাপ্ত করেন। পরে জ্ঞানের এ হাদিয়া ভারত নিয়ে আসেন এবং এমন তৎপরতার সাথে তার প্রচার প্রসারে লেগে যান যে, প্রতিকুল পরিবেশ সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তার স্মৃতি চিহ্ন রয়ে গেছে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র। প্রকৃত পক্ষে 'সিহাহ সিত্তাহ'র পঠন-পাঠন ভারতে তখন থেকেই আরম্ভ হয় যখন শাহ্ সাহেব ও তাঁর প্রখ্যাত উত্তরসূরীরা তা চালু করেন এবং তাঁদের মুল্যবান জীবনের অধিকাংশ সময় হাদীস চর্চার বিকাশে ব্যয় করেন।

শাহ্ সাহেব নিজেও স্বীয় মডেলের একটি পাঠ্যক্রম তৈরী করেছিলেন যেহেতু সে সময় ইলমের আসল কেন্দ্র দিল্লি থেকে লক্ষ্ণৌ স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানতিক ও হিকমাতের স্বাদের সাথে পরিচিত হচ্ছিল ছাত্র-শিক্ষকের রসনায় তাই নতুন পাঠ্যক্রম উপাদেয় হয়নি।

চতুর্থ যুগ ঃ

হিজরী ১২ শতাব্দীতে কায়েম হয়। আর মোল্লা নিজামুদ্দীন এমন জোরদার হাতে তার গোড়াপত্তন করেন যে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো অথচ এখন পর্যন্ত তা অপরিবর্তনীয় রয়ে গেলো।[১]

---

[১] 'আন-নদওয়া' ষষ্ঠ খন্ড, নং-১, এটা অর্ধশতাব্দী আগের কথা। সুতরাং নদওয়াতুল উলামার আন্দোলন এবং কালের পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়ে অনেক জায়গায় প্রাচীন পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আযাদী আন্দোলনে ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবদান

মুসলমানরা আযাদী আন্দোলনের অগ্রনায়ক ঃ

ভারতবর্ষের আযাদী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান ছিল অলৌকিকভাবে অসাধারন ও অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলমানরা অগ্রনায়ক ও পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। এর কারণ ছিলো, ইংরেজরা যখন হিন্দুস্তান দখল করতে শুরু করলো এবং ক্রমান্বয়ে একের পর এক প্রদেশ ও রাজ্য তাদের করতলগত হতে লাগলো, তখন মুসলমানই ছিলেন হিন্দুস্তানের শাসনকর্তা। সর্বপ্রথম যার অন্তরে এই বিপদের আশঙ্কা অনুভূত হয়, তিনি ছিলেন মহীসূরের সাহসী ও নির্ভীক গভর্ণর ফাতহে আলী খান টিপু সুলতান (১২১৩ হি./১৭৯৯ ইং.) তিনি অসাধারণ বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সাহায্যে একথা উপলব্ধি করলেন যে, যদি ইংরেজরা এভাবে এক একটি প্রদেশ ও রাজ্য দখল করতে থাকে এবং কোন সুনিয়ন্ত্রিত ও সংঘবদ্ধ শক্তি তাদের মুকাবিলায় না আসে, তবে ভবিষ্যতে পুরা ভারতবর্ষকে তারা সহজে গ্রাস করে ফেলবে। এরপর তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন এবং পূর্ণ সাজ-সজ্জা ও সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে তাদের মুকাবিলায় ময়দানে নেমে আসলেন।

টিপু সুলতানের প্রয়াস ও দুঃসাহস ঃ

টিপু সুলতান হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজা ও নবাবদেরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তুর্কী সম্রাট সলিম উসমানী, অন্যান্য মুসলিম রাজা-বাদশাহ এবং হিন্দুস্তানের আমীর-উমরা ও নবাবদের সাথে পত্র যোগাযোগ করেন। সারা জীবন তিনি ঔপনিবেশবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর প্রচন্ড প্রতিরোধের কারণে এক পর্যায়ে ইংরেজদের সমস্ত পরিকল্পনা তছনছ হয়ে এদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ইংরেজরা তাদের অসাধারণ ধূর্ততা, কূটচালের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের নবাবদেরকে বশে আনতে সক্ষম হয় । অবশেষে দেশ ও জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদ বাদশাহ টিপু

সুলতান ৪ মে ১৭৯৯ সালে 'সারেঙ্গা পিয়ম' এর যুদ্ধে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ইংরেজদের দাসত্ব বরণ ও তাদের দয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিলেন। তাঁর ইতিহাস বিশ্রুত বাণী ছিলো ঃ

To live for a day like a tiger is far more precious than to live for a hundred years like a jackal.

"শৃগালের একশ' বছরের জীবনের চেয়ে সিংহের একদিনের জীবন অনেক উত্তম।" ব্রিটিশ সেনাপতি জেনারেল হ্যারিস (Harris) এর কাছে যখন সুলতানের শাহাদাতের খবর পৌঁছলো, সে তাঁর লাশের পাশে দাঁড়িয়ে সদম্ভে বললেন ঃ

From today India is ours

"আজ থেকে হিন্দুস্তান আমাদের।"

ভারতের ইতিহাসে টিপু সুলতানের চেয়ে অধিক সাহসী, দূরদর্শী, ধর্ম ও মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ এবং বৈদেশিক আধিপত্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে আপোষহীন যোদ্ধা আর জন্ম গ্রহন করেনি একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা। ইংরেজদের সামনে টিপু সুলতানের চেয়ে ভয়ঙ্কর ও বিদ্বেষভাজন আর কেউ ছিলনা। বহু কাল যাবৎ (এবং সে যুগ আমরাও দেখেছি) তারা নিজেদের মনের ঝাল মিটানোর জন্য এবং স্বাধীনতা ও জিহাদের এই মহানায়ককে অপমাণিত ও কলঙ্কিত করার হীন মানসে তাদের কুকুরের নাম রাখতো টিপু সুলতান।[১]

স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্মিলিত প্ল্যাটফরম ঃ

ইংরেজ শাসন ও আধিপত্য, ইংরেজদের দম্ভ ও অহঙ্কার, দেশের সম্পদ শোষণ ও আত্মসাৎ এবং সর্বোপরি ভারতবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রতি একের পর এক আঘাত হানার কারণে পীঠ দেয়ালে ঠেকে যাওয়ার পর ভারতীয় সৈন্যরা ১৮৫৭ সালে এই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করলো। তাদের এই বিদ্রোহে ঘোষণা মুহূর্তে দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। জেগে উঠলো জাতি-

---

[১] গান্ধীজী Young India এর একটি ভাষ্যে সুলতানের দেশপ্রেম ও উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, দেশ ও জাতির স্বার্থে শাহাদাতপ্রাপ্তদের মধ্যে তাঁর চেয়ে মহান আর কেউ ছিলোনা।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনতা। হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ গ্রহণ করলো। সিপাহীরা মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ যফরের বাসস্থান দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করলো। এই অখন্ড দেশাত্মবোধ ও গণযুদ্ধের মহানায়ক ও প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত হলেন স্বয়ং সম্রাট। তিনি সমাদৃত হলেন হিন্দুস্থানের বৈধ বাদশাহ্ এবং খ্যাতনামা মুঘল সম্রাটগণের যোগ্য উত্তরসূরী রূপে। হিন্দুস্তানের পথে-প্রান্তরে তাঁর নামে ও পতাকাতলে বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। লোকেরা তাকে ধর্মীয় ও জাতীয় যুদ্ধের নায়ক এবং দিল্লিকে স্বাধীন হিন্দুস্তানের রাজধানী মনে করতে লাগল। তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে কারো দ্বিমত ছিলোনা। [১]

আযাদী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান ঃ

আযাদী আন্দোলন ছিল প্রকৃত অর্থে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত ও সম্মিলিত সংগ্রাম। ভারতবর্ষ দেশপ্রেম, ঐক্য ও সংহতি, উৎসাহ ও উদ্দীপনা, আবেগ ও উত্তাপের এই প্রাণময় দৃশ্য আর কখনো দেখেনি। তা সত্ত্বেও নেতৃত্বের অগ্রণী ভূমিকায় মুসলমানদের পাল্লা ছিল ভারী। এ আন্দোলনে অধিকাংশ নেতা ও সেনা অধিনায়ক ছিলেন মুসলমান।[২]

---

[১] দুঃখের বিষয় হলো, শিখ ও কোন কোন রাজ্যের নবাবরা এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি বরং তাদেরকে ইংরেজরা বিদ্রোহ দমনের কাজে ব্যবহার
করেছে।

[২] আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সমরনৈতিক নেতৃত্বে আজীমুল্লাহ খান, জেনারেল বখত খান, খান বাহাদুর খান, মাওলানা আহমদুল্লাহ্, মাওলানা
লিয়াকত আলী, হযরত মহল প্রমুখ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে মাওলানা আহমদুল্লাহ্ শাহ ফয়েজাবাদীর ব্যক্তিত্ব ছিল সুবিদিত
ও মহান। হোমজ্ লেখেন, " মৌলভী আহমদুল্লাহ্ শাহ ছিলেন উত্তর ভারতে ইংরেজদের সবচেয়ে বড় শত্রু।" পন্ডিত চন্দ্র লাল লেখেন, " এ কথা সন্দেহাতীত যে, পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের মাঝে ১৮৫৭ সনের মৌলভী আহমদুল্লাহ শাহ এর নাম চির গৌরবান্বিত ও প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে।" (সাতান্ন সাল পৃ. ২০৮) ম্যালেসন (Malleson) বলেন, "মৌলভী আহমদুল্লাহ এক বড় বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ছিলেন, বিদ্রোহের সময় সেনাপতি রূপে তিনি দক্ষতা ও কৃতিত্বের অপূর্ব স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যকেউ একথা সদর্পে বলতে পারবেনা যে, আমি স্যার কলিন ক্যাম্পবিলকে ময়দানে দু'দুবার পরাজিত করেছি।" Malleson আরো বলেনঃ The Moulvi was a true patriot. He had not strained his sword with assassinatoin. He had connived at no murders: he had fought manfully, honourably in the battlefield against strangers who had seized his country, and his memory is entitled to the

ইংরেজদের প্রতিশোধস্পৃহা ও হত্যাযজ্ঞ ঃ

আযাদী আন্দোলন যখন করুণভাবে ব্যর্থ হলো, যে ব্যর্থতার কারণ উদঘাটন করতে রচিত হয়েছে বহু পুস্তক।[১] তখন ইংরেজরা ভারতীয়দের উপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করলো। ভারতীয়দের সাথে তারা এমন জালিম ও অত্যাচারী বিজয়ী জাতির ন্যায় আচরণ করলো যেন তারা দয়া-মায়া, ন্যায়-নীতি ও মানবতার তাৎপর্যের সাথে পরিচিত নয়। ফলে এমন নিষ্ঠুর ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যালীলায় মেতে উঠলো, যা স্মরণ করিয়ে দেয় চেঙ্গিস ও হালাকু খানের প্রলয় তান্ডব ও মানব সংহারের করুণ ইতিহাস। ইংরেজরা বাদশাহর তিন যুবক ছেলেকে হত্যা করলো। অথচ তাদেরকে ইতোপূর্বে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়া হয়েছিলো। এমন হিংস্রতা ও বর্বরতার সাথে তাদের হত্যা করা হলো, যে দৃশ্য দেখে স্বয়ং বহু ইংরেজ শিওরে উঠে। তাদের সাথে শাহী খান্দানের তেত্রিশ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়, যাদের মধ্যে ছিলো রোগপীড়িত,বয়োবৃদ্ধ,এমনকি পঙ্গু ব্যক্তিও। তারা বাদশাহকে অপদস্থ করে এবং নিতান্ত অবমাননাকর পন্থায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করে। ইংরেজরা বাদশাহকেও হত্যা করতে চেয়েছিলো কিন্তু সেনা কমান্ডার তাঁর জীবনের দায়িত্ব নেয়ায় চিরদিনের জন্য তাঁকে রেংগুনে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে অবর্ণনীয় কষ্ট-যাতনার মাঝে মানবেতর জীবন যাপন করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

---

respect of the brave and the true-hearted of all nation. 'মৌলভী আহমদুল্লাহ শাহ সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিক ছিলেন, তিনি কোন নিরীহ লোকের রক্ত ঝরিয়ে কৃপান অপবিত্র করেননি। যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব ও অবিচলতার সাথে সেই ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যান, যারা তার মাতৃভূমি ছিনিয়ে নিয়েছিল প্রত্যেক দেশের বীর ও সৎসাহসী লোকদের উচিৎ মৌলভী আহমদুল্লাহ শাহকে মর্যাদার সাথে স্মরণ করা।' (History of Indian Mutiny,vol.iv,p.381)

হোম্‌জ লেখেন, "শত্রুরা যতই হিংস্র প্রকৃতির হোক না কেন, তাদের নেতা ছিলেন এক মহান লক্ষ্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও বিশাল সেনাবাহিনীর সফল নেতৃত্ব দানের জন্য পুরোপুরি যোগ্য ব্যক্তি।"

[১] ইংরেজ সাম্রাজ্যের উত্থান (উর্দূ) মুনশী জাকাউল্লাহ ২য় খন্ড, পৃ. ৭০৮।

লুটতরাজ ও গণহত্যা ঃ

ইংরেজ সেনাবাহিনী ঢুকে পড়লো হিন্দুস্তানের প্রাণকেন্দ্র দিল্লিতে। সাথে সাথে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের এই আযাবের ব্যাখ্যা ঃ

"যখন বাদশাহরা কোন দেশে প্রবেশ করে তাকে তছনছ করে
ক্ষান্ত হয় ও সেদেশের সম্মানিত লোকদেরকে অপদস্ত করে।"[১]

সেনা সদস্যদেরকে তিন দিন পর্যন্ত দিল্লিকে লুট করার অনুমতি দেওয়া হয়। তারা অত্যন্ত ভয়ানকভাবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জন লরেন্স ১৮৫৭ সনের ডিসেম্বরে ইংরেজ সেনাপতি General Penny র কাছে লিখেন ঃ

I belive we shall lastingly, and indeed, justly be abused for the way in which we have despoiled all classes without distinction.

"আমার বিশ্বাস, যেভাবে আমরা নির্বিচারে সকল স্তরের লোকদের লুট করেছি, এর জন্য চিরকাল আমাদেরকে অভিসম্পাত দেয়া হবে। আমরা এই অভিসম্পাত পাওয়ার যোগ্য বটে।"[২]

তিন পর্যন্ত দিল্লির মাটিতে হত্যা লুণ্ঠনের রাজত্ব ছিল। দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল, বয়ে যাচ্ছিল রক্তের নহর, দোষী ও নির্দোষ নির্বিশেষে সকলের গায়ে বিদ্ধ হচ্ছিলো ঘাতক বুলেট, লুট হচ্ছিল বাড়ির পর বাড়ি। যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো, তারা আপন ইজ্জত-আব্রু ও পরিবার-পরিজন নিয়ে দিল্লি থেকে পালিয়ে গেল। এক পর্যায়ে যে শহর একযুগে সমগ্র হিন্দুস্তানের মধ্যমণি ও রাজধানী ছিলো, সেটি এক জনমানবহীন ভুতুড়ে শহরে পরিণত হয়। সেখানে বিধ্বস্ত বাড়ি ঘর, খড়কুটো, পঁচে গলে যাওয়া লাশ ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিলনা। ইংরেজ কমান্ডার ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্টস (Lord Roberts) যিনি সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাবাহিনীসহ ১৮৫৭

---

[১] সূরা নামালঃ ৩৪

[২] Basworth Smith, Life of Lord Lawrence, 1883,vol- 1, p-158

সনের ২৪ ডিসেম্বর কানপুর হতে দিল্লি গমণ করেছিলেন, তিনি লালকেল্লা জয়ের পরবর্তী দিল্লির হৃদয়বিদারক চিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ

That March through Delhi in the early morning light was a gruesome proceeding. Our way by the Lahore Gate from the Chandni Chowk led through a veritable city of the dead; not a sound was to be hard but the falling of our own footsteps; not a living creature was to be seen. Dead bodies were strewn about in all directions, in every attitude that the death-struggle had caused them to assume, and in every stage of decomposition. We marched in silence or involuntarily spoke in whispers, as though fearing to disturb those ghastly remains of humanity. The sights we encountered were horrible and sickening to the last degree. Here a dog gnawed at an uncovered limb, there a vulture disturbed by our approach from its loathsome meal, but too completely gorged to fly, fluttered away to a safer distance. In many instances, the positions of the dead bodies were appallingly life-like. Some with their arms uplifted as if beckoning, and indeed, the whole scene weired and and terrible beyond description. Our horses seemed to feel the horror of it as much as we did, for they shook and snorted in evident terror. The atmosphere was unimaginably disgusting, laden as it was with the most noxious and sickening odours.

"ভোরের মৃদু আলোয় দিল্লি হতে যাত্রার সে দৃশ্য ছিলো বড়ই করুণ। লালকিল্লার লাহোরী দরজা দিয়ে বের হয়ে আমরা চাঁদনী চক অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। দিল্লিকে মনে হচ্ছিল এক নীরব-নিস্তব্ধ শহর। আমাদের অশ্ব সমূহের পদধ্বনি ব্যতীত কোন দিক থেকে অন্য কোন আওয়াজ

আসছিলোনা। একটি জীবিত প্রাণীও আমাদের চোখে পড়েনি। সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লাশ আর লাশ। প্রত্যেক লাশে পরিস্ফুট মৃত্যুর বিভীষিকা। লাশগুলো ছিন্নভিন্ন ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। আমরা চুপচাপ চলছিলাম অথবা বলতে পারেন অনিচ্ছায় অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করছিলাম, যাতে মানবতার এ করুণ সাক্ষীগুলোর প্রশান্তিতে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। যেই দৃশ্যগুলোর দেখে আমাদের আখিঁ জর্জরিত হয়, সে গুলো বড়ই হৃদয়বিদারক। কোথাও কুকুর কারো দিগম্বর দেহ ছিড়ে ফেঁড়ে খাচ্ছে। আবার কোথাও শকুন আমাদের কাছে পৌঁছার কারণে তার দুর্গন্ধময় খাবার ছেড়ে পাখা ঝাপটিয়ে অদূরে চলে যাচ্ছে কিন্তু তার উদর টইটম্বুর হওয়ায় উড়তে পারছেনা। প্রায় ক্ষেত্রে মৃত্যুকে মনে হচ্ছিল জীবিত। কারো হাত উপরের দিকে উঠানো, যেন কাউকে ইশারা করছে। প্রকৃতপক্ষে কোন দৃশ্য এমন ভয়ানক ও বিভীষিকাময় ছিল যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায়না। মনে হয় আমাদের ন্যায় ঘোড়াগুলো ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। বার বার চমকে উঠতো ও অসন্তাষ প্রকাশ করতো। পুরা পরিবেশ অকল্পনীয়ভাবে ভয়ানক রূপ ধারণ করে, যা ছিল বড় ক্ষতিকর, রোগজীবাণু বাহী ও পুঁতিগন্ধময়[১]

ইসলামী বিদ্রোহ ঃ

এ নির্মম গণহত্যায় মুসলমানরাই ছিল ইংরেজদের মূল টার্গেট। কারণ বহু ইংরেজ কর্মকর্তা মনে করতো যে, এটা মূলতঃ ইসলামী জিহাদ এবং মুসলমানরাই এই বিদ্রোহের মূল নায়ক ও প্রবক্তা। এক ইংরেজ লেখক Henry Mead বলেনঃ

This rebellion, in its present phase, cannot be called a sepoy Mutiny. It did begin with the sepoys, but soon its true nature was revealed. It was an Islamic revolt.

"এ বিদ্রোহকে বর্তমান পর্যায়ে সিপাহী বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করা যায়না। অবশ্যই এর সূচনা হয়েছিল সিপাহীদের দ্বারাই। কিন্তু অচিরেই

---

[১] Lord Roberts, Forty one Years in India, 1898,p.142

তার আসল রূপ ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ এ বিদ্রোহ ছিল মূলতঃ ইসলামী বিদ্রোহ।"[১]

একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক লেখেন ঃ "প্রতিটি ইংরেজের অভ্যাসই হয়ে গিয়েছিল যে, সে প্রত্যেক মুসলমানকেই মনে করতো বিদ্রোহী। প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস করতো হিন্দু না মুসলমান। উত্তরে মুসলমান শুনতেই গুলি চালাতো।" [২]

মুসলিম গণহত্যা ঃ

এর পর শুরু হয় ফাঁসির কালো অধ্যায়। প্রায় মহাসড়ক ও রাস্তায় ফাঁসির কাষ্ঠ ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ স্থানগুলো রূপান্তরিত হয় ইংরেজদের চিত্তবিনোদন ও আনন্দ উপভোগের কেন্দ্রে। সেখানে এসে তারা ফাঁসি প্রাপ্তদের যন্ত্রণা ও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার করুণ দৃশ্য উপভোগ করতো। ধূমপানের আসর জমতো ও একে অপরের সাথে খোশগল্পে মেতে উঠতো। যখন ফাঁসির কাজ সম্পন্ন হয়ে যেতো এবং সেই মজলুম ব্যক্তিটি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতো, তখন ইংরেজরা হাসি-তামাশা ও বিদ্রূপের সাথে অভিবাদন জানাতো। এ হতভাগাদের মধ্যে বড় বড় মান্যগণ্য ও সম্ভ্রান্ত লোকও ছিলেন। কোনো কোনো মুসলিম পল্লী এভাবে কৃপান তলে নিক্ষেপ করা হয় যে, তাদের একজন সদস্যও প্রাণে রক্ষা পায়নি। একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক লিখেনঃ Twenty-seven thousand Muslims were executed, to speak nothing of those killed in the general massacre. It seemed that the British were determined to blot out of existence the entire Muslim race. They killed the children and the way they treated the women simply belies description. It rends the heart to think of it.

"সাতাশ হাজার মুসলমানকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়। লাগাতার ও নির্বিচারে গণহত্যা চলতে থাকে। এতে কতোজন নিহত হয়েছে তার

---

[১] প্রাগুক্ত।

[২] উরুজে সালতানাতে ইংলিশিয়া পৃ.৭১২।

হিসেব নেই। বস্তুতঃ মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে বৃটিশরা সংকল্পবদ্ধ ছিল। হত্যা করেছে শিশুদের, নারীদের সাথে যে আচরণ করেছে তা বর্ণনার বাইরে, যা কল্পনায়ও কেঁপে উঠে হৃদয়।"[১]
আমাদের সেনা অফিসার সব ধরনের অপরাধীদের হত্যা করে ফিরছিলেন। কোন রকমের আক্ষেপ ছাড়াই তাদের ফাঁসি দিচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন তারা কুকুর বা শৃগাল কিংবা অতি নিকৃষ্ট কোন পোকা মাকড়।[২]

ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্টস ১৮৫৭ সালের ২১ জুন তাঁর মায়ের কাছে লিখিত এক পত্রে বলেনঃ

"The death that seems to have the greatest effect is being blown from a gun. It is rather a horrible sight, but, in these times, we cannot be particular." The purpose of this "business" was to show "these rascally Musalmans that, with God's help, Englishmen will still be masters of India."

"মৃত্যুদন্ডের সবচেয়ে কার্যকর ও সুন্দর ব্যবস্থা হল কামানের গোলায় উড়িয়ে দেয়া। এই দৃশ্য বড় বীভৎস হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা সতর্কতার সাথে কাজ চালাতে পারছিনা। আমাদের উদ্দেশ্য, বদমায়েশ মুসলমানদের একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, ইশ্বরের সাহায্যে ইংরেজরা এখনও হিন্দুস্থানের অধিপতি থাকবে।"[৩]

আযাদী আন্দোলনের মাশুল ঃ

এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সবচেয়ে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে মুসলমানদেরকেই। ইংরেজ শাসনের কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ ও লেখকরা একথা ভাবতে থাকে যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের জন্য মূলতঃ মুসলমানরাই দায়ী। এজন্য তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এর মাশুল গুনতে

---

[১] সৈয়দ কামাল উদ্দীন হায়দার, কায়সারুত তাওয়ারীখ ২ খ, পৃ.৪৫৪।
[২] মালেসন. ২খ, পৃ.১৭৭। (১৮৫৭ সাল হতে উদ্ধৃত)
[৩] Edward Thompson, The Other Side of the Medal, 1269, p.40)

হবে। হেনরী হেমিল্টন থমাস (Henry Harrington Thomas) যিনি তৎকালীন বাংলার একজন বড় সিভিল কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ১৮৫৮ সাল তথা আযাদী আন্দোলনের এক বছর পরে তার লিখিত *Late Rebellion in India and Our Future Policy* নামক গ্রন্থে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ভালভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লেখেন ঃ

I have stated that the Hindus were not the contrivers or the primary movers of the 1857 rebellion and I now shall attempt to show that it was the result of a Mohammadan conspiracy. ....Left to their resources, the Hindus never would or could have compassed such an undertaking ....They (the Mohammadans) have been uniformly the same from the times of the first Caliphs to the present day, proud, intolerant and cruel, ever aiming at Mohammadan supremacy by whatever means, and ever fostering a deep hatred of Christians. They cannot be good subjects of any government, which professes another religion; the precepts of the Quran will not suffer it.

"আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মূল নায়ক ও প্রবক্তা হিন্দু ছিলনা। এখন আমি একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করবো যে, এ বিদ্রোহ ছিল মুসলমানদের চক্রান্তেরই ফলাফল। হিন্দুরা নিজেদের ইচ্ছা ও উপকরণ পর্যন্ত সীমিত থাকলে এমন কোনো চক্রান্তে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারতোনা। এবং করতে চাইতোও না। মুসলমানরা প্রথম খলিফার সময়কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত দাম্ভিক, অসহিষ্ণু ও অত্যাচারী হিসেবেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে আসছে। সর্বদা তাদের মূল লক্ষ্য এই থাকে যে, যে করেই হোক ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং খ্রিষ্টানদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব জিইয়ে রাখতে হবে। মুসলমানরা

কখনো ভিন্ন ধর্মানুসারী সরকারের ভাল প্রজা হতে পারেনা। কেননা কুরআনের নির্দেশমালার উপস্থিতিতে এই সহাবস্থান সম্ভব নয়।"[১]

মুসলমানদের অধিকার হরণ ও চাকুরীচ্যুতি ঃ

পরবর্তী ইংরেজ প্রশাসনের সমস্ত উচ্চপদস্থ অফিসার ও কোর্ট-কাচারীর কর্মকার্তারা এই নীতি ও কর্মপন্থা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে থাকে যে, মুসলমানদেরকে প্রশাসন যন্ত্রের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ থেকে পৃথক রাখতে হবে। তাদের জীবিকার উৎস বন্ধ করে দিতে হবে। বাজেয়াপ্ত করতে হবে ওয়াকফকৃত সম্পদ ও জমিজমা গুলো যার সাহায্যে পরিচালিত হয় তাদের মাদ্রাসা ও প্রতিষ্ঠান সমূহ। এর পরিবর্তে এমন বিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে যেখান থেকে মুসলমানরা উপকৃত হতে পারেনা।[২] কোনো কোনো সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে একথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হতো যে, এই এই পদের জন্য শুধু হিন্দুদেরই নিয়োগ দেয়া হবে। স্যার উইলিয়াম হান্টার কোলকাতা হতে প্রকাশিত একটি ফার্সি পত্রিকার (১৮৬৯, ১৪ জুলাই) উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেনঃ "Recently, when several vacancies occurred in the office of the Sunderbans Commissioner, that official in advertising them in the Government Gazette, stated that the appointments would be given to none but Hindus." Commenting on the above complaint, the author goes on to say: "............... the Muslims have now sunk so low that, even when qualified for Government employment, they are studiously kept out of it by government notifications. Nobody takes any notice of their helpless condition, and the higher authorities do not deign even to acknowledge their existence.[3]

---

[১] Tufil Ahmad, Responsible Government and the Solution of Hindu-Muslim Problem. 1928, p.56.

[২] বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য- W.W. Hunter.The Indian Musalmans,1876

[৩] Ibid. p.176

"সুন্দরবনের কমিশনার সরকারী গেজেটে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, যেসব পদ শূন্য হয়েছিল সেগুলোতে হিন্দু ব্যতীত অন্য কাউকে নিয়োগ দেয়া হবেনা।[১] মুসলমানরা এখন এমন অধঃপতিত হয়ে গেছে যে, তারা যদি সরকারী পদ পাওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করে তবুও সরকারী ঘোষণার সাহায্যে বিশেষ সতর্কতার সাথে তাদের নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। মুসলমানদের অসহায়ত্বের প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করেনা। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাতো মুসলমানদের অস্তিত্ব মেনে নেয়াকেই নিজেদের অসম্মান মনে করেন।"[২]

মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ঃ

মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের ক্ষোভ ও প্রতিশোধ স্পৃহা খুবই স্পষ্ট ছিলো। অতি সাধারণ দোষ কিংবা শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হতো এবং কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি দেয়া হতো। হিন্দুস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে র দুর্গম এলাকা সমূহে মুজাহিদদের যে দলটি তৎপর ছিলো, তাদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে ও প্রচুর অর্থ ঢেলেও অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়েছিল। এ জন্য যার ব্যাপারেই সন্দেহ হয় যে, সে উক্ত দল কিংবা হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর দলে সাথে সম্পর্ক রাখে, সাথে সাথেই তার বিরুদ্ধে নির্মমভাবে মামলা পরিচালনা করা হয়। হিজরী ১২৮১ মোতাবেক ১৮৬৪ সালে পাটনা, থানেশ্বর ও লাহোরের বহু ওলামায়ে কেরাম, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যে মামলা চালানো হয়, তা থেকেই অনুমান করা যায় মুসলমানদের প্রতি তাদের অন্তরে কি পরিমান বিদ্বেষ ও ঘৃণা পুঞ্জিভূত ছিলো। তাদের মধ্য থেকে কতিপয় লোককে ইংরেজরা ওয়াহাবী নামে আখ্যায়িত করলো। মাওলানা ইয়াহইয়া আলী, মাওলানা মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী, মুহাম্মদ শফী লাহোরীর বিরুদ্ধে ফাঁসির ফয়সালা হলো। এই ফয়সালা শুনাতে গিয়ে জজ বললেনঃ You will be hanged till death, your properties will be confiscated and your corpses will

---

[১] প্রাগুক্ত পৃ.১৫৮।

[২] প্রাগুক্ত।

not be handed over to your relatives. Instead, you will be *buried* contemptuously in the jail compound.

"তোমাদের ফাঁসি দেয়া হবে এবং তোমাদের সমস্ত সম্পদ সরকার বাজেয়াপ্ত করবে। তোমাদের লাশগুলোও হস্তান্তর করা হবেনা তোমাদের আত্মীয় স্বজনদের কাছে। বরং তা অত্যন্ত অপমানের সাথে কারাগারের গোরস্তানে পুঁতে ফেলা হবে।" [১]

ইংরেজ নারী-পুরুষ সবাই ফাঁসির ঘরে আসতো। যাতে এই মজলুমদের অসহায়ত্ব ও যাতনা দেকে চোখ শীতল ও মন প্রফুল্ল করতে পারে। কিন্তু যখন তারা দেখলো যে, এ লোকগুলো বেশ আনন্দিত এবং আল্লাহর পথে কাঙ্ক্ষিত শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তখন এ অবস্থা তাদের সহ্য হলোনা। ডেপুটি কমিশনার আম্বালা সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত শুনালো যে, তাদের মৃত্যুদন্ড লোনা দরিয়ার দ্বীপে আজীবন নির্বাসনে পরিবর্তিত করা হয়। তিনি বললেন ঃ

You rejoice over the sentence of death and look upon it as martyrdom. The Government, therefore have decided not to award you the punishment your like so much. The death-sentence passed against you has been changed to that of transportation of life.

"তোমরা ফাঁসিতে ঝুলতে বড় ভালবাসো। এটাকে মনে করো শাহাদাত। এজন্য সরকার তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সে শাস্তি আর দিবেনা। তোমাদের ফাঁসির হুকুম লোনা দরিয়ার দ্বীপে চির নির্বাসনের সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।" [২]

আন্দামানের বন্দীগণ ঃ

এই বিস্ময়কর আবেগমূলক পন্থায়- যা ইংরেজদের ন্যায় নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণতন্ত্রের দাবীদার জাতির কাছে প্রত্যাশিত নয়। ১৮৬৫ সালে মাওলানা ইয়াহইয়া আলী, মাওলানা আহমদুল্লাহ

---

[১] কালাপানি, মাওলানা মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী ।

[২] কালাপানি, মওলানা মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী।

আযীমাবাদী, মৌলভী আবদুর রহীম সাদেকপুরী এবং মাওলানা মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরীকে পোর্ট আন্দামান পাঠিয়ে দেয়া হয়। মাওলানা ইয়াহইয়া আলী এবং মাওলানা আহমদুল্লাহ্ আন্দামানেই পরলোক গমন করেন এবং মৌলভী মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী দীর্ঘ ১৮ বছরের মানবেতর বন্দী জীবন ও নির্বাসন শেষে দেশে ফিরে আসেন। ইংজেরা পাটনায় সাদেকপুরী গোত্রের সমস্ত সম্পদ ও জমি জমা বাজেয়াপ্ত করে, গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয় তাদের বাড়ি ঘর এবং তদস্থলে নূতন সরকারী ভবন নির্মাণ করে। মুছে দেয় তাদের কবরগুলোর নাম নিশানা। এ সব কিছু করা হয় তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করে অন্তরে প্রশান্তি যোগানোর জন্য।

এভাবে খ্যাত ও জলীলুল কদর ওলামায়ে কেরামের একটি বিশেষ অংশকে নির্বাসনের শাস্তি দেয়া হয়। তাদের মধ্যে মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী, মুফতী এনায়েত উল্লাহ কাকুরী, মুফতী মুজহের করীম দরয়াবাদী তো সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাকি দু'জন আলেম দীর্ঘ দিন নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

শিক্ষা ও রাজনীতিতে অধঃপতনের কারণ ঃ

এই নির্মম ও অদ্ভূত আচরণ যা ইংরেজ সরকার মুসলমানদের সাথে করেছে তা-ই মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার অভাব ও সরকারী চাকরী না পাওয়ার মূল কারণ। ইংরেজ প্রশাসনের পক্ষ হতে তাদের উপর অন্যায় ভাবে আরোপিত অভিযোগসমূহ থেকে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যয় হয়ে যেতো তাদের সকল সময়। এই সুযোগ কখনো হতো না যে, তারা দেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবে এবং জাতীয় সচেতনতা ও জাগরণে দেশের অন্যান্য দ্রুত উন্নতিশীল অধিবাসীদের পাশাপাশি সামনে অগ্রসর হবে। কারণ অন্যান্য সম্প্রদায় সরকারের অকুণ্ঠ আস্থা ও অনুপ্রেরণার বলে বলীয়ান ছিলো। পক্ষান্তরে মুসলমানরা ছিলো তাদের বিরাগভাজন ও ঘৃণার পাত্র।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ও তাতে মুসলমানদের অংশ গ্রহণ ঃ

১৮৮৪ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কতিপয় শ্রেষ্ঠ মুসলিম পন্ডিত ও চিন্তাবিদ অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে। এর সভাপতিত্ব করেন জনাব বদরুদ্দীন তৈয়বজী। এতে মীর হুমায়ুন জাহও অংশ গ্রহণ করেন এবং কংগ্রেসের তহবিলে পাঁচ হাজার রূপি চাঁদা দেয়ার ঘোষণা করেন। এই সভায় মুসলমান দায়িত্বশীল, ধনবান, উকিল ও ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশ উপস্থিত ছিলেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের পৃথক রাজনৈতিক প্ল্যাট ফরম ঃ

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রনায়ক, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান শুরুতে জাতীয় ঐক্যের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানদের শিক্ষাগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধঃপতন দেখে তিনি এ থেকে আলাদা থাকতে ভাল মনে করেন। তিনি বাইরে থেকে মুসলমানদের সতর্ক করে দেন যে, তারা যেন আবেগপ্রবণ হিন্দু ও চরমপন্থী বাঙ্গালীদের প্রভাবে প্রভাবিত না হয়, যারা ইংরেজদের রাজনীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা ও স্বীয় অধিকার আদায়ের দাবী উত্থাপন করেছিলো। তিনি একটি ইসলামী প্ল্যাটফরম গঠনের পরামর্শ দেন এবং রাজনীতি হতে পৃথক থাকার উপর জোর আরোপ করেন, কারণ তিনি মনে করেন ব্রিটিশের বিরোধিতায় হিন্দুদের সাথে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুললে মুসলমানদের জন্য নতুন জটিলতা ও সমস্যা সৃষ্টি হবে। এতে করে সেই পুরনো ক্ষত নতুন ভাবে তাজা ও জীবন্ত হয়ে উঠবে, যা এখনো পুরোপুরি মুছে যায়নি। স্মর্তব্য যে, স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খানের উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি সন্দেহাতীতভাবে ভুল ছিল। মুলতঃ ইংরেজ রাজনীতিক Mr. Back ও তাঁর পূর্বসূরি Mr. Morrison এর প্রভাবেই তিনি এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করতেন। ভারতবর্ষের মুসলিম রাজনীতিতে উক্ত দু'রাজনীতিবিদের প্রভাব ছিল শক্তিশালী । সে সময়ে রাজনীতির প্রতি মুসলমানদের অনীহ ভাব জাতীয় অস্তিত্বকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, এটাই বাস্তবতা।

কংগ্রেসের সমর্থনে ওলামায়ে কেরাম ঃ

কিন্তু স্বাধীন মুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তানায়কদের একটি বড় অংশ যাদের শীর্ষে ছিলেন ওলামায়ে কেরাম তাঁরা কংগ্রেসের সহায়তা এবং রাজনৈতিক ও জাতীয় আন্দোলন সমূহে অংশ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজনীতিকে তাঁরা মুসলমানদের জন্য "নিষিদ্ধ বৃক্ষ" মনে করতেন না। মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব লুধিয়ানভী ১৮৮৮ সালে *'নুসরাতুল আবরার'* নামে ফতোয়া সমূহের একটি সংকলন প্রকাশ করেন। এতে কংগ্রেসের সহযোগিতা ও সমর্থনের প্রতি আহবান করা হয়। শুধু হিন্দুস্তানের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম নন বরং মদীনা মুনাওয়ারা ও বাগদাদের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণও এত স্বাক্ষর করেন। মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এবং মাওলানা লুৎফুল্লাহ্ আলীগড়ী (রহ.) ও স্বাক্ষরকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

১৮৮৮ সালে ইলাহাবাদে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বার্ষিক সভায়ও কতিপয় শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম অংশ গ্রহণ করেন। এভাবে মুসলমানগণ কংগ্রেসের কর্মতৎপরতায় অংশ নিতে থাকেন এবং স্বদেশবাসীদের সাথে যোগ দিয়ে এই বৃহৎ জাতীয় ঐক্যের গঠন, উন্নতি ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বলকান যুদ্ধ এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্রোহ ঃ

১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধ শুরু হয় এবং ইউরোপীয়ান রাষ্ট্র সংঘ বিশেষতঃ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জনমনে ক্ষোভ ও দুঃখের এক প্রবল ঝড় বইতে শুরু করে। প্রাচ্যের ইসলামী রাজনৈতিক জাগৃতির ক্রমবর্ধমান লাভা সহসা বিস্ফোরিত হয়। সে সময়েই মাওলানা আবুল কালাম আযাদ *'আল-হিলাল'* পত্রিকা প্রকাশ করেন। এতে আগুনঝরা বক্তব্য প্রচার করা হতো এবং ইউরোপের মুসলিম বিদ্বেষী রাজনীতি ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে অত্যন্ত বাকনৈপুন্য ও বলিষ্ঠতার সাথে প্রামান্য সমালোচনা করা হতো। হাজার নয় লাখো মুসলমান আগ্রহ ও কৌতুহলের সাথে তা পাঠ করতেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী কলকাতা হতে *The Comrade* পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে এর কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় দিল্লিতে। তিনি ইংরেজ

রাজনীতির বিরুদ্ধে সুনিপুন ও বিদ্রূপ মিশ্রিত ভাষায় সমালোচনা করতেন। অনুরূপ মাওলানা যফর আলী খানের *'জমিদার'* পত্রিকা অন্যান্য ইসলামী সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন জন সম্মুখে আসে। এর মাধ্যমে সমগ্র হিন্দুস্থানে এক মানসিক ও নৈতিক বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে ভারত সরকার মাওলানা যফর আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা হাসরত মুহানীকে গ্রেফতার করে।

মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মাওলানা শিবলী নো'মানী (রহ.) এর অবদানকে খাটো করে দেখা সম্ভব নয়। তিনি *'আল হেলাল'* এ প্রকাশিত কাব্য ও *'মুসলিম গেজেট'* এ প্রচারিত তাঁর রচনা সমূহের সাহায্যে ইংরেজদের শোষণ নীতি ও মুসলমানদের দূর্বল রাজনীতির বিরুদ্ধে জোরদার সমালোচনা করে শিক্ষিত সমাজের মন-মানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহ.) ঃ

দারুল উলূম দেওবন্দের মাওলানা মাহমূদুল হাসান (যিনি পরে 'শায়খুল হিন্দ' নামে খ্যাত হয়েছেন) ইংরেজ শাসন ও আধিপত্যের প্রবল বিরোধী ছিলেন। সুলতান টিপুর পরে ইংরেজদের এত বড় শত্রু ও প্রতিপক্ষ আর কেউ আত্মপ্রকাশ করেনি। তিনি তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের অগ্রনায়ক ও খিলাফতের পতাকাবাহী ওসমানী সালতানাতের সোচ্চার সমর্থক এবং হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা ও স্বাধীন জাতীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ আহবায়ক ছিলেন। তিনি সেই মহান ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন, যাদের সমস্ত জীবন এই মূল্যবান মিশনের জন্য ওয়াকফ ছিলো এবং সব আবেগ-উদ্দীপনা চেষ্টা-উদ্যম এই মিশনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। এ ক্ষেত্রে তিনি আফগান সরকার ও ওসমানী সাম্রাজ্যের কতিপয় নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি যেমন আনোয়ার পাশা প্রমুখের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন।[১] ১৯১৬ সালে শরীফ হোসাইনের সরকার তাঁকে

---

[১] ইংরেজদের বিরুদ্ধে বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার পক্ষ হতে তিনি পত্র লাভ করতে সক্ষম হন। এই পত্রগুলো তিনি কাঠের ফলকে প্রোথিত করে বক্স তৈরী করেন এবং তাতে রেশমী কাপড় ভর্তি করে হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেন। বক্সটি হিন্দুস্থানে

মদীনা মুনাওয়ারায় গ্রেফতার করে ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দেয়। ইংরেজ প্রশাসন তাঁকে এবং কতিপয় সাথী ও শিষ্য মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা উযাইর গুল, মাওলানা হাকীম নুসরাত হোসাইন, মৌলভী ওয়াহীদ আহমদকে ১৩৩৫হি./১৯১৭ সালে মাল্টার দ্বীপে নির্বাসন দেয়। তাঁরা ১৩৩৮ হিজরী/১৯২০ সাল পর্যন্ত সেখানে দুঃখের জীবন অতিবাহিত করেন।

মাওলানা আবদুল বা'রী ফিরিঙ্গী মহল্লী (রহ.) ঃ

জমিয়তুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল বা'রী ফিরিঙ্গী মহল্লী (১৯২৬) স্বাধীনতা ও খিলাফত আন্দোলনের বলিষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও লক্ষ্ণৌতে তাঁর আবাসস্থল তথা ফারাঙ্গী মহল ছিলো মুসলমানদের বিশ্বাস ও রাজনীতির কেন্দ্র।

রওলেট রিপোর্ট (Rowlatt Report) ঃ

১৯১৮ সালে রওলেটের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে মুসলমানদেরকেই বিশেষভাবে টার্গেট করে বিদ্রোহের জন্য দায়ী করা হয়। এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের সর্বত্র প্রবল প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

খিলাফত আন্দোলন ও হিন্দু-মুসিলম ঐক্য ঃ

১৯১৯ সালে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। তখন হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে ঐক্যের বেশ চমৎকার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনের মুকাবিলা, ওসমানী শাসনের ক্ষেত্রে ঐক্য প্রত্যাশীদের রাজনীতির বিরোধিতা, দেশের স্বাধীনতা ও স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠনের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। সমগ্র হিন্দুস্থান জুড়ে বইতে শুরু করে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রবল হাওয়া। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে হিন্দুস্থানে রাজনৈতি সচেতনতা সৃষ্টি হয়, দেশপ্রেম ও ইংরেজদের প্রতি ঘৃণার প্রবল উচ্ছাস দেখা দেয়। এতে গান্ধীজী পূর্ণ উদ্যম ও অটল জযবার সাথে অংশ গ্রহণ

আপন গন্তব্যে পৌঁছে যায় এই ঘটনাটি 'রেশমী রুমাল' নামে খ্যাত। রলেট (Rowlatt) তার বিখ্যাত প্রতিবেদনে এর উল্লেখ করেছেন।

করেন। তিনি মাওলানা মুহাম্মদ আলী এবং মাওলানা শওকত আলীর সাথে সমগ্র দেশ চষে বেড়ান। এমন বড় বড় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যার চেয়ে বড় ও উত্তপ্ত সমাবেশ ভারতবর্ষে এর পূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি।এবং পরে দেখার আশাও নেই। সাধারণ জনতা এই নেতাদের হৃদয় উজাড় করে সংবর্ধনা জানায় এবং শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করে তোলো আকাশ- বাতাস।

মৌপালাদের উপর ইংরেজ অত্যাচার ঃ

হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা আন্দোলন ও তাহরীকে খিলাফতের সময় সবচেয়ে বেশী জানমালের ক্ষতির শিকার হয় দক্ষিণ হিন্দুস্থানের একটি মুসলিম গোত্র মৌপালার সদস্যরা। তাদের লক্ষ লক্ষ সদস্য মালাবারে (বর্তমান কৈরালা) বসবাস করে। ১৯২১ সালের ২১ আগষ্ট মৌপালারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়ে অত্যাচার ও নিপীড়নের জবাব দিতে শুরু করে। এই প্রতিরোধ যুদ্ধ ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। নিহত মৌপালাদের সংখ্যা কয়েক হাজার। তাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্রিটেনের যুদ্ধ জাহাজকেও তৎপর হতে হয়। এই যুদ্ধে মাত্র আগষ্ট হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারের পক্ষে ব্যয় হয় ৫১ লাখ রূপী। মৌপালাদের বন্দীদেরকে জানোয়ারের মত গাড়িতে ভর্তি করা হয়। তিনজন ডাক্তার একমত হয়ে ঘোষণা দেয় যে, তাদেরকে যে গাড়িতে ভর্তি করা হয় তা কখনো মানুষের উপযোগী ছিলোনা। এই হতভাগাদের এক বিরাট অংশ দম বন্ধ হয়ে গাড়িতেই মৃত্যু বরণ করেন। তাদের আর্তচিৎকার এবং পানির জন্য হাহাকারে কারো মনে দয়ার উদ্রেক হলোনা। বিদ্রোহ দমনের পরেও মৌপালারা কঠিন প্রহরায় জীবন যাপন করতো। এবং তাদের সাথে অপমান জনক আচরণ অব্যাহত ছিলো। বহুদিন যাবৎ তাদেরকে সে সব নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত রাখা হয়, যা তারা লাভ করেছিল প্রাকৃতিকভাবেই। ১৯২২ সালে গঠিত মালাবারের সরকারী তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয় ঃ

There are at lest 35,000 Mopla women and children whose condition is extremely miserable and unless

proper measures are taken for their relief, many of them are likely to die of disease and starvation.

"নিদেনপক্ষে ৩৫ হাজার মৌপালা নারী ও শিশুর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যদি তাদের কাছে জরুরী ভাবে উল্লেখযোগ্য সাহায্য না পৌঁছানো হয়, তবে তাদের অনেকে ক্ষুৎপিপাসা ও রোগে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অসহযোগ আন্দোলন (Non co operation movement) ঃ

১৯২০ সালে গান্ধীজী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বৈদেশিক পণ্য বর্জন (Boycott) ও সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব পেশ করেন। এটা অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার। এই হাতিয়ার প্রয়োগ করা হয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে। ইংরেজ সরকার এর প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করতে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে এ আশঙ্কা দেখা দেয় যে,পুরো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম স্থবির হয়ে যাবে এবং গণবিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। তখন ধীরে ধীরে আলামত সুস্পষ্ট হচ্ছিলো ইংরেজ শাসনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার। ব্রিটেনের সরকারের পুরো শাসন যন্ত্র এত দূরবর্তী দেশে বড় জটিলতা ও সমস্যার শিকার হচ্ছিলো।

ইংরেজ রাজনীতির তুণীর শেষ তীর ঃ

কিন্তু ইংরেজ রাজনীতি তার তুণীর শেষ তীর নিক্ষেপ করলো, যা সাধারণত প্রাচ্য দেশসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়না। এই তীর ছিলো সাম্প্রদায়িক উস্কানী ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার তীর। একজন রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) জনৈক হিন্দু নেতাকে এই কথা বুঝালো যে, হিন্দু ধর্ম প্রচার করুন এবং এদেশের অধিকাংশ হিন্দু মুসলমান হয়ে গেছে। তাদেরকে পুনরায় হিন্দুত্বের দিকে ফিরিয়ে আনুন। হিন্দু সম্প্রদায়কে ধর্মীয় ও সামরিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যাস্ত করুন।' কেননা সে সময় খিলাফত ও স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের প্রাধান্য ও তৎপরতা, কর্মশক্তি ও বিন্যাস দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিলো তাদেরই হাতে। কারণ যে বিষয়টি সাধারণ জনতাকে অনুপ্রাণিত করতো

তা ছিল ইসলামী বিষয়, যার সরাসরি সম্পর্ক ছিলো খিলাফতের কেন্দ্রের সাথে।

শুদ্ধি ও সংগঠন, তাবলীগ ও তানজীম ঃ

এই কেন্দ্রবিন্দু হতেই সংগঠন ও শুদ্ধি অভিযান শুরু হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে এর দায়ী ও প্রচারকগণ। এর বিপরীতে গড়ে উঠে ইসলাম প্রচারের স্বতন্ত্র শিবির। শুরু হয় তানজীম আন্দোলন। ধর্মীয় বিতর্ক, বক্তব্য ও জলসার এক অশেষ ধারা শুরু হয়ে যায়। ফলে উপমহাদেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামার এক সাইমুম ঝড় বইতে থাকে যার আবর্তে তালগোল পাকিয়ে যায় সমগ্র দেশের পরিস্থিতি। এই নাজুক পরিস্থিতিতেও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখে এবং অনুষ্ঠিত হতে থাকে এর সভা-সমাবেশ। ১৯২৩ সালের বিশেষ সভার সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। সে বছরের বার্ষিক অধিবেশন মাওলানা মুহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে 'কুকনাড়ে' অনুষ্ঠিত হয়।

সাম্প্রদায়িক দাবানল ঃ

সাম্প্রদায়িক দ্বন্ধ-কলহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এমনকি ১৯২৭ সালের মাত্র মাস দু'য়েকের মধ্যে পঁচিশটি হাঙ্গামা হয়। এই দাঙ্গাগুলোই ছিলো সাধারণ মানুষের আলোচনার বিষয়। প্রত্যেকের মুখে রাতদিন এই একটিই আলোচনা। কংগ্রেস ও খিলাফত আন্দোলনের নেতাদের ক্ষমতা ছিলোনা যে, তারা এই দাঙ্গা-ফ্যাসাদ রুখে দাঁড়াবে এবং হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সেই সোনালী যুগে নিয়ে যাবে, যখন পরস্পরে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস, শান্তি ও সুখের নির্মল পরিবেশ বিরাজমান ছিলো। সারকথা, এভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাশাপাশি নেতাদের মাঝেও বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা দেখা দেয়। হিন্দু-মুসলমান কেউ এ বাস্তবতা এড়াতে পারেননি।

বিচ্ছিন্নতার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ঃ

লোকেরা ভাবতে শুরু করলো যে, দেশের জাতীয় নেতাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা শীতল হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁরা

সাম্প্রদায়িক শিবিরে অংশ গ্রহণ করছেন। নেতাগণ ধর্মীয় শ্লোগান ও আবেগ-অনুভূতিতে প্রভাবিত হয়ে ভাবনার ঘোড়া দৌড়াতে শুরু করেছেন। মুসলমানদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ মনে করছিলেন যে, হিন্দু নেতারা (যাদের প্রধান ছিলেন গান্ধীজী) দাঙ্গা-ফ্যাসাদ থামানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা সে দৃঢ় সংকল্প ও চেষ্টা-উদ্যমের প্রমাণ দেননি, যা তাদের কাছে প্রত্যাশিত ছিলো। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও শক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে তাঁদের পক্ষে এটা সম্ভব ছিলো যে, তাঁরা পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে এই বিস্তৃত দাবানলকে থামিয়ে দিবেন, যা দেশের শান্তি ও ঐক্যের সেই সোনালী পরিবেশকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

এই ধারণা সঠিক হোক বা ভুল, কিংবা এতে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয়া হোক, এই ধারণা ও অনভূতি বহু এমন মুসলিম নেতাকে কংগ্রেস থেকে দূরে সরিয়ে দেয় যারা জাতীয় আযাদী আন্দোলনের অগ্রপথিক ছিলেন, গোটা জাতির মনমানসে স্বাধীনতার স্পৃহা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন এবং দেশসেবা ও ইংরেজ বিরোধিতায় যাদের গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। তাঁরা এবার নিজেদের মনোযোগ ও তৎপরতা মুসলমানদের বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করা সমীচীন মনে করেন।

মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য ও বিভক্তির দাবী ঃ

এভাবে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও তাঁর বহু সাথী-সঙ্গী কংগ্রেস থেকে ইস্তেফা দিয়ে মুসলমানদের জাতীয় শিবিরে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান। সময়ের বিবর্তনে মুসলমানদের মধ্যে দেশবিভাগের মনোভাব চাঙ্গা ও তীব্র হতে থাকে। বিভক্তি আন্দোলনে মিষ্টার মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। ১৯৩৭ সালে মি.জিন্নাহ মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং মাত্র ক'বছরের মধ্যে এটা ভারতীয় মুসলমানদের শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনে পরিণত হয়। মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশের উষ্ণ সমর্থনে বলীয়ান হয়ে এ আন্দোলন এক পর্যায়ে 'পাকিস্তান' সৃষ্টির দাবী তোলে। ভারতের সামাজিক অস্তিত্বে অনিয়ম, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে নিরাপত্তার অভাব, রাষ্ট্রীয় অফিস-

আদালতে সাম্প্রদায়িকতার তিক্ত অভিজ্ঞতা, আন্তঃসম্প্রদায়ের পারস্পরিক অনাস্থা, রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব ও পরস্পর কাঁদা ছুঁড়াছুড়ি মুসলমানদের এই দাবীকে আরো সুদৃঢ় করে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় অখন্ড ভারত। জন্ম নেয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের। পরবর্তীতে পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় স্বাধীণ বাংলাদেশের।

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ও জমিয়াতুল উলামা ঃ

ওলামায়ে কেরামের যে বড় অংশ 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' এর সাথে জড়িত ছিলো তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কংগ্রেসের সাথে ছিলেন এবং পূর্বমত ও চিন্তাধারার উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকেন।[1] তাঁদের সর্বাগ্রে ছিলেন মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদনী (রহ.) যিনি ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ, দেশের স্বাধীনতার জন্য অসীম আগ্রহ-অনুপ্রেরণা ও আন্তরিকতায় তাঁর শায়খ মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহ.) এর যোগ্য স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং জমিয়তে ওলামার অন্যান্য সদস্যগণ মুসলমানদের বৃহত্তম অংশ তথা মুসলিম লীগের সমর্থকদের তীব্র অসন্তোষ, ক্ষোভ ও অবমাননা হাসিমূখে সহ্য করেন। মাওলানা মাদানী এ বছরটি কঠিন ব্যস্ততা, উৎকণ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অতিবাহিত করেন। শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শত-সহস্র মাইল এক নাগাড়ে সফর করেন। তখন তাঁর ধর্মীয় ও চারিত্রিক জীবন ছিলো নিষ্কলুষ ও সন্দেহমুক্ত। তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার উপর পক্ষ ও বিপক্ষ সবাই ছিলো একমত। ইংরেজ শাসনের কালো অধ্যায় শেষে যখন স্বাধীন হলো হিন্দুস্থান এবং দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় প্রশাসন হতে ফায়দা হাসিলের সুযোগ হাতে আসলো, তখন তিনিই ছিলেন একমাত্র সেই অনুপম ব্যক্তিত্ব, যিনি ব্যক্তিগত একটি তুচ্ছ স্বার্থ উদ্ধার করতেও প্রস্তুত হননি। এমনকি যখন ১৯৫৪ সালে ভারত প্রজাতন্ত্র সরকার তাকে *'পদ্ম বিভূষন'* (ভারতের সর্ব বৃহৎ সাহিত্য পদক) এর সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তিনি বিনয়ের সাথে এই বলে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন যে, এটা তাঁর

---

[1] সে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ, সভাপতি, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ, মাওলানা সাঈদ আহমদ, মাওলানা মুহাম্মদ সাজ্জাদ বিহারী, মাওলানা হিফজুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ, মাওলানা আতাউল্লাহ্ শাহ বুখারী, মাওলানা হাবীবুর রহমান লুধিয়ানবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্বসূরীদের রীতি সম্মত নয়। নিঃসন্দেহে দেশের স্বাধীনতার মাধ্যমে তিনি যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষন করেছিলেন, এর অনেক কিছুই পূর্ণ হয়নি, বরং সেসময় তিনি এমন বহু তিক্ত অভিজ্ঞতাও লাভ করেছেন, তাঁর কোমল হৃদয়কে ভেঙ্গে খান খান করে দেয়। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে কখনো বিচ্যুত হয়নি তাঁর অবিচল পদ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী কালে কোন পরিবর্তন আসেনি তাঁর নীতি ও চিন্তাধারায়।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ঃ

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ দীর্ঘদিন কংগ্রেসের সভাপতির দ য়িত্ব পালন করেন। অন্য কোন সভাপতি এত দীর্ঘ ও নাযুক সময় দায়িত্ব পালন করেননি। তার সভাপতিত্ব কালে ভারতবর্ষ বহু স্পর্শকাতর ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। সে সময় ভারতের সমস্যার সমাধান,স্বাধীনতার শর্ত নির্ণয় ও আনুপুঙ্খ বিশ্লেষনের জন্য ব্রিটেন সরকারের পক্ষ হতে দু'টি প্রতিনিধি দল (ক্রিপ্‌স মিশন ও কেবিনেট মিশন) প্রেরণ করা হয়। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সভাপতি রূপে আলোচনায় কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রতিনিধিদল গুলোর সদস্যরা যাদের নেতা ছিলেন Sir Stafford Cripps, মাওলানা আযাদের মেধা ও প্রতিভা, রাজনৈতিক বিচক্ষনতা ও সাংবিধানিক সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয় সহজে বুঝার অসাধারণ দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তারই সভাপতিত্বে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে হিন্দুস্থান স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁর গ্রন্থ India Wins Freedom অধ্যয়ন করে একথা অনুধাবন করতে মোটেই বেগ পেতে হয়না যে, তিনি কংগ্রেসের পুরা প্রশাসন যন্ত্রে এক সজাগ মস্তিষ্কের ভূমিকা পালন করতেন এবং স্বীয় প্রতিভা, দূরদর্শিতা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানকে পরিবেষ্টন করে রাখতেন। একজন জাতীয় নেতার পক্ষে স্বদেশের আযাদী আন্দোলনে যতটুকু অবদান রাখা সম্ভব, হিন্দুস্থানের আযাদী আন্দোলনে তিনি সেই অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

জ্ঞান বিজ্ঞানে ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের অবদান

মুসলমানদের ঝুঁকিপূর্ণ ও দ্বিমাত্রিক দায়িত্ব ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম সকল যুগে নিজেদের প্রিয় মাতৃভূমির সাথে সুগভীর, আন্তরিক, নিবিড় ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্কের দৃষ্টান্তই স্থাপন করে গেছেন। স্বদেশের শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর শাখাও বাদ দেননি। সবখানে তাঁদের ভূমিকা ছিল মূখ্য। একই সাথে স্বীয় ধর্মীয় তথা ইসলামী ও আরবী কৃষ্টি-কালচার এবং ঐতিহ্যের সাথেও সমানভাবে বিশ্বস্ততার সাক্ষর রেখেছেন। ইসলামী দুনিয়ার সাথে তাঁদের নিবিড় সম্পর্ক এক মূহুর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন হয়নি বরং ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের অবস্থান সেনাপতি সুলভ ছিল।

দু'ভিন্ন প্রকৃতির সংস্কৃতির মাঝে সহাবস্থান ও সমন্বয় সাধন এবং ভিন্ন দু'টি স্বদেশের (সত্তাগত ও আধ্যাত্মিক) একই সাথে সুষম বিশ্বস্ততা বজায় রাখা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইসলামী উম্মাহর মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের মত একই সময়ে একই সাথে এমন ঝুঁকিপূর্ণ, দ্বিমাত্রিক ও দ্বৈত দায়িত্ব সফল ভাবে পালনের নজীর দ্বিতীয়টি নেই।

লেখা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের অগ্রণী ভূমিকা ঃ

ইসলামী শিক্ষার জগতে ভারতীয় মুসলমানদের গ্রন্থের সংখ্যা অগুনতি। হাজী খলিফা প্রণীত *'কাশফুয যুনূন'* এর ব্যাপক বিষয় সম্বলিত সাধারণ গ্রন্থও ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের লিখিত গ্রন্থাবলী ও রচনাকর্মের আলোচনা থেকে খালি থাকেনি। মাওলানা আবদুল হাই হাসানী (রহ.) (মৃত্যু ঃ ১৩৪১ হিজরী ,১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) রচিত *'আস-সাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ'* [১] (ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী

[১] এটি ভারতীয় উপমহাদেশে জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের ধারা এবং গ্রন্থাবলীর সূচী বিবরণী, যাতে পাঠ্যসূচীর ক্রমোন্নতি ও কালানুক্রমিক বিন্যাস এবং সংস্কার সংক্রান্ত বিশদ বিবরণী প্রদত্ত হয়েছে। তাছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের নানা শাখায় ভারতীয় ওলামাদের পৃথক পৃথক ছোট বড় গ্রন্থের বিস্তারিত তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি '৫৮ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কের 'রয়েল একাডেমী'র

সংস্কৃতি) শীর্ষ গ্রন্থের সরল স্বীকৃতি থেকেই ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের লেখা ও গবেষণা এবং গ্রন্থ রচনার অগ্র প্রয়াসের যথাযথ ধারণা লাভ করা যায়।

ভারতীয় ওলামায়ে কেরাম রচিত কতিপয় বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাবলী ঃ

এ পর্যায়ে আমি ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান ওলামায়ে কেরাম রচিত সেসব বিশ্ববরেণ্য গ্রন্থাবলীর ব্যাপারে আলোকপাত করতে প্রয়াস পাবো যা ভারতের সীমানা পেরিয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে আপন মহিমায়। আরবরাও এসব গ্রন্থকে সাদরে ও সসম্মানে বরণ করে নিয়েছেন। এ ধারা পরিক্রমায় সর্বাগ্রে হিজরী ৭ম শতাব্দীর (খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) হাদীসের ইমাম ও অভিধান বিশারদ হাসান বিন মুহাম্মদ আস্ সাগানী লাহোরী রচিত *'আল-উবাবুয যাখির'* গ্রন্থের আলোচনা সমধিক প্রণিধানযোগ্য মনে করি। এটি আরবী ভাষায় প্রামাণ্য ও মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। অভিধান বিশারদগণ যুগে যুগে এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং গ্রন্থকারের পান্ডিত্য, গভীরদৃষ্টি ও বিদগ্ধতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অকুণ্ঠ চিত্তে। আল্লামা সূয়ুতী (রহ.) এ গ্রন্থের রচয়িতা সম্পর্কে লিখেন ঃ "তিনি অভিধান শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন।" ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁকে "অভিধান শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন ও চূড়ান্ত দলীল" হিসেবে অভিহিত করেন। আদ্ দিময়াতীর মতে তিনি " ফিক্হ শাস্ত্র ও হাদীস শাস্ত্রের পথিকৃৎ ছিলেন।" আলোচ্য গ্রন্থকারের অপর বিখ্যাত রচনা *'মাশারিকুল আরদ'* ওই স্তরের গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত যে, সুদীর্ঘকাল ব্যাপী তা শিক্ষানিকেতন সমূহে সিলেবাসভূক্ত হয়ে ইসলামী দুনিয়ায় ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। সেই বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর অন্যতম হলো হিজরী দশম শতাব্দীর (খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আলী বিন হুসাম উদ্দীন আল মুত্তাকী বুরহানপুরী (রহ.) (শায়খ

পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে সংযোজিত ও বর্ধিতরূপে রে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। (মাওলানা আবুল ইরফান নদভী (রহ.), শিক্ষক- দারুল উলূম নদ্ওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ কর্তৃক উর্দূ অনূদিত।) 'হিন্দুস্তানে ইসলামী জ্ঞান শাস্ত্র' নামে 'দারুল মুসান্নিফীন' আমজগড় থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

আলী মুত্তাকী গুজরাটী) রচিত গ্রন্থ *'কানযুল উম্মাল'* [1] যা আল্লামা সুয়ুতীর (রহ.) *'জাম্উল জাউয়ামি'* এর বিষয় ভিত্তিক ও পরিচ্ছেদ বিন্যাসের ধারাবাহিকতা[2]। *'কানযুল উম্মাল'* হাদীস শাস্ত্রের সেই বিখ্যাত গ্রন্থ যা থেকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ব্যাপক উপকৃত হয়েছেন এবং গ্রন্থকারের পান্ডিত্য, পারদর্শিতা ও অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যিনি তাদের অসংখ্য সূত্র ও প্রাসঙ্গিকতা খোঁজার সীমাহীন পরিশ্রম থেকে পরিত্রান দিয়েছেন। শায়খ আবুল হাসান আল-বাকারী আশ শাফেয়ী (রহ.) যিনি হিজরী দশম শতাব্দীর নেতৃত্বস্থানীয় ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, 'সারা দুনিয়ার উপর ইমাম সুয়ুতীর (রহ.) অবদান রয়েছে কিন্তু খোদ সুয়ূতী শায়খ আবদুল মুত্তাকীর কাছে ঋণী।' আল্লামা মুহাম্মদ তাহের পাটানী[3] (মৃত্যু ঃ ৯৮৬ হিজরী) বিরচিত *'মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার ফি গারাইবিত তানযীল ওয়া লাতাইফিল আখবার'* নামক গ্রন্থের খ্যাতি দুনিয়া জোড়া। মওলানা আবদুল হাই (রহ.) *'নুযহাতুল খাওয়াতির'* গ্রন্থে মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) বলেন, 'এই গ্রন্থে লেখক হাদীসের প্রয়োজনীয় শব্দার্থ এবং শব্দের ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন এবং এতদসংক্রান্ত মুহাদ্দিসীনদের মতামত সংকলন করেছেন। ফলে এটি ষষ্টপ্রামাণিক গ্রন্থের (সিহাহ সিত্তা) ব্যাখ্যা গ্রন্থের স্থানে অভিষিক্ত হয়েছে। শুরু থেকে এ গ্রন্থ বিদগ্ধ মহলে বরাবরই সমাদৃত হয়ে সর্বজন বিদিত গ্রন্থ হিসেবে বিজ্ঞ মহলকে ঋণী করে গেছেন।" আল্লামা মুহাম্মদ তাহির (রহ.) বিরচিত *'তাযকিরাতুল মাওজুয়াত'* হাদীসের বিষয়সূচী' বিষয়ক গ্রন্থরূপে

---

[1] সুদীর্ঘকাল হতে এ গ্রন্থ হায়দারাবাদ 'ইদারাতুল মা'আরিফ' হতে প্রকাশিত হয়ে দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি ও সমাদরের উচ্চাসনে সমাসীন রয়েছে।

[2] আল্লামা সুয়ুতীর কিতাব 'জামউল জাওয়ামি' হাদীস শাস্ত্রের সর্ববৃহৎ পরিসরের এক অনবদ্য আকর কিন্তু লেখক এতে বিষয় সূচী অনুযায়ী অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যাস করেননি। (ফিক্হ ও অর্থগত) হাদীসে ক্বাউলী তথা মহানবীর (সা.) মুখনিঃসৃত পবিত্র বাণীমূলক হাদীস হলে হাদীসের প্রথম শব্দ মুখস্ত থাকলেই আর ফে'লী বা কার্য, সম্মতি সূচ হাদীস হলে বর্ণনাকারীর নাম মুখস্ত থাকলেই কেবল হাদীসটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। শায়খ আলী মুত্তাকী এটাকে বিষয় ভিত্তিক অধ্যায় পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করায় তা অধিকতর ফলপ্রসূ ও ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে।

[3] পাঠান গুজরাটে অবস্থিত, এটি এখনো একটি ঐতিহ্যমন্ডিত আলোচিত অঞ্চল। আহমদাবাদ থেকে প্রায় ৬৮ মাইল দূরত্বে উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ' আল হালওয়াড়া' আরবীতে 'নাহার দালা' লিখা হয়। হিজরী ৫ম শতাব্দীতে গুজরাট একটি শক্তিশালী মুসলিম রাজত্বের রাজধানী ছিল। ৪১৬ হিজরীতে সুলতান মাহমূদ গজনভী এটি জয় করেন। ৫৯২ হিজরীতে কুতুব উদ্দীন আইবেক কর্তৃক এটি ২য় বার বিজিত এলাকা।

ব্যাপক সমাদৃত ও প্রখ্যাত গ্রন্থ। এই ক্রমধারায় *'আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া'*ও উল্লেখযোগ্য যা সাধারণ মহলে *'ফাতাওয়া আলমগীরী'* নামেই অত্যধিক পরিচিত। ফিকহী মাসায়েল বিষয়ক গ্রন্থের জগতে এটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি গ্রন্থের মর্যাদা রাখে। যেসব ইসলামী রাষ্ট্রের শরয়ী আদালতে হানাফী মতাদর্শ মতে রায় প্রদান করা হয়, সেখানে এ গ্রন্থ 'প্রামাণ্য আইন গ্রন্থ' হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এটি সংশ্লিষ্ট বিদগ্ধ মহলে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে আদৃত। *'আস্ সাকাফাতুল ইসলামিয়া'* গ্রন্থের রচয়িতা এ সম্পর্কে বলেন, "ফতোয়া-এ-আলমগীরী যাকে 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া' বলা হয়, অধিক সংখ্যক মাসায়িল সংকলন, সহজবোধ্য ও সাবলীল রীতির লিখন পদ্ধতি এবং অত্যন্ত কঠিন বিষয় সমূহের সহজ, সরল উপস্থাপনার জন্য অত্যধিক উপকারী গ্রন্থ। মিশর, সিরিয়া এবং আরব রাষ্ট্রে সমূহে *'ফাতাওয়া হিন্দিয়া'* গ্রন্থের ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। এটি বৃহৎ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত, যা *'হেদায়া'* র রীতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং অপ্রসিদ্ধ বর্ণনা সমূহ বাদ দিয়ে কেবল প্রসিদ্ধ বর্ণনা সমূহ গ্রহন করা হয়েছে। কিন্তু যেখানে প্রসিদ্ধ (যাহির রেওয়ায়েত) পাওয়া যায়নি সেখানে ফতওয়ার নির্দেশনা সূচক দিক উল্লেখ পূর্বক বর্ণনাকারীর উক্তির সাথে আসল বর্ণনা (ইবারত) হুবহু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের ফিকহ বিশারদগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এ গ্রন্থটি সংকলনের বিরাট দূর্বহ কর্মটি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব (রহ.) কর্তৃক তার রাজত্বের প্রারম্ভে শায়খ নিজাম উদ্দীন বুরহানপুরী (রহ.) এর উপর অর্পন করেন এবং এ কাজে তৎকালীন দুই লাখ রূপী ব্যয় করেন। সংকলক এ গ্রন্থে ভারতীয় উপমহাদেশের ২৪ জন শীর্ষ ওলামায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করেছেন যারা এ গ্রন্থ সংকলনে সরাসরি জড়িত ছিলেন। যাদের অন্যতম চারজন ওলামায়ে কেরাম হলেন, কাযী মুহাম্মদ হোসাইন জৌনপুরী মুহতাসিব, শায়খ আলী আকবার হোসাইনী, আসাদুল্লাহ খানী, শায়খ হামেদ বিন আবু হামেদ জৌনপুরী এবং মুফতী মুহাম্মদ আকরাম হানাফী লাহোরী এ চারজন সমন্বিতভাবে সংকলন কর্ম তত্ত্বাবধান ও তদারকি করেন। *'মুসাল্লামু সাবূত ফি উসূলিল ফিক্‌হ'*ও শ্রেণীর একটি দূর্লভ গ্রন্থ, যার রচয়িতা আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ্ বিহারী (রহ.)। ভারতীয় এবং ইসলামী দুনিয়ার জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র সমূহে এটি ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম

হয়েছে। শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম স্বীয় যুগে এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও টীকা গ্রন্থ রচনা করেছেন। *'আস সাকাফাতুল ইসলামিয়াহ্'* গ্রন্থের লিখক এ ধরনের দশটি গ্রন্থের বিবরণ দিয়েছেন। জ্ঞান ও শাস্ত্রের জটিল এবং স্পর্শকাতর বিষয় সমূহের উপর রচিত হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর (খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত ভারতীয় আলিম মাওলানা মুহাম্মদ আ'লা থানভী (রহ.) রচিত গ্রন্থ *'কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন'* একটি উপকারী ও গ্রহনযোগ্য রচনাকর্ম। আরব জাহানের সকল পন্ডিতবর্গ এ গ্রন্থের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। কারণ এটি জ্ঞানের পরিভাষা সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান তূল্য, যা গবেষকদের হাজারো গ্রন্থ আর অসংখ্য পৃষ্ঠা হাতড়ানোর পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইতঃপূর্বে এবিষয়ে যথেষ্ট চাহিদা সত্ত্বেও এ ধরনের কোন ভাল গ্রন্থ ছিলনা এবং গবেষকদের জন্য এটি আজো অনবদ্য ভরসাস্থল।

এ বিষয়ের উপর অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন মাওলানা আবদুন্নবী আহমদনগরী যা *'জামিউল উলূম'* নামে পরিচিত। এটি *দস্তুরুল ওলামা* নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পুরো গ্রন্থটি চারখন্ডে বিভক্ত। আলোচ্য গ্রন্থকারও দ্বাদশ শতাব্দীর সুপরিচিত আলিম।

এ বিষয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহান রচনাকর্ম হিসেবে রাজকীয় শীর্ষস্থান দখল করে আছে হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ দেহলভীর (মৃত্যু ঃ ১১৭৬ হি.) *'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্'* যাতে ইসলামী শরীয়তের দর্শন শাস্ত্র এবং ইসলামী বিধি-বিধান সমূহের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। এটি এ বিষয়ে স্বকীয় বৈশিষ্টে সমুজ্জ্বল একমাত্র গ্রন্থ। আরবী ভাষা স্বীয় বহুল ব্যাপকতা সত্ত্বেও এর বিকল্প দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। দার্শনিক ও পর্যবেক্ষক মহল এ গ্রন্থের সপ্রশংস ও অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। মিশরে এ গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে।

এখানে একথা বলে রাখা জরুরী যে, আরবী ভাষায় পারঙ্গমতা, বলিষ্ঠ উপস্থাপনা এবং সাবলীল বাকরীতির উপরও এটি এক সফল ও অনবদ্য

গ্রন্থ। লেখকের সমকালীন যুগে কৃত্রিমতাপূর্ণ ছন্দোবদ্ধ, কাব্যিক রীতির দস্তুর মত প্রতিযোগিতা ছিল কিন্তু গ্রন্থকারের আলোচ্য গ্রন্থটি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অথচ তখন পরবর্তী যুগের খুব কম লিখকই এই অসার অনুকরণ রীতি থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে অনারবদের কৃত্রিম প্রিয়তা, আরবী ভাষার দৈন্যদশার যুগে, অকৃত্রিম গদ্য রচনা সাবলীল, পরিশীলিত ও মর্যাদাপূর্ণ গবেষণাধর্মী লিখন পদ্ধতি বিষয়ক 'মুকাদ্দামা-এ- ইব্‌ন খালদূন' এর পরই শীর্ষতম গ্রন্থ।

আল্লামা সাইয়েদ মুরতজা বিলগ্রামী (১২০৫ হিঃ) যিনি যাবিদী নামে সমধিক পরিচিত তাঁর রচিত *'তাজুল ওরুস ফি শারহিল কামূস'* এ বিষয়ের উপর ভূবনখ্যাত গ্রন্থ যা পরিচিতি ও প্রশংসার উর্দ্ধে। সুবৃহৎ কলেবর, ১০ খন্ডে বিভক্ত ঝকঝকে টাইপে মূদ্রিত প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি আরবী অভিধান শাস্ত্রের দস্তুর মত গ্রন্থাগার তূল্য। এক সময়তো আরবী ভাষায় ভারতীয় কোন লিখকের কলম ধরাটাই দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল। অথচ ঠিক সেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে অভিধান শাস্ত্রের পুরোধা আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদীর[১] নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য অভিধান গ্রন্থ *'আল কামূসুল মুহিত'* এর ব্যাখ্যা গ্রন্থের বর্ধিতরূপে সংযোজন, পরিমার্জন ও পূর্ণাঙ্গতা দানে আল্লামা সাইয়েদ আলী মুরতজা বিলগ্রামী জ্ঞানের গভীর ব্যুৎপত্তি, বিদগ্ধ পান্ডিত্য আর তুলনাহীন ভাষাজ্ঞানের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। লিখকের জীবদ্দশাই এ গ্রন্থ এত বেশী প্রসিদ্ধি ও বৈশ্বিক খ্যাতি লাভ করেছে যে, তুর্কী সূলতান এ গ্রন্থের একটি অনুলিপির জন্য আবেদন করেন। এছাড়াও দারপুরের শাসক ও মরক্কোর বাদশাহও এ গ্রন্থের একটি করে কপি সোৎসাহে সংগ্রহ করেন। মিশরের খ্যাতিমান সেনাপ্রধান ও শিক্ষানুরাগী মুহাম্মদ বেগ আবুয যাহাব আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিহিত অঞ্চলে তাঁর নির্মিত মসজিদের গ্রন্থাগারের জন্য এক হাজার রিয়াল ব্যয়ে এর একটি কপি সংগ্রহ করেন।

---

[১] প্রধান বিচারপতি মাজদুদ্দীন সিদ্দী ফিরোজাবাদী সিরাজ জেলার অধিবাসী ছিলেন, তিনি ৭২৯ হিজরী সনে ইরানে জন্ম গ্রহন করেন এবং ৮০৭ হিজরীতে ইয়েমেনে ইন্তেকাল করেন।

বহু গ্রন্থ প্রণেতা কতিপয় ভারতীয় লেখক ঃ

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতেও ভারত এমন কতিপয় ক্ষুরধার লিখনীর অধিকারী ও প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থ রচয়িতা জন্ম দিয়েছে যারা লেখার জগতে ও গ্রন্থ সংখ্যায় মাধ্যমে সারা দুনিয়ার সাথে বাজি রেখেছে। তাঁদের প্রত্যেকেই দস্তুরমত এক একটি স্বতন্ত্র একাডেমী ও ব্যস্ততম শিক্ষা সংস্থা তূল্য। ভূপালের নবাব সিদ্দিক হাসান খান (মৃত্যু ঃ ১৩০৭ হি.) এর গ্রন্থ সংখ্যা ২২২। যার মধ্যে ৫৬টি আরবী ভাষায় রচিত যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ উপকারী ও তথ্যপূর্ণ। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর কয়েকটি হল ঃ *'ফতহুল বায়ান ফি তাফসীরিল কুরআন'* (১০ খন্ড), *'আবজাদুল উলূম'* , *'আত্তাজুল মুকাল্লাল'*, *'আল বুলাগাহ্ ফি উসূলিল লুগাহ্'* ও *'আল আলামুল খাফফাক মিন ইলমিল ইশতিকাক'*। পরবর্তী যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গৌরব মাওলানা আবদুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লী (রহ.) (মৃত্য ঃ ১৩০৪ হি.) রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১১০টি। যার মধ্যে ৮৬টি আরবী ভাষায় রচিত। তন্মধ্যে *'আসসিআবাহ্ ফি শরহি শরহিল বেকায়া'* , *'মিসবাহুদ্ দুজা'* এবং *'যফরুল আমানী'* গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম। হানাফী ওলামাদের জীবন ও কর্ম বিষয়ক তাঁর রচিত গ্রন্থ *'আল ফাউয়াইদুল বাহিয়্যাহ্'* সর্বাধিক সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং হানাফী মাযহাবের ওলামাদের জীবনী সম্পর্কে সর্বাধিক তথ্য-উপাত্ত এ গ্রন্থ থেকেই সংগ্রহ করা হয়।

হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) রচিত গ্রন্থ সংখ্যা (৯১০) নয়শ'দশটি এর মধ্যে ১৩টি আরবী ভাষায় রচিত। অধিক সংখ্যক গ্রন্থ রচনা ও অগ্রসর লেখকের তালিকায় শীর্ষে অবস্থানকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। মাওলানা বাকির বিন মুরতজা মাদ্রাজী (মৃত্যু ঃ ১২১০ হিজরী) এবং মুফতী মুহাম্মদ আব্বাসী লক্ষ্ণৌভী (রহ.) (মৃত্যু ঃ ১৩০৩ হি.) আরবী ও ফার্সিতে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থা পাঠক মহল ও শিক্ষিত সমাজের জন্য তাঁদের মেধা ও প্রতিভার স্মারক রূপে রেখে গেছেন।

ইসলামী জগতের ভুবন খ্যাত লেখকদের জীবন সংক্রান্ত গ্রন্থরাজির সর্ববৃহৎ আকর ঃ

মাওলানা মাহমূদুল হাসান টুঙ্কী (মৃত্যু ঃ ১৩৬৬ হি.) ইসলামী জগতের খ্যাতিমান গ্রন্থাকারদের জীবন ও কর্ম বিষয়ক *'মু'জামুল মুসান্‌নিফীন'* নামক এক অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ গ্রন্থ রচনা করেন। বিজ্ঞ মহলে এটি স্বতন্ত্র বিশ্বকোষের মর্যাদা সম্পন্ন এক আকরতূল্য। ৬০ খন্ডে বিন্যস্ত ২০ হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থে ৪০ হাজার গ্রন্থকারের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থটির বিশালত্ব ও ব্যাপকতা থেকে এধারণা লাভ করা যায় যে, লেখক এতে দু'হাজার এরকম গ্রন্থকারের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন যাদের নাম 'আহমদ'। এ গ্রন্থে দেড়হাজার গ্রন্থের সার-নির্যাস রয়েছে। প্রাথমিক ইসলামী যুগের গ্রন্থ থেকে শুরু করে ১৩৫০ হিজরী পর্যন্ত সে সমস্ত ব্যক্তিবর্গের আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে যাদের অন্তত একটি গ্রন্থ হলেও প্রকাশিত হয়েছে। এই বিশাল গ্রন্থের মাত্র ৪টি খন্ড হায়দারাবাদ সরকারের অর্থায়নে বৈরুত থেকে মুদ্রিত হয়, বাকী অংশের ব্যাপারে অনুসন্ধানে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি যে, তা কোথায় আছে।

সাম্প্রতিক কালের বিদগ্ধ লেখক ও প্রাজ্ঞ গ্রন্থকারের তালিকায় মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভীর (রহ.) নাম সর্বশীর্ষে স্থান পাওয়ার যোগ্য। যিনি সীরাতে নববী (সা.), ইসলামী আইনশাস্ত্র, ইসলামের ইতিহাস এবং সাহিত্যের উপর অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ রচনায় রীতিমত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সাইয়েদ সুলাইমান নদভীর (রহ.) রচিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। ভারতের মর্যাদাশীল সাময়িকী মাসিক *'মা'আরিফ'* এ উঁচুমাপের প্রবন্ধ-নিবন্ধ, শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক বিশ্লেষণধর্মী লেখা তো এ হিসেবের বাইরে। এ প্রবন্ধ সমগ্রের পৃষ্ঠা হিসেব করলেও হাজার ছাড়িয়ে যাবে বললে অত্যুক্তি হবেনা। এসব মূল্যবান শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণা কর্মের বিবেচনায় মাওলানা সুলাইমান নদভী (রহ.) নিঃসন্দেহে প্রাচ্যের এক বহুমাত্রিক প্রতিভাধর শক্তিমান লেখক, বিদগ্ধ গ্রন্থকার ও অত্যন্ত উঁচু মাপের বিশ্লেষক,প্রাবন্ধিক ও গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী গবেষক। ব্যাপক গবেষণা, অধিক গ্রন্থরচনা এবং শাণিত লিখনী বিচারে মাওলানা মানাযির

আহসান গিলানী (রহ.) (মৃত্যু ঃ ১৩৭৫ হি.) এর নাম উল্লেখ না করার সুযোগ নেই। *"আন-নাবিউল খাতিম'* , *তাদভীন্-এ-হাদীস' ইসলামী মা'আশিয়াত'* এবং *'মুসলমানোকা নেজামে তা'লীম ওয়াতারবিয়াত'* শীর্ষক গ্রন্থগলো আলোচ্য লেখকের গুরুত্বপূর্ণ রচনাকর্ম। প্রকৃত পক্ষে লেখক তাঁর রচিত বলিষ্ঠ ও গতিশীল লেখনী দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার বিনির্মাণ করে গেছেন।

হাদীস শাস্ত্রে অবদান ঃ

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও বিকাশে ভারতীয় উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরামের নিষ্ঠাপূর্ণ, গভীর ব্যুৎপত্তি সমৃদ্ধ অবদান সর্বত্র প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ হাদীস শাস্ত্রের উপর সর্বোতমূখী অবদান, যথা- পাঠদান, মূল পাঠের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁদের অবদান সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। পরবর্তী যুগে ইলমে হাদীসের একচ্ছত্র রাজত্ব তাঁদের হাতে চলে আসে। *'আল-মানার'* পত্রিকার সম্পাদক আল্লামা সৈয়দ রেজা মিশরী *'মিফতাহু কুনুযিস্ সুন্নাহ্'* গ্রন্থের ভূমিকায় ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের উক্ত অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে গিয়ে বলেন ঃ " যদি ভারতীয় ওলাময়ে কেরাম এ যুগে ইলমে হাদীসের দিকে গুরুত্ববহ দৃষ্টিপাত না করতেন তাহলে, এ শাস্ত্র প্রাচ্য থেকে বিদায় নিতো। কেননা, মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও হিজাজের অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে ইলমে হাদীস হিজরী ১০ শতাব্দী থেকেই বিদায় নিয়েছিল।" ভারতে বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় তথা মধ্যভারতে হাদীস চর্চা, প্রসার, ও সর্বব্যাপী গ্রহনযোগ্যতার ভরসাস্থল হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস-এ-দেহলভী (রহ.) (৯৫১-১০৫২ হি.) এ অসাধারণ মেধা ও প্রতিভাধর মনীষী অর্ধশতাব্দী ধরে হাদীস গ্রন্থের উঁচু মানের ব্যাখ্যা, প্রাসঙ্গিক সূত্র বিবরণী; অনূবাদ, অধ্যাপনাসহ নানাবিধ গৌরবোজ্জ্বল নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের মাধ্যমে হাদীস শাস্ত্রকে (এতদঞ্চলে এক সময় তা যথোপযুক্ত মর্যাদা ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলনা।) নবজীবন দান করেছেন। ক্রমশ: শিক্ষা, ও প্রকাশনা কেন্দ্র সমূহ এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিদানে উদ্যোগী হয়েছে নবোদ্দমে। তাঁর সন্তান ও শিষ্যরা হাদীস চর্চা ও বিকাশের মহান দায়িত্ব পালনে কার্যকর ও অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। পরিশেষে শাহ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিস-এ-দেহলভী (রহ.) ও তাঁর

বংশধররা এই পবিত্র বৃক্ষকে প্রত্যেকের দোরগোড়ায় সম্প্রসারিত করেছেন। সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় ওলামায়ে কেরাম হাদীস শাস্ত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন যা সর্বত্র সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। যথা মাওলানা আশরাফ আলী ডিয়ানভী (রহ.)[১] রচিত *'আউনুল মাবূদ ফি শরহি আবিদাউদ'* , মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) বিরচিত *'বযলুল মাজহুদ ফি শরফি সুনান-ই-আবি দাউদ'* , মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী বিরচিত *'তুহফাতুল আহওয়াযী ফি শরহি সুনান আত-তিরমিযী'* মাওলানা শব্বির আহমদ উসমানী বিরচিত *'ফাতহুল মুলহিম ফি শরহি সহীহিল মুসলিম'* , শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্দলভী (রহ.) লিখিত *'আউজাযুল মাসালিক ইলা শরহি মুআত্তা ইমাম মালিক (রহ.)'*, এ ছাড়াও মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) এর সহীহুল বুখারীর টীকা গ্রন্থ *'ফয়জুল বারী'* বর্তমানে হাদীস শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিয়োজিত ওলামায়ে কেরাম ও হাদীসের ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত উপকারী অমূল্য আকর। মাওলানা জহীর আহসান শওক্ব নিমভী[২] রচিত গ্রন্থ *'আসারুস সুনান'* মুহাদ্দিস সুলভ দৃষ্টিভঙ্গির চুলচেরা বিশ্লেষণ, হানাফী মাযহাব এর সপক্ষে একটি একটি উঁচু মাপের রচনাকর্ম এবং ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রন্থের তালিকায় একটি মর্যাদাশীল গ্রন্থ ও নতুন সংযোজন। ভাগ্যের পরিহাস! লেখক এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করার সুযোগ পাননি। অকালেই তাঁকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হলো। যদি এটির সমাপ্তি টানা সম্ভব হতো তাহলে হানাফী মাযহাবের যুক্তি-বিশ্লেষণ ও মুহাদ্দিস সুলভ বর্ণনারীতির ক্ষেত্রে এক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ হিসেবে তা আত্মপ্রকাশ করতো।

---

[১] এ গ্রন্থ মাওলানা সৈয়দ নাযির হোসাইন মুহাদ্দিস-এ- দেহলভীর (রহ.) দিকনির্দেশনায় তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ শিষ্য বিহারের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং বিজ্ঞ আলিম শামসুল হক ডিয়ানভী কর্তৃক প্রণীত যা প্রথমে তিনি 'গায়াতুল মাকসূদ' নামে 'সুনান-এ- তিরমিযী' এর বৃহৎ ব্যাখ্যা গ্রন্থরূপে লিখা শুরু করেছিলেন, যা অসমাপ্ত ছিল এবং এর কেবল ১ম খন্ড প্রকাশিত হয় পরে তা এক প্রিয় শিষ্য মাওলানা আশরাফ আলীকে দিয়ে এটি লিখিয়েছেন।

[২] মাওলানা জহির আহসান শওক্ব নিমভী বিহারী অধুনা যুগের গৌরব মাওলানা আবদুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লীর মর্যাদাবান কৃতিছাত্র। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলতেন, "৩শ' বছরে ভারতীয় উপমহাদেশের এ ধরনের মুহাদ্দিস জন্ম নেয়নি।"

ভারতীয় ওলামায়ে কেরামদের কতিপয় স্বাতন্ত্রিক রচনাবলী ঃ

সমগ্র ইসলামী দুনিয়ার বিদ্বান ও বিশ্লেষক মহল ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের কতিপয় গ্রন্থকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বোত্তম রচনাকর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তন্মধ্যে তাফসীর বিষয়ে কাযী সানাউল্লাহ্ পাণিপথির (মৃত্যু ঃ ১২২৫ হি.) *'তাফসীর-এ মাযহারী'*। খ্রিস্টবাদের অসারতা ও তাওরীত ইঞ্জিলের বিশ্লেষণ বিষয়ক মাওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানভী (মৃত্যু ঃ ৩০৯ হি.) এর রচনাবলী *'ইজহারুল হক'*, *ইযালাতুল আওহাম'* এবং *ইযালাতুশ শুকূক'* সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত রচনা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তুরস্ক, মিশর ও সিরিয়ার উলামাবৃন্দ সংশ্লিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক তার্কিকদের উপর্যুক্ত বিষয়ের জন্য উল্লিখিত গ্রন্থ্ অধ্যয়নের এবং উক্ত দেশ মূহের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সমূহ এ সব গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ প্রকাশ করে বস্তুতঃ এর ব্যাপক গুরুত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ভাষার অলঙ্করণ শাস্ত্রে আল্লামা মাহমূদ জৌনপুরী (রহ.) (১০৮২ হি.) রচিত *' আল ফারায়েদ'* মাওলানা হামীদ্দীন ফারাহী (রহ.) রচিত *'আল আমআন ফি আকসামিল কুরআন'*, *'জামরাতুল বালাগাহ্'* এবং পবিত্র কুরআন মজীদের বিভিন্ন সূরার ব্যাখ্যা-তাফসীর সমূহ লেখকের সুগভীর দৃষ্টি, আরবী ও অলঙ্করণ শাস্ত্রে বিজ্ঞজনোচিত পারদর্শিতা এবং সুক্ষ্ম বিশ্লেষকের পরিচয় মেলে।

বিচারপতি কিরামত হোসাইনের বিশিষ্ট গ্রন্থ্ *'ফিকহুল লিসান'* Fiqhul-Lisan (আরবী) এবং মাওলানা মুহাম্মদ সুলাইমান আশরাফ, প্রাক্তণ পরিচালক দ্বীনিয়াত বিভাগ আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, রচিত *'আল-মুবীন'* (উর্দূ) ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লেখকের সুক্ষ্ম দৃষ্টি, গভীর অনুসন্ধিৎসা, সাহিত্য ও কথাশিল্পে নিপুনতা ও উন্নত অভিরুচির পরিচয় মেলে। আলোচ্য গ্রন্থ দু'টি আরবী ভাষার অলঙ্করণ শাস্ত্রের প্রকরণ, বিন্যাস, সংক্রান্ত সুক্ষ্ণ বিষয়াদির এক অনবদ্য সংকলন।

আরবী ছাড়াও ইসলামিয়াত, সাহিত্য বিষয়ক ফার্সি এবং উর্দুতে ভারতীয় ওলামাদের বেশ কিছু দূর্লভ রচনা কতিপয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের অনন্য গ্রন্থ রুপে পাঠক প্রিয়তা পেয়েছে।

অন্য কোন দেশে এর তুলনা পাওয়া দুষ্কর। যেমন- ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিচিতি বিষয়ে মুজাদ্দিদে আল্‌ফে সানী হযরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দির (রহ.) রচনা সমগ্র- *মাকতুবাত*, মাখদূম শায়খ ইয়াহইয়া মুনিরী (রহ.) *'মাকতূবাত'-এ-সেরহিন্দি'*, খিলাফত বিষয়ে শাহ্‌ ওয়ালি উল্লাহ্‌ মুহাদ্দিস-এ-দেহলভী (রহ.) বিরচিত *'ইযালাতুল খফা'* তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক লেখকের অপর গ্রন্থ শিয়াবাদের অসারতা বিষয়ে শাহ আবদুর আযীয মুহাদ্দিস-এ- দেহলভী (রহ.) রচিত *'আল-ফাউযুল কাবির' 'তুহ্‌ফা-এ-ইসনা আশরিয়া'* তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি বিষয়ে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর *'সিরাতুল মুস্তাকীম'* , নেতৃত্ব এবং নেতা ও নবীর (সা.) ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারীদের গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য, দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ক এক অসাধারণ গ্রন্থ মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) লিখিত *'মানসব ওয়া ইমামত '* (ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদাপূর্ণ পদ)। হযরত মাওলানা কাসেম নানূতুভী (রহ.) রচিত *'হুজ্জাতুল ইসলাম'* এবং *'তাক্বরীর-এ দিলপযীর'* , মাওলানা আবদুশ শকূর ফারুকী লক্ষ্ণৌভী রচিত *'রদ্দে শীয়ত'* (শিয়াবাদের ভ্রান্তি) , সীরাতে নববী সম্পর্কে মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.) এর *'সীরাতুন্নবী (সা.)'* এবং *'খুতবাত-এ মাদ্রাজ'*, কাজী মুহাম্মদ সুলাইমান মনসূরপুরী রচিত *'সীরাতু রহমাতুল লিল আলামীন'*, মাওলানা মুনাযির আহসান গিলানী (রহ.) রচিত *'আন নাবিয়্যুল খাতিম'* এবং ফার্সি কাব্য চর্চা বিষয়ে মাওলানা শিবলীর *'শেরুল আজম'* অতুলনীয় রচনা কর্ম। উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহ আরবী, ফার্সি ও তুর্কি ভাষায় অনূদিত হয়ে দুনিয়া ব্যাপী বিদগ্ধ জনগোষ্ঠীর কাছে আদৃত হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.) রচিত পবিত্র কুরআনের ভাষ্য 'তাফসীর-ই-মাজেদী' (উর্দূ-ইংরেজী) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব তাফসীরে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও স্থান সমূহ সম্পর্কে নতুন তথ্য রয়েছে যার ইঙ্গিত রয়েছে পবিত্র কুরআনে। এছাড়াও এতে রয়েছে ইয়াহুদীবাদ ও খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে বিশ্লেষণ যা আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব, পুরাকীর্তি, খনন (Archaeology and Excavation) ও বাইবেলীয় সাহিত্যের তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করে রচিত। বিশদ আলোচনায় উল্লিখিত গ্রন্থ অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং একই সাথে

ইসলামী সাহিত্যের এক বিরাট শূন্যতা পূরণ হয়েছে এর মাধ্যমে। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের রচনা, গ্রন্থ সংখ্যা, কলেবর এবং বিষয় বৈচিত্র্য বিচারে যদিও অত্যধিক গুরুত্বের দাবী রাখেনা কিন্তু তিনি তাঁর যাদুকরী সাহিত্য রীতিতে (যার রূপকার-উদ্ভাবক তিনিই ছিলেন এবং সমাপ্তকারীও তিনি) উৎকৃষ্ট বর্ণনারীতি, চমৎকার ভাষাশৈলী আর উঁচু মানের বাচনভঙ্গির জন্য এবং জীবন স্মরণীয় সাহিত্য বিষয়ক রচনা কর্মের কারণে যা *'তাযকিরাহ'* ও *'তরজুমানুল কুরআন'* এর অংশ এবং উর্দূ সাহিত্যের জগতে উঁচু মাপের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত। তিনি সমসাময়িক কালের অত্যন্ত উঁচুমাপের লেখক ও ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী। তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থ *'তারজুমানুল কুরআন'* বহু এমন বিশ্লেষণ, তাফসীর ও কুরআনের বর্ণনা সমৃদ্ধ যা এ গ্রন্থকে এক ব্যতিক্রমধর্মী বিশিষ্টতা দান করেছে।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী যিনি মূলতঃ ভারতের অধিবাসী এবং এখানেই তাঁর লেখা-লেখির জীবনের হাতেখড়ি ও উত্তরণকাল শুরু হয়। তিনি এমন বেশ কিছু গ্রন্থ, পুস্তিকা ও গবেষনা কর্মের প্রণেতা যা গভীর বিশ্লেষণ, দলিল উপস্থাপনের বলিষ্ঠতা, বর্ণনা ও ভাষা শৈলীর কারুকার্য এবং প্রাঞ্জল সাবলীলতায় পশ্চিমা সংস্কৃতি, দর্শন, জীবনাচার বিশ্লেষণে অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী। চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও তাঁর যুক্তি নির্ভর রচনা সংকলন *'তানকীহাত'* *'তাফহীমাত'* *'পর্দা'* *'সূদ'* ইত্যাদি সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নমুনা।

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা ঃ

প্রাথমিক যুগ থেকেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও মজবুত ছিল। ফলে তাঁরা রচনা, লেখালেখি, শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন হিসেবে এ ভাষাকে বরাবরই সযত্নে লালন করেছেন ও সংরক্ষণ করেছেন। এখানে জন্ম নিয়েছেন প্রাঞ্জল, দ্ব্যর্থহীন, সাবলীল ও চিত্তাকর্ষক আরবী কবি, সাহিত্যিক ও কথাশিল্পীগণ। এর মধ্যে আবদুল মুক্তাদির কান্দেহলভী (মৃত্যু ঃ ৭৯১হি.), শায়খ আহমদ বিন মুহাম্মদ থানেশ্বরী (মৃত্যু ঃ ৮২০হি.), মাওলানা গোলাম আলী

আযাদ বিলগ্রামী 'সাব-এ-সাইয়ারা' (মৃত্যু ঃ ১২০০হি.) মুফতী সদরুদ্দীন দেহলভী (মৃত্যু ঃ ১২৭৫হি.), মাওলানা ফয়জুল হাসান সাহারানপুরী, (মৃত্যু ঃ ১৩০৪ হি.) এবং মাওলানা যুলফিকার আলী দেওবন্দী (মৃত্যু ঃ ১৩২২ হি.), মুফতি মুহাম্মদ আব্বাস লক্ষ্ণৌনভী (মৃত্যু ঃ ১৩০৬ হি.) এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরব সাহিত্যিক ও গবেষকগণ প্রফেসর মাওলানা আবদুল আযিয মেমন ও মাওলানা মুহাম্মদ সূরতীর আরবী ভাষায় বিস্ময়কর পান্ডিত্য, আরবী অভিধান ও ব্যাকরণে অগাধ গভীরতাকে মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আরবী ভাষার সবচে বিশদ ও প্রামাণ্য অভিধান *'লিসানুল আরব'* এর সম্পাদনা পরিষদে প্রফেসর আবদুল আযিয মেমনকে সদস্য রূপে অন্তর্ভূক্ত করে তাঁর যোগ্যতা দক্ষতা ও বৈদগ্ধের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ *'সিমতুল-লাআলী'* এবং রচিত গ্রন্থ *'আবুল আ'লা ওয়ামা ইলাহি'* থেকে তাঁর ব্যুৎপত্তি ও তীক্ষ্ণধী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতে আরবী সাংবাদিকতা ঃ

আজো ভারতীয় উমহাদেশের মুসলমানরা আরবী ভাষাকে পরম মমতায় বুকে জড়িয়ে আছেন। মাদ্রাসা সমূহে মৌলিক আরবী সাহিত্য ও শিক্ষামূলক কিতাবাদি পাঠ্য তালিকাভূক্ত। লেখা-লেখি ও গ্রন্থ রচনা উক্ত ভাষায় বিপুল ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগিয়ে চলছে। বিভিন্ন সময়ে আরবী পুস্তি কা ও সংবাদপত্র, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। যা থেকে ভারতীয় মুসলমানের আরবী ভাষার সন্তোষজনক অন্তরঙ্গতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা আরবী মাসিক ম্যাগাজিন *'আল-বায়ান'* লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হতো। মাওলানা ইমাদী এবং মাওলানা আবদুর রাজ্জাক মলীহাবাদী এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। সাপ্তাহিক *'আল-জামিয়া'* মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এর তত্ত্বাবধানে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। মাসিক *'আয যিয়া'* নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ এর মূখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হতো। এর উন্নত সাহিত্য মান, মুনশিয়ানা লেখা, শিকড় সন্ধানী বিশ্লেষণ ও মননশীলতার জন্য আরব বিশ্বের শিক্ষা ও সাহিত্যের পরিমন্ডলে বিশেষ কদর ও গ্রহনযোগ্যতা সুবিদিত। শীর্ষ ভাষাবিদ বিশ্লেষক মহল এর উৎকৃষ্ট ভাষাশৈলীর স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

মাওলানা মাসউদ আলম নদভী (রহ.) এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৫ ইংরেজী মুতাবিক ১৩৫৪ হিজরীতে লক্ষ্ণৌ থেকে হাকীম মুহাম্মদ আসকারী নদভী (রহ.) এর সম্পাদনায় মাওলানা আলী নক্বী মুজতাহিদী[১] এর পৃষ্টপোষকতায় মাসিক আরবী সাময়িকী *'আর রিদওয়ান'* প্রকাশিত হয়। এটি চার বছর পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে এবং এটি শিক্ষা ও সাহিত্যের মান বিচারে একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা। দ্বীনি মেজায তৈরী ও মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশে এ সাময়িকীর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। 'নদওয়াতুল উলামা'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে অদ্যাবধি প্রকাশিত মাসিক *'আল-বা'ছুল ইসলামী'* , নদওয়াতুল ওলামা' থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক *'আর রায়িদ'* উভয় সাময়িকী আরব বিশ্বে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার পরিসরে অত্যন্ত মর্যাদাশীল পত্রিকা হিসেবে বিবেচিত ও সমাদৃত। আরব বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকী এই পত্রিকা দু'টি থেকে বিভিন্ন তথ্য ও প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে। ইসলামী বিশ্বের নানা প্রান্ত হতে গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদদের বহু উচ্ছসিত প্রশংসা সূচক ও প্রেরণা মূলক চিঠিপত্র সম্পাদনা কার্যালয়ে পৌছে। এটা পত্রিকাদ্বয়ের শীর্ষ মহলে সন্তোষজনক গ্রহণযোগ্যতার দলীল। দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত *'আদ-দায়ী'* এর সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মানসম্মত রচনা পাঠক মহলকে মুগ্ধ করে। অনুরূপ হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক *'আস-সাহওয়াতুল ইসলামিয়া'* ,আল-জামিয়া সালফিয়া বেনারস থেকে প্রকাশিত *'সাওতুল উম্মাহ্'* নামক ম্যাগাজিন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ভারতীয় উপমহাদেশের বহু মাদ্রাসা ও ইসলামী দাওয়াতী কেন্দ্র সমূহ থেকে বিভিন্ন আরবী সাময়িকী নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

আধুনিক আরবী কলামিস্টবৃন্দ ঃ

এছাড়াও দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা একদল এমন সুদক্ষ আরবী সাহিত্যিক ও কলামিস্ট তৈরী করেছে, যাদের ব্যাপক খিদমত দেশের সীমানা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে। ইসলামী বিশ্বের সাহিত্য আন্দোলন ও বহুমাত্রিক গবেষণালব্ধ রচনা কর্মের পরিসংখ্যান তৈরী করতে চাইলে কোন উদার, দূরদর্শী ঐতিহাসিক এই নদভী লেখক

---

[১] যিনি পরে মুসলিম ইউনিভার্সিটির দ্বীনিয়াত (শিয়া) বিষয়ে শিক্ষকতা করেন।

মহলের নিবেদিত, পরিপক্কতায় সমৃদ্ধ সাহিত্য ও চমৎকার রচনাশৈলীকে উপেক্ষা করতে পারেন না। যেখানে একই সাথে সাহিত্যরস, দাওয়াতী চেতনা, ঈমানী সজীবতা আর শক্তির চমকপ্রদ সম্মিলন ও চিত্তাকর্ষনের সমন্বয় ঘটেছে। সাহিত্যের পরিমন্ডলে তাঁরা একটি স্বতন্ত্র রীতির প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের পরিপক্কতা, কৃষ্টি ও আধুনিক সাহিত্যের সুষমা ও সাবলীলতা যেখানে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। এই নদওয়াতুল ওলামাতে ইসলামী দাওয়াতী ও সাহিত্য কর্ম বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যেখানে আরব বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদগণ অংশ গ্রহণ করেন। এ সম্মেলন *'রাবেতা আল আদব আল-ইসলামী'* তথা আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থার বিশ্বব্যাপৃত ভিত্তি স্থাপনের বুনিয়াদী উপকরণ যোগানে বলিষ্ঠ ভুমিকা পালন করে। এ সংগঠনের একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয় রিয়াদে এবং অপরটি লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত। আরব বিশ্বের প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও লেখকবৃন্দ এ সংস্থার সদস্য হতে পারাকে গৌরবের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। সংস্থার সামগ্রিক কার্যক্রমে শেকড়সন্ধানী গবেষকগণ অত্যন্ত উৎসাহী ও তৎপর ভুমিকা পালনে নিবেদিত আছেন।

দশম পরিচ্ছেদ
ভারতীয় উপমহাদেশের সুযোগ্য ইসলামী ব্যক্তিবর্গ

অসাধারণ যোগ্য ও মেধাবী মানুষের আবির্ভাব ঃ

কোন জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এমন সব অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটে যারা জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ শাখায়, শিক্ষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে অসাধারণ কৃতিত্ব ও যোগ্যতার সাক্ষর রাখেন। এমন জাতির জীবন ও অস্তিত্ব একথারই প্রমাণ যে, পৃথিবীর বুকে টিকে থাকার যোগ্যতা তার আছে এবং সে জাতির জীবন প্রদীপের সলিতা এখনো শুকিয়ে যায়নি। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা অসাধারণ প্রতিভাধর, জ্ঞান-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থানীয়, প্রখর ধী শক্তি সম্পন্ন বিরলপ্রজ মেধাবী ব্যক্তিবর্গের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ।

তাতারী ফিৎনার কবলে ওলামা ও সুশীল সমাজ ঃ

হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকেই ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী ইসলামী সরকারের গোড়াপত্তন হয়, যার উদার পৃষ্টপোষকতায় পর্যাপ্ত সংখ্যক বিজ্ঞ ও ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ওলামা ও শিক্ষাবিদগণ এখানে জমায়েত হয়েছেন। ভয়ঙ্কর অত্যাচারী তাতারীরা ইসলামী প্রাচ্যে আগ্রাসন চালিয়ে পুরো ইসলামী দুনিয়াকে তচনচ করে দেয়। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, তাহযীব-তামাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র সমূহ পৈশাচিক উম্মত্ততায় তারা ধ্বংস করে দেয়। যে সব শহরে নারী পুরুষ মুঘল ও তাতারীদের হিংস্র আক্রমনের শিকার হয়েছিল, তাদের হিজরত ও দেশ ত্যাগের এক বিরামহীন হিড়িক পড়ে যায়। জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিরা তাতারীদের অত্যাচার ও বর্বরতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাতৃভূমি ছেড়ে নতুন আশ্রয় স্থলের আশায় ভিন্নদেশে পাড়ি জমাতে শুরু করে। এ সময় ভারতবর্ষে তুর্কী বংশোদ্ভূত দাস বংশের রাজত্ব ছিল এবং কেবল ভারতবর্ষই একমাত্র রাষ্ট্র ছিল যা তাতারীদের প্রত্যেকটি আক্রমনের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে তাদের আগ্রাসী আক্রমনকে বারংবার ব্যর্থ করে দেয়। একারণেই বিভিন্ন সময়ে ইরান ও তুর্কিস্থানের শীর্ষস্থানীয় বরেণ্য শিক্ষানুরাগী ও প্রতিভাবান সম্প্রদায় বিপুল সংখ্যায় মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে ভারতবর্ষে আশ্রয়

গ্রহণ করেন। বংশ পরম্পরায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালনে নিয়োজিত ছিলেন এমন অসংখ্য সম্ভ্রান্ত জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শামসুদ্দীন বলবন এবং আলাউদ্দীন খলজী প্রমুখের যুগে এসব সম্প্রদায় বিপুল সংখ্যায় এতদঞ্চলে আবাস স্থাপন করেন।এই হিজরত ও তার পটভূমির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসবিদ জিয়াউদ্দীন বারণী লিখেন ঃ

All these families of respected noblemen, accomplished scholars and exalted spiritual lesders left their homes and wended their way towards India as a reult of the invasion by the Mongols and by Chengis Khan. Princes of the blood, experienced generals, celebrated teachers, learned jurists and illustrias religious and spiritual masters were included among the migrants.

"চেঙ্গিজ খান তথা মোঙ্গলদের আক্রমনের ফলে মর্যাদা সম্পন অভিজাত ব্যক্তি, বিদগ্ধ পন্ডিত এবং উচ্চ মাকামের অধ্যাত্মিক সাধকগণ পৈত্রিক বাস্তু ভিটা ছেড়ে ভারতের পথে হিজরত করেন। এই হিজরতকারীদের মধ্যে উচ্চবংশীয় রাজপুত্র, অভিজ্ঞ সিপাহসালার, সুদক্ষ গুণীজন, বিচারপতি, ইসলামী আইন বিশারদ, ফকীহ, সম্মানিত মাশায়েখ ও উঁচু স্তরের আধ্যাত্মিক সাধক অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।" [১]

ভারতীয় বংশোদ্ভূত গুণীজন ঃ

উক্ত সম্প্রদায় সমূহ এবং তাঁদের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বখ্যাত মহান শিক্ষাবিদ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, সব্যসাচী বিদগ্ধ গবেষক এবং বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ জন্ম নিয়েছেন। এমন কতিপয় ব্যক্তিবর্গও সৃষ্টি হয়েছেন সমগ্র পৃথিবীতে যাদের জুড়ি মেলা ভার। এই ভারতীয় জনগোষ্ঠী থেকে এমন শাসক, মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ, ওলামা

---

[১] তারীখে ফিরোজশাহী, গিয়াস উদ্দীন বলবনের যুগ দ্রষ্টব্য।

ও লেখক সৃষ্টি হয়েছেন যাদের পরিচয়ে ইসলামী বিশ্ব গৌরবান্বিত এবং অন্য জাতি যার উদাহরণ উপস্থাপন করতে বরাবরই ব্যর্থ হয়েছে।

মর্যাদাবান মুসলিম শাসকবর্গ ঃ

শেরশাহ্ শুরীর বর্ণাঢ্য জীবনী, রাষ্ট্রের বিস্ময়কর উন্নতি সাধন, সুনিপুন প্রশাসনিক বিন্যাসে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ন্যায়-ইনসাফ এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অধ্যয়নের পর এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, খোদা প্রদত্ত প্রখর মেধার অধিকারী এ মহান ব্যক্তিটি মাত্র পাঁচ বছরের স্বল্প সময়ে রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। শেরশাহ্ শুরীর শাসনামল মাত্র পাঁচ বছর। এই অল্প সময়ে তিনি বিপুল কার্য সম্পাদন করেছেন বিস্ময়কর কৃতিত্বের সাথে। শেরশাহ্ সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর পর প্রথম মুসলিম যিনি আইন ও রাষ্ট্রীয় বিধানাবলীতে উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন ও ঢেলে সাজানোর কাজটিতে হাত দিয়েছেন। তাঁর পরবর্তী শাসকগণ তাঁর সম্পাদিত বিন্যাসকে ভিত্তি করে নানাবিধ সংস্কারমূলক কর্মসূচীকে সম্প্রসারিত করেছেন এবং পূর্ণতা দানের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনিই সশস্ত্র বাহিনীকে নতুন ভাবে একটি নিয়মের অধীনে বিন্যস্ত করেছেন। অর্থনৈতিক বিধান প্রণয়ন, মুদ্রানীতি চালু, ভূমি রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্যের শ্রেণীভেদে কর ও শুল্ক নির্ধারণ, দেশকে প্রদেশ, প্রদেশকে জিলা ও জিলাকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করণ কর্মসূচী সম্পন্ন করেছেন। আদালত ও বিচার ব্যবস্থার নতুন বিন্যাস ও সুব্যবস্থাপনায় সমৃদ্ধ করেছেন। তার স্বল্পকালীন শাসনামলেই বাংলাদেশের তৎকালীন রাজধানী সোনারগাঁ থেকে সিন্ধুর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথটি নির্মিত হয়। যার মোট দৈর্ঘ্য ৩০০০ মাইল (৪৮২০৭×৯ কি.মি.) এ মহাসড়কের প্রতি দুই কিলোমিটার পর পর একটি বড় সরাইখানা ছিল যেখানে মুসলমান ও হিন্দুদের জন্য পৃথক খাবারের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক সরাইখানাতে ডাকচৌকির (Post Box) ব্যবস্থা ছিল। এ পদ্ধতিতে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একদিনে সংবাদ পৌঁছার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ বৃক্ষরোপন করা হয় যাতে ক্লান্ত পথচারীরা ছায়ায় বিশ্রাম নিতে পারেন। অনুরূপ আগ্রা থেকে মন্ডু পর্যন্ত ৬০০ মাইল দীর্ঘ সড়কে পর্যাপ্ত সরাইখানা নির্মাণ করা হয়। সারিবদ্ধ

বৃক্ষরাজিতো ছিলই।[1] এসব বিস্ময়কর অবদান ও জনহিতকর কর্মকান্ডের জন্য জনসাধারণ তাঁকে যুগের এক কীর্তিমান ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি ও পৃথিবীর খ্যাতিমান মহান শাসকদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত না করে পারেনা। সম্রাট জালালুদ্দীন আকবর তাঁর ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দর্শন *'দ্বীনে ইলাহী'*র সাথে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের যথেষ্ট মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁর অন্তিম কালের অসংলগ্ন ও সংগতিহীন ভীমরতির জন্য একজন মুসলিম ঐতিহাসিকের হৃদয়ে যতই রক্তক্ষরণ হোক না কেন এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি স্বীয় দৃঢ়চিত্ততা, আইন প্রণয়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্টপোষকতা, প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ আদায়, রাজ্যের সম্প্রসারণ ও প্রশাসনিক ভিত মজবুত করণ এবং ভারতীয়দের মানসিকতা, আবেগ-অনুভূতি অনুধাবনে সক্ষম এক মহান শাসক ছিলেন। কোন ইতিহাসবিদের পক্ষে এ বাস্তবতা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগীর (মৃত্যু ঃ ১১১৮ হি.)-এর জীবনী, তাঁর জ্ঞান ও চরিত্রমাধুরী, মহান কীর্তিসমূহে ভরপুর ইতিহাস, অর্ধশতাব্দী ব্যাপী বিরামহীন প্রয়াস, তাঁর আমলে বড় বড় অভিযান, সংস্কার কর্মসূচী, তাঁর অনাড়ম্বর ও সাদাসিদে জীবন যাপন, তুলনাহীন ধৈর্য শক্তি, দৃঢ়তা, অবিচলতা, বার্ধক্যেও বিশাল সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধান ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব, সময়ানুবর্তিতা, তার স্পর্শকাতর মহাব্যস্ততার মাঝেও ইসলামী শরীয়তের ফরয-সুন্নাত সমূহের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দান, ইবাদত, অধ্যয়ন, জ্ঞান চর্চার নিবিড় ব্যস্ততা প্রত্যক্ষ করে যে কেউ নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবেন যে, পৃথিবীতে আওরঙ্গযেবের মতো শাসকের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তিনি এক বিস্ময়কর লৌহমানব ছিলেন। ভীতি, অস্থিরতা, হতাশা আর ইতস্ততা কি জিনিস তাঁর জানা ছিলনা। অত্যন্ত সতর্কতা ও পূর্ণদায়িত্বশীলতা সহাকারে যদি দুনিয়ার কীর্তিমান, যুগশ্রেষ্ঠ বিরলপ্রজ শাসকদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়, তবে তিনি সন্দেহাতীতভাবে, কোনরূপ সানুগ্রহ বিবেচনা ব্যতিরেকে সেখানে স্থান পাবার যোগ্য।

---

[1] নুযহাতুল খাওয়াতির ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৫৫-১৫২।

সুলতান মুযাফফর হালীম গুজরাটীও (মৃত্যু ঃ ৯৩২ হি.) এমনই একজন দরবেশ প্রকৃতির জ্ঞানী শাসক ছিলেন। তাঁর ঈমান, তাকওয়া, খোদাভীতি, ন্যায়-ইনসাফ, বীরত্ব, সাহসিকতা, উদারতা, আত্মবিশ্বাস, ধর্মীয় পৃষ্টপোষকতা ও জ্ঞান গভীরতার দৃষ্টান্ত সেসব লোকদের মাঝেও পাওয়া দুষ্কর যারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ও রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথ এড়িয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্যের মাঝেই সর্বদা ডুবে আছেন। আলোচ্য শাসকের নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থপরতার এই কাহিনী রাজা-বাদশাহদের বিজয়াভিযান ও সেনাপ্রতিপালনের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গুজরাটের এক ইতিহাসবিদ বলেন, "মালওয়াহ্ অধিপতিগণ দীর্ঘ একশতাব্দী গুজরাটের শাসকদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মালওয়াহের শাসক দ্বিতীয় মাহমূদ শাহের উদাসীনতা ও অব্যবস্থাপনার সুযোগে তার মন্ত্রী শ্রী মন্ডলী রায় ক্ষমতার বাগডোর নিজের হস্তগত করে নেন এবং মাহমূদ শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেন। ইসলামের যাবতীয় প্রতীক ও বিধানাবলী রহিত করে কুফরী প্রথার প্রবর্তন করেন। মুযাফফর শাহ্ হালীমের (রহ.) আত্মমর্যাদাবোধ উদ্বেল তরঙ্গে আন্দোলিত হল। তিনি একদল দূর্ধর্ষ সেনাবাহিনীসহ মালওয়াহ্ অভিমূখে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। বহরের পর বহর নিয়ে মন্ডু পৌছলেন এবং রাজ্যটি অবরোধ করলেন। শ্রী মন্ডলী রায় প্রমাদ গুনলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পক্ষে অবরোধকারী মুযাফফর শাহের সেনাবাহিনীর সাথে পেরে উঠা সম্ভব নয় ; তাই অগত্যা তিনি মোট অঙ্কের লোভ দেখিয়ে রানা সিংহকে তাঁর সাহায্যে এগয়ে আসতে প্রস্তাব দিলেন। তিনি তখনো সারেংপুর পৌছেননি মোজাফফর শাহ্ হালীম তাঁর বাহিনীর একটি পর্যাপ্ত অংশ অগ্রবর্তী দল হিসেবে আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে দলের মুকাবিলায় রানা সিংহের সামনে এগুনোর সাহস হয়নি। এদিকে মন্ডলী রায়ের চতুর্দিক থেকে আগত বাহিনী দূর্গের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়।

মোদ্দা কথা হলো, দূর্গের নিয়ন্ত্রণ হস্তগত করার পর মোজাফফর শাহ হালীম যখন দূর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন; তখন অমাত্যবর্গ মালওয়াহ্

অঞ্চলের প্রশাসকদের বিলাস সামগ্রী, ধন-সম্পদ, খনিজ ও ভূগর্ভস্থ রত্ন ভান্ডারের ব্যাপারে মোজাফফর শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, এই যুদ্ধে প্রায় দু'হাজার বীর সৈনিক শাহাদাত বরণ করেছেন। জান-মালের এত ক্ষতি স্বীকারের পর এই অঞ্চলে পূর্বের শাসককে পূনর্বহাল করা কিছুতেই উচিত হবেনা। যার অযোগ্যতা ও অব্যবস্থাপনার সুযোগে মন্ডলী রায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন। একথা শুনেই বাদশাহ পরিদর্শন স্থগিত রেখে তৎক্ষণাৎ দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসলেন মাহমূদ শাহকে লক্ষ্য করে তিনি নির্দেশনা দিলেন তার সফর সঙ্গী কাউকে যেন দূর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না দেয়া হয়। মাহমূদ বারংবার মিনতি ভরে এই আবেদন জানাচ্ছিলেন যে, বাদশাহ যেন কিছুদিন দূর্গাভ্যন্তরে বিশ্রাম নেন। কিন্তু মোজাফফর শাহ তা মঞ্জুর করেননি এবং নিজেই ব্যাপারটি পরিস্কার করে বলেন যে, আমি এই জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই পরিচালনা করেছিলাম। আমি আমার আমীর-উমরাহদের নিয়ে শংকিত ছিলাম যেন আমার মনে কোন কুমন্ত্রণার জন্ম না হয় কারণ আমার নিয়তের বিশুদ্ধতা ও নিষ্ঠা বরবাদ হয়ে যেতে পারে। আমি মাহমূদের উপর কোন করুনা করিনি বরং আমার উপর তাঁর এই করুনা রয়েছে যে, তাঁর কারণেই আমার এই সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে।[১]

জ্ঞান-গরিমায় তাঁর মর্যাদা, হাদীসে নববী এবং ইসলামী শিক্ষায় তাঁর নিবিড় ব্যস্ততা সম্পর্কে তাঁর নিজ ভাষায় আমরা সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি যা তিনি মৃত্যুশয্যায় নেয়ামতের বর্ণনা দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে ব্যক্ত করেছিলেন ঃ

"আমি আমার ওস্তাদ শেখ মাজদুদ্দীন (রাহ.) থেকে যত হাদীস বর্ণনা করেছি তাঁর বর্ণনাকারী সূত্র সম্পর্কে জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়, নির্ভরযোগ্যতা, শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় অবস্থা আমার জানা আছে। অনুরূপভাবে আল্লাহর রহমতে পবিত্র কুরআনের সমস্ত আয়াত আমার মুখস্ত আছে। তা ছাড়াও শরয়ী বিধান সম্পর্কিত আয়াত সমূহের তাফসীর, শানে নুযুল ও তাৎপর্য সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ফলে আমি নিজেকে এই

---

[১] 'ইয়াদে আইয়াম' গুজরাটের ইতিহাস কৃত মাওলানা সৈয়দ হাকীম আবদুল হাই (রাহ.) সাবেক শিক্ষা পরিচালক নদওয়াতুল ওলামা সূত্র ঃ মিরআতে সিকান্দারী।

সুসংবাদের অন্তর্ভূক্ত মনে করি। "আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে ধর্মীয় বিষয়ে ব্যুৎপত্তি দান করেন।"

কয়েক মাস আত্মশুদ্ধির জন্যে সূফী সাধকদের রীতি অনুকরণে যিকির-আযকারে সময় দিয়েছি যাতে বুযুর্গদের জীবনাচারের সাথে সাদৃশ্য লাভে ধন্য হতে পারি। কেননা হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি যেসব জনগোষ্ঠীর ও সম্প্রদায়ে সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে। আমার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের বরকতের যেন আমিও অংশীদার হতে পারি। আমি সম্প্রতি তাফসীর *'মাআলিমুত তানযীল'* অধ্যয়ন শুরু করেছি এখন তা শেষের দিকে কিন্তু আশা করছি বেহেশতে তা সমাপ্ত করব।" ঠিক মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর মুখে হযরত ইউসুফ (আ.)এর নিম্নোক্ত দোয়াটি উচ্চারিত হয় ঃ
"হে আমার প্রভূ! আপনি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছেন। স্বপ্নের তাবীল-ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তা! ইহলোক ও পরকালে আপনিই আমার সর্বোত্তম অভিভাবক। আমাকে আপনি মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দিন এবং সৎকর্ম পরায়নদের অন্তর্ভূক্ত করুন।" (সূরা ইউসুফ ঃ ১০১)

জাগ্রত বিবেক, জ্ঞানী মন্ত্রী, বিজ্ঞ প্রশাসক ও কবিগণ ঃ

শৌর্যবীর্য আর মর্যাদাশীল রাজা-বাদশাহ্গণের কাহিনীতো আপনারা শুনলেন। এবার আসুন! কতিপয় জাগ্রত বিবেকের অধিকারী জ্ঞানী মন্ত্রীবর্গ, প্রশাসক ও কবিদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ভারতের তোতা পাখি বলে খ্যাত আমির খসরুর (মৃত্যু ঃ ৬৫১-৭২৫ হি.) নাম এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর সর্বাধিক প্রতিভাবান লোকদের যত সংক্ষিপ্ত তালিকাই প্রণীত হোক না কেন আমীর খসরুর নাম তাতে না রেখে উপায় নেই। বহুবিধ জ্ঞান, শাস্ত্র, সাহিত্য, সংগীত বিদ্যার শিল্পী ও উদ্ভাবক, হরেক রকমের কাব্যরীতির আবিষ্কারক, সংগীতে পারদর্শী ও সুরছন্দের রূপকার, ফার্সী ও হিন্দী কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি আকাশচুম্বী। ভারতবর্ষের কবিকূল সম্রাট আমীর খসরু ভাষা, পরিভাষা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, প্রচন্ড কল্পনাশক্তি, কথার নিঁপুন গাঁথুনী, সরল অকৃত্রিমতা আর

প্রাঞ্জল মাধুর্যে দরদভরা যাদুময়ী কাব্যের জন্য পারস্যেও তিনি সমানভাবে আদৃত ও স্বীকৃত । ঈর্ষণীয় খ্যাতির অধিকারী এ কবি ও কথা সাহিত্যিকের প্রশংসা করেছেন খাজা হাফিজ শিরাজী এবং শেখ সা'দী পর্যন্ত। একই সাথে তিনি এক দরদী খোদাপ্রেমিক, উচ্চবংশীয় সূফী যার দরদভরা আর প্রেমসিক্ত কাব্যমালার ঝংকারে খানকাহ সমূহ আজো তন্ময় হয়। হিন্দি ভাষায় রচিত তার কবিতা হিন্দি কাব্য জগতের মূল্যবান সম্পদ ও উর্দূ সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

উযির ইমাম উদ্দীন গিলানী ঃ যিনি মাহমূদ গাওয়াঁ (মৃত্যু ঃ ৮৮৬ হি.) নামে সমধিক পরিচিত। সময়ের উঁচু মাপের পন্ডিত বিজ্ঞ ও শাণিত লেখনীর অধিকারী ছিলেন। তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে আরব, পারস্য, তুর্কিস্থান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ইবাদত, খোদাভীতি, পরিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব, শিক্ষানুরাগ, নিয়মানুবর্তিতা ও সুন্দর ব্যবস্থাপনায় তিনি অত্যন্ত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। সমকালীন বরেণ্য সাহিত্যিক ও লেখক সমাজের মধ্যে তিনি একটি পরিচিত নাম। ইরানের প্রখ্যাত কবি মরমী সাধক মাওলানা আবদুর রহমান জামী তাঁর সম্পর্কে বলেন, " বিত্তশালীদের তিনি গুরু, অভাবীদেরও অলংকার। তাঁর মধ্যে দারিদ্র্যের চিহ্ন বিদ্যমান বটে তবে তা ধনাঢ্যের চাদরে আবৃত।"

আবুল কাসেম আবদুল আযীয গুজরাটী ঃ যিনি আসিফ খাঁন উযিরে গুজরাটী উপাধিতে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ঃ ৯৬১ হি.) জ্ঞানী ও বহুমাত্রিক গুণে গুনান্বিত মন্ত্রী-উযিরদের মধ্যে তাঁর অবস্থান প্রথম কাতারে। আল্লামা হিজায ইবন্ হাজার আল-মাক্কী তাঁর জীবন ও কর্ম বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেন। এতে লেখক তাঁর খোদাভীতি, উন্নত চরিত্র ও উঁচু মর্যাদার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি লিখেন ঃ যখন আসিফ খান মক্কা মুয়ায্যামাতে এসে বসবাস শুরু করেন তখন পবিত্র মক্কা এক বিস্ময়কর আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। উলামা-ফকীহগণ তার সান্নিধ্য লাভকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করতেন এবং জ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয় ঘরে ঘরে।" আরব জাহানের কবিগণ আসিফ খান সম্পর্কে অনেক কাব্য রচনা করেন ও তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর স্মরণে এক শোকাবহপূর্ণ কাব্যমালা

রচনা করেন।[১] মুঘল সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ আবদুর রহীম বৈরামখান (১০০৫ হি.) ফার্সি, তুর্কী ও হিন্দি ভাষায় বড় মাপের কবি ও কথাশিল্পী ছিলেন। একাধারে অসি ও মসির অধিকারী বৈরাম খান সপ্তভাষার পন্ডিত ছিলেন। ভারতবর্ষের এক নিরপেক্ষ সত্যভাষী ও সতর্ক ইতিহাসবিদ আবদুর রহীম খান সম্পর্কে লিখেন ঃ "তার মেধা, প্রজ্ঞা, উদারতা, দূরদর্শিতা, সাহসিকতা ও বদান্যতার প্রশংসা বর্ণণা করে শেষ করা যাবেনা। সাহিত্য, কাব্যচর্চা, গভীর অধ্যয়ন, গবেষণা, বিশেষতঃ ইতিহাসের গ্রন্থাবলীর প্রতি তাঁর বিস্ময়কর অনুরাগ লক্ষ্য করার মত। জ্ঞানী গুণীদের সান্নিধ্যপ্রিয়তা ও দূর্জনের সংশ্রব পরিহারের ব্যাপারে তিনি কঠোর যত্নবান ছিলেন। অত্যন্ত সতর্ক; পবিত্র ও নির্মল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে এ সেনানায়ক সর্বদা উঁচু মাপের সাহসিকতা ও দৃঢ়চিত্ততার বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও বৈচিত্রপূর্ণ যোগ্যতায় সমৃদ্ধ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যুগযুগ ধরে ইতিহাস তাঁর মতো উদাহরণ উপস্থাপনে অক্ষম।[২] আবদুর রহীম বৈরাম খান হিন্দী কবিতার অঙ্গনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। ফার্সী কাব্যেও তাঁর দক্ষতা ঈর্ষণীয়। রাজনীতির কারণে তাঁর কাব্যচর্চার বিষয়টি ঢাকা পড়ে গেছে। এটাকে তিনি যদি খ্যাতির শীর্ষে আরোহনের মাধ্যম ও সিঁড়ি বানাতে চাইতেন তাঁর কদর কিছুতেই পারস্যের রাজ কবিদের তুলনায় কোন অংশে কম হতনা যাদের কাব্যলহরীর ঝংকার এখনো সর্বত্র অনুরণিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।[৩]

আবুল ফজল আর ফয়জীর আক্বিদা বিশ্বাস, লক্ষ্য ও কর্মকান্ড সম্পর্কে যথেষ্ট মতবিরোধ আর বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও তাদের দ্বারা ভারতবর্ষে প্রকৃত ইসলামের ক্ষতি সাধিত হওয়ার বাস্তবতা স্বীকার করার পরও তাঁরা যে, তাঁদের অসাধারণ প্রতিভা, স্বভাবজাত জ্ঞান অনুরাগ ও কাব্য সাহিত্যের

---

[১] নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪ খন্ড।

[২] নুযহাতুল খাওয়াতির ৫ খন্ড পৃ.২০৭।

[৩] ফার্সি কাব্যে তাঁর মান ও স্তর অনুধাবন করতে তার একটি গজল এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে যার পংক্তিগুলো নিম্নরূপ। "সাধ আর স্বপ্নের হিসাব রাখিনি যে তার সংখ্যা কত ? তবে এতটুকু জানি যে, আমার মনটি বড় স্বপ্ন বিলাসী।" এই গজলের আরেকটি পংক্তি লক্ষ্য করুন ঃ 'প্রেমিক মহলে প্রতিশ্রুতির কথা বৃথা , প্রেমিকের দৃষ্টি সহস্র আবিলতায় পুর্ণ।'

আকাশে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অদ্বিতীয় ছিলেন তা অস্বীকারের সুযোগ নেই।তাঁরা উপর্যুক্ত শ্রেষ্ঠত্যের বিবেচনায় ভারতবর্ষে নয় বরং সমগ্র পৃথিবীতে এক বিরল ব্যক্তিত্ব হিসেবে খ্যাত। ফয়জী ফার্সী কাব্যজগতে কবিগুরুর কাতারে স্থান পাওয়ার যোগ্য। আবুল ফযল রচিত *"আইন-এ-আকবরী'* এবং *'আকবার নামা'* তার অধ্যয়ন শক্তি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, (Power of observation) জ্ঞানের ব্যাপ্তি, সুক্ষ্মদর্শিতা, তীক্ষ্ণধী শক্তির এক রাজকীয় কীর্তি। প্রখ্যাত ফরাসী মনীষী (Carra-de-Vaux) 'আকবর নামা' সম্পর্কে লিখেন ঃ

'আকবর নামা' এক অসাধারণ রচনাকর্ম, যা জীবন, কল্পনা এবং জ্ঞানের সমন্বয়ে এক অনবদ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে মনে হয় যেন জীবনের প্রতিটি অধ্যায় গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং অতঃপর এই গ্রন্থের বিন্যাস করা হয়েছে। এ গ্রন্থের ধারাবাহিক সিঁড়ি মাড়াতে গিয়ে চোখ স্থির হয়ে পড়ে। এটি জ্ঞানের এমন এক দস্তাবেজ যার কারণে প্রাচ্য সভ্যতা অহঙ্কার করতে পারে। যেসব মেধা এই বিশাল গ্রন্থের মাধ্যমে দুনিয়ার সামনে স্বীয় পরিচিতি তুলে ধরেছেন তাঁরা প্রশাসনিক দক্ষতায় ছিলেন যুগ অগ্রবর্তী চিন্তা চেতনার অধিকারী। তাঁরা কেবল প্রশাসনিক বিদ্যা ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অগ্রসর প্রতিভাত হয় তা নয় বরং ধর্মীয় দর্শনে ও চিন্তায়ও অগ্রসর। এসব বিজ্ঞ চিন্তাবিদগণ বস্তুজগতকে অত্যন্ত গভীর থেকেই নিরীক্ষণ করেছেন। অতঃপর তা অন্তরে গ্রথিত করেন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে অভিজ্ঞতার মূখোমূখী হন। ব্যক্তিগত চিন্তাধারার সাথে অন্যান্য বাস্ত বতার যাচাই-মূল্যায়ন করেন। একদিকে তাঁদের সৌকর্যপূর্ণ বর্ণনা শৈলী ও ভাষার অলংকরণে থাকে সমৃদ্ধি, অন্যদিকে বর্ণিত উপজীব্যকে পরিসংখ্যান, সংখ্যা ও তথ্য দিয়ে প্রামাণ্য দলিলে বলিষ্ঠতা দান করার সযত্ন প্রয়াস।' [১]

ইসলামী বিশ্বের শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দীনতার যুগে ভারত বর্ষের ব্যতিক্রম ধর্মী অবস্থান ঃ

তাতারী ও মুঘলদের হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞের পর ইসলামী বিশ্বে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং চিন্তাগত দীনতা বিরাজ করে। ফলে গ্রন্থ রচনা ও লেখালেখির ময়দানে একধরণের স্থবিরতা নেমে আসে। উঁচু মাপের চিন্ত

---

[১] Carra de Vaux : Penseur de Islam, Paris,1921

াধারা, বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণায় এক ধরণের বিপর্যয় ও অবসাদ বাসা বাঁধে। হিজরী ৮ম শতাব্দীর পর এ দৈন্যদশা ও চিন্তাগত অবনতির অবয়ব সুস্পষ্ট রূপে আত্মপ্রকাশ করে। চিন্তায় বন্ধ্যাত্ব ও মেধার জড়তা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত ও সংক্রমিত হতে শুরু করে। ওই যুগে হাতে গোনা কতিপয় শীর্ষ ব্যক্তি বাদ দিলে সাধারণতঃ প্রচন্ড ধী-শক্তির অধিকারী (GENIUS) কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলনা বললে চলে, যাকে অনন্য সাধারণ প্রতিভা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই হাতেগোনা কয়েক জনের মধ্যে আল্লামা আবদুর রহমান ইব্‌ন খালদূন এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দুস্তান তথা ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবী থেকে এক প্রকার দূরত্বে থাকায় এই মানসিক অবক্ষয় দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়নি। তাতারীদের আগ্রাসন এবং ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াল ছোবল থেকে ভারতবর্ষ ভৌগলিক কারণেই অনেকটা নিরাপদ ছিল। এই জন্যই ইসলামী শিক্ষাবিদগণ সারা দুনিয়ার নানা প্রান্ত হতে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ভারতবর্ষের মাটিতে এসে বসতি স্থাপন করেন। যার সুবাদে বিশেষভাবে ভারতবর্ষে শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক কর্মকান্ডে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। লেখালেখি ও গবেষণার গতিও ছিল প্রবল। যুগে যুগে এখানে সৃষ্টি হয়েছে এমন সব শিক্ষাবিদ ও গুণীজন যাদেরকে ইসলামের শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকারদের মধ্যে গণ্য করা যায়।

অনুসন্ধিৎসু ও প্রগতিশীল চিন্তা ঃ

তাদের লেখায় সেকালের গতানুগতিকতার পরিবর্তে আধুনিকতা ও উঁচু মানের ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। মাখদূম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া মুনিরী (মৃত্যু ঃ ৭৭২ হি.) যিনি *"মাকতুবাত-ই-ছেহছদী"* তথা তৃতীয় শতাব্দীর রচনাবলী, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্' ও 'ইযালাতুল খফা' গ্রন্থের রচয়িতা শায়খুল ইসলাম শাহ ওয়ালি উল্লাহ্ দেহলভী, 'তাকমীলূল আযহান' ও 'আসরার-ই-মুহাব্বত' নামক গ্রন্থের প্রণেতা শাহ রফীউদ্দীন দেহলভী ,'আল-আবকাত' এর রচয়িতা শাহ ইসমাঈল শহীদ দেহলভী (রহ.)

প্রমুখের রচনা ও গ্রন্থে এমন নতুনত্বের ছাপ আছে যা সাধারণ অন্যান্য সমকালীন লেখকদের রচনায় অনুপস্থিত।

পরবর্তী কালের সংস্কার ও আধুনিক গবেষণা আন্দোলনের পাদপীঠ ঃ

মুসলিম প্রাধান্যের পতন যুগে নানা প্রকার ঐতিহাসিক ও খোদা প্রদত্ত উপায় উপকরণের কারণে (যা আমি আমার *'তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত'* গ্রন্থের ৩য় খন্ডে উল্লেখ করেছি।) ভারতবর্ষ দাওয়াত, তাবলীগ, সংস্কার ও আধুনিকতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এতদঞ্চলের দাওয়াতী ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রমের সূদুর প্রসারী প্রভাব ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে বিস্তৃত হয়েছে। এ যুগে এমন কতিপয় একনিষ্ঠ, দায়ী, সংস্কারধী ও অগ্রসর চিন্তার পতাকাবাহী জাতির শ্রেষ্ট সন্তান সৃষ্টি হয়েছে, যারা নিজেদের উন্নত দাওয়াতী প্রতিভা, প্রভাববিস্তারশীল আকর্ষণ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি এবং উদার, ব্যাপক গণমূখী কর্মকান্ডের কারণে দাওয়াতে দ্বীনের ইতিহাসের শ্রেষ্ট দৃষ্টান্ত ও উন্নতর মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।[১]

ভারতবর্ষে ধর্মীয় সংস্কারক ও ধর্ম প্রচারকগণ ঃ

এই তালিকায় সর্বাগ্রে ইমাম-ই-রব্বানী হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দীর (মৃত্যু ঃ ১০৩৪ হি.) নাম উল্লেখযোগ্য। সুক্ষদর্শী ও বিদগ্ধমহল তাঁকে মুজাদ্দিদে আলফে সানী তথা বিংশ শতাব্দীর সংস্কারের সম্মানিত উপাধি দিয়ে নিজেদের বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ দিয়েছেন। বস্তুতঃ মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) ভারতবর্ষের মুসলমানদের ধর্মীয় সম্পর্ককে নবায়ন করেছেন। মুহাম্মদী শরীয়তের বিকৃতি, অপব্যাখ্যার অচলায়তন ভেঙ্গে এক সর্বপ্লাবী সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে দ্বীনে মুহাম্মদী (সা.) নানা ভ্রান্ত বিশ্বাস বিশেষতঃ *'ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ'* এর আক্বিদা পোষণকারী, সীমালঙ্গণকারী কথিত সূফীদের কুসংস্কার থেকে রক্ষা করেছেন। এ ছাড়াও মুঘল সম্রাট আকবর প্রবর্তিত *দ্বীনে-ই-ইলাহী* নামক বিভিন্ন ধর্মের সংমিশ্রণে, একত্ববাদের সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদের এক উদ্ভট ও অবাস্তব সমন্বয়ের মাধ্যমে রূপায়িত সর্বগ্রাসী আগুন থেকে ইসলামকে

---

[১] দেখুন- 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত' ৪র্থ, ৫ম খন্ড; সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (১-২)

রক্ষার দূরদর্শিতা তাঁর মস্তিষ্ক থেকেই উৎসারিত। উপরন্তু দ্বীনের সাচ্চা মুজাহিদ আওরঙ্গজেব মুহাম্মদ আলমগীরও (রহ.) মুজাদ্দিদে আলফে সানীর (রহ.) দাওয়াত ও চিন্তার ফসল। আজো তাঁর তাসাউফ এর ধারা সিরিয়া, তুরস্ক, ইরান, ইরাক, কুর্দিস্তান, অবধি প্রবাহমান। আল্লামা খালিদ শাহজুরী কুর্দি (রহ.) (মৃত্যু ঃ ১২৪২ হি.) এর মাধ্যমে এ সিলসিলা ইতালি, আরব উপদ্বীপ, কুর্দিস্তান, সিরিয়া, তুরস্ক, প্রভৃতি অঞ্চলে যে অপ্রতিদ্বন্ধী গ্রহনযোগ্যতায় সমাদৃত হয়েছে তা অন্য কোন সিলসিলার ভাগ্যে জুটেনি।[১]

দ্বিতীয়ত মহান ব্যক্তিত্ব হলেন, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ যিনি সত্যিকার দ্বীন, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্, খিলাফতে রাশেদার আদলে ইসলামী হুকুমতের রূপরেখা প্রণয়ন এবং সত্যের পতাকা উড্ডীন রাখার জন্য জান মাল কুরবানী দিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর নিষ্ঠা এবং চেষ্টার কারণে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ঈমান-ইয়াকীন ও আল্লাহর ইবাদতের প্রতি এক প্রবল স্পৃহার হাওয়া বয়ে যায়। বরং এভাবে বলা যেতে পারে যে, এটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগের নতুন স্রোত যা তাঁর যুগে পুনঃ প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি ভারতবর্ষের মৃতপ্রায় মুসলমানদের মাঝে ঈমান-ইয়াকীনের প্রাণের সঞ্চারক ছিলেন। তাঁর অনুসারীদের ঈমানী শক্তি, সুদৃঢ় ইসলামী চরিত্রবল এবং উদ্বেল জিহাদী চেতনার তুলনা মেলেনা।[২]

প্রখ্যাত লিখক, গ্রন্থকার, শিক্ষাবিদ নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁন সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর শিষ্য সহচরদের সম্পর্কে লিখেন ঃ 'মোদ্দা কথা হল, তদানীন্ত বিশ্বে তাদের মতো বহুবিদ যোগ্যতা ও গুণসম্পন্ন মানুষের কথা অতীতে শোনা যায়নি, এ শ্রেণীটির যেসব অবদান জাতির উপর ছিলো তার দশমাংশও এ যুগের আলেমদের দ্বারা হয়ে উঠেনি।'[৩]

---

[১] শায়খ উসমান আস-সনদ, 'আসফাল্ মুয়ারিদ ফি তারজুমাতি সায়্যিদিনা খালিদ' ; মাওলানা খালিদ নকশবন্দী, ' সাল্লুল হিসাম';আমির ইবন্ ওমর আবেদীন (মৃত্যু ঃ ১২৫২), 'রদ্দুল মুখতার'

[২] দেখুন সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.), 'সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ; মাওলানা গোলাম রাসূল, 'সাইয়েদ আহমদ শহীদ'।

[৩] 'তিকছার' পৃ.১১০।

বর্তমান যুগে ভারতবর্ষ পুনরায় ইসলাম প্রচার ও সংস্কারের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়, যার নিষ্ঠাবান পথিকৃৎ দায়ী হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) (মৃত্যু ঃ ১৩৬৩ হি.)। সাম্প্রতিককালে আমি যেসব ইসলামী রাষ্ট্রে সফর করেছি কোথাও হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর মতো মজবুত ঈমানদার ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়নি। *'তায়াক্কুল আলাল্লাহ'* (আল্লাহর উপর অবিচল ভরসা) দাওয়াতে তাবলীগের জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ, নিবিড় ব্যস্ততা তাঁর এক অনুপম বৈশিষ্ট্য।[১] তাঁর প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামায়াত বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে দাওয়াতী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে নিরচ্ছিন্নভাবে।

মনীষা প্রসূতি ভারতবর্ষের ইসলামী বংশধারা ঃ

ভারত বর্ষের কতিপয় মনীষীদের উদাহরণ পেশ করা হল যারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও অনন্য সফলতার সাক্ষর রেখেছেন। *'নুযহাতুল খাওয়াতির'* নামক আট খন্ডে সমাপ্ত বিশাল গ্রন্থটি পাঁচ হাজার মহান ব্যক্তিত্বের আলোচনায় সমৃদ্ধ। এক নজরে এর মূল্যায়ন করলে এই জনপদ থেকে সৃষ্ট বহুমাত্রিক প্রতিভাধর মহান ব্যক্তিত্বদের এক আলোকোজ্জ্বল ধারণা লাভ করা যায়।

মুসলমানরা ভারত বর্ষে নিষ্ঠার সাথে ইসলামের পবিত্র বৃক্ষের চারা রোপন করেছেন। আর পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী মুজাহিদীনগণ কলিজার পবিত্র খুন ঢেলে যুগে যুগে এই জমিকে উর্বর করেছেন। বিশ্ব স্রষ্টার করুনায় যা আজো বরাবরই ফসল উৎপাদন করে যাচ্ছে। এখানে যুগে যুগে প্রবাদপ্রতীম, যুগ শ্রেষ্ঠ এমন কীর্তিমান পুরুষগণ জন্ম নিয়েছেন, যারা অন্যান্য মনীষীদের তুলনায় অত্যাশ্চর্য ধীশক্তি, বিরল প্রতিভা এবং আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতায় বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। ঔপনিবেশিক বৃটিশ বেনিয়া গোষ্ঠীর শাসনামলে যখন মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনা বিনাশী সুপরিকল্পিত নীল নকশার বাস্তবায়ন চলছিল [২] তখনো মুসলমানদের মাঝে শীর্ষস্থানীয় আইনবিদ, সাহিত্যিক, সব্যসাচী লেখক, অংক শাস্ত্র বিদ, দার্শনিক রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক এবং রসায়ন শাস্ত্রে

---

[১] দেখুন- সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ঃ 'মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ও তাঁর দ্বীনি দাওয়াত'

[২] দেখুন- W.W Hunter, Our Indian Mussalmans.

এমনসব বিশেষজ্ঞ সর্বোপরি ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী সাহিত্যিক, ও বিশ্লেষক সৃষ্টি হয়েছিলেন যাদের ইংরেজী সাহিত্য, পান্ডিত্য, বাগ্মীতা এবং অসাধারণ ক্ষুরধার লেখনী বিস্ময়কর প্রতিভার স্বীকৃতি ইংরেজরা পর্যন্ত না দিয়ে পারেননি। এমন কীর্তিমান পুরুষ আইন প্রণেতা, আইনবিদ, বাগ্মী, উঁচুমানের সুবক্তা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জন্ম নিয়েছেন যারা গোটা বিশ্বের বড় মাপের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রথম কাতারে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে এমন সব বিস্ময়কর কবি, চিন্তাবিদ, প্রাজ্ঞ বিশ্লেষক যাদের পয়গাম, কাব্য খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা ইরান, আফগানিস্তান এবং তুরস্ক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাঁদের রচনা, বক্তব্য, মুসলিম বিশ্বের একাধিক ভাষায় অনূদিত ও ভাষান্তরিত হয়েছে।[১] আরবী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও আজো এজাতি বুকে আঁকড়ে আছে নিবিড় মমতায় রবং তাতে সৃজনশীল পরিবর্ধন ও নবসংযোজন অব্যাহত রয়েছে। আমাদের সামনে ঘটনা প্রবাহ এবং বাস্তবতার যে প্রত্যক্ষ চিত্র রয়েছে তা থেকে বরাবরই এ আশা পোষণ যৌক্তিক যে, অদূর ভবিষ্যতে আরবী সাহিত্যের এক নতুন চিন্তাধারা এবং নতুন আঙ্গিকে সাহিত্য রীতির উদ্ভব ঘটবে যা সাহিত্য, অধ্যাত্মিক চেতনা, ঈমান, দাওয়াত এবং সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু রূপে পরিগণিত হবে।

এসব জ্যোতির্ময় বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে বলা যায় ভারত বর্ষের মুসলমান জনগোষ্ঠী যারা আজ ইতিহাসের নাজুক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে হাজারো প্রতিকূলতার ভয়াল তরঙ্গাভিঘাতেও সমহিমায় স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। এ জন্য প্রবল ও বহুমূখী তৎপরতা যেমন আছে তেমনি আছে এ মাটির মহান মনীষীদের অমর ব্যক্তিত্বের যুগান্তকারী প্রভাবও।

---

[১] যথা- সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ঃ বিরচিত ' রাওয়াইউল ইকবাল' দ্রষ্টব্য, উর্দূ তরজমা, 'নুকুশে ইকবাল' ; ইংরেজী অনুবাদ- GLORY OF IQBAL

একাদশ পরিচ্ছেদ
ভারতীয় মুসলমানদের বর্তমান সমস্যা ও সংকট

সংকট ও পরীক্ষা জাতি টিকে থাকার জন্য জরুরী

পৃথিবীর প্রতিটি জাতিকে সংকট ও পরীক্ষার যুগ অতিক্রম করতে হয়। পথের কষ্ট ও সময়ের পরীক্ষা যে কোন জাতির স্থায়িত্বের পরশ পাথর। এটা আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা যা সুপ্ত শক্তিতে চেতনার সঞ্চার করে, জাতীয় জীবনে জটিলতা ও সংকট উত্তরণে সহায়তা করে এবং অগ্রগতির পথে অনুপ্রাণিত করে। যে জাতি কখনো দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদের ঘুর্ণাবর্তে পড়েনি, সে জাতির ভেতরে পরিস্থিতি পরিবর্তনের যোগ্যতা যেমন জন্ম নেয়না তেমনি আত্মবিশ্বাসও জাগ্রত হয়না। ক্রমশ বিলাসিতা, আত্মবিস্মৃতি ও জড়তার শিকার হয়ে পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ভারতীয় মুসলমানরাও ইদানিংকালে পরীক্ষার এক দুর্গম পথ পাড়ি দিচ্ছেন। জাতীয় জীবনে তাঁরা বহুবিধ সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন। এসব সংকটের মধ্যে কিছু তাদের ভুলের ফসল কিছু অতীতের উত্তরাধিকার আর কিছু এমন সব দুর্ঘটনায় সৃষ্ট যা কয়েক বছর আগে ভারতে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যাত্রা পথের এ সংকট ক্ষণস্থায়ী এবং দেখতে দেখতে পরীক্ষার মৌসুম চলে যাবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে উদ্ভুত পরিস্থিতি ঠান্ডা মাথায় সমাধানে চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা সত্যাশ্রয়ী, ভারসাম্যপূর্ণ, বাস্তববাদী ও দুঃসাহসী নেতৃত্বের জন্ম দিতে পারেন।

আমরা এখানে ভারতীয় মুসলমানদের কতিপয় বিশেষ সমস্যার উপর আলোকপাত করবো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ফ্যাসাদ যদিও আজ স্বাধীন ভারতের জন্য এক ট্রাজেডী তারপরেও আমরা মনে করি এ সংকট অস্থায়ী এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, সচেতন রাজনৈতিক ও আমাদের সুশীল সমাজ দায়িত্বানুভূতির পরিচয় দিলে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করতে বেশী লাগবেনা। আসল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে ঐসব সংকট ও সমস্যা

যা ছাই চাপা আগুনের মত ধীরে ধীরে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে নিশ্চিতভাবে।

দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতিবন্ধকতা ঃ

ইসলাম যে একটি মিশনারী ধর্ম -একথা কারও অজানা নয়। দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় ইসলাম বিস্তৃতি ও লাভ করেছে। নিঃস্বার্থ ধর্ম প্রচারক, আমানতদার ব্যবসায়ী ও সত্যনিষ্ঠ সুফী-দরবেশদের তাবলীগের বরকতে যত মানুষ ভারতে ইসলাম কবূল করে ধন্য হয়েছেন তাদের সংখ্যা ঐসব মুসলমানদের চাইতে বেশী যারা এখানে এসেছিলেন সরাসরি আরব, ইরান ও তুরস্কের মতো মুসলিম দেশ থেকে। ইসলামের নীরব ও নিঃস্বার্থ প্রচার ও ভারতীয় মুসলমানদের জন্য নতুন প্রাণ ও নতুন শোণিতধারা যুগিয়েছে নিয়মিত। একমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে এমন নতুন অতিথি এসেছেন যারা পরবর্তীতে নিজেদের সৃষ্টিশীল মেধা ও অসাধারণ যোগ্যতার বলে মুসলিম বিশ্বের নজীর বিহীন ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হন। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাদের দূরে অথবা কাছে কোথাও না কোথাও হিন্দু পরিবারের সাথে সম্পৃক্তা রয়েছে। নিকট অতীতে *'তুহফাতুল হিন্দ'* এর গ্রন্থকার মাওলানা ওবাইদুল্লাহ্ পাটিয়ালভী (রহ.), মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহ.), ড. স্যার মুহাম্মদ ইকবাল (রহ.), মাওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী (রহ.) ও শায়খুত তাফসীর মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর (রহ.) মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের নাম এ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। খুব কম মুসলমানই জানেন যে, এসব বুযুর্গবৃন্দ হিন্দু পরিবারের সাথে সম্পর্কিত। পরবর্তীতে তারা ইসলামের শ্বাশত আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ইসলাম কবূল করেন।

ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের এ ধারাবাহিকতা ভারতে মুসলিম শাসনের পতনযুগে এবং বৃটিশ শাসনের সমাপ্তি দিনগুলো পর্যন্ত সফলতার সাথে অব্যাহত ছিল। প্রতি ছর বিপুল সংখ্যক অমুসলিম স্বেচ্ছায় ও স্ব প্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এর কারণ হচ্ছে যুক্তি

নির্ভর শিক্ষা, তাওহীদবাদী চেতনা, সামাজিক ন্যায় বিচার ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শের ফলে ইসলাম অপরাপর ধর্মের উপর শ্রেষ্টত্ব বজায় রাখে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতা ও বর্ণপ্রথার আদৌ কোন স্থান নেই। পবিত্র কুরআন, সীরাতে রাসূল এবং ইসলামের শিক্ষা গণমানুষের অন্তর ও বিবেককে জয় করে নিয়েছে। পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি যদি এভাবে চলতে থাকতো তাহলে সম্ভবত শুধু ভারতীয় উপমহাদেশ নয় বরং পুরো এশিয়ায় ইসলাম বৃহত্তর ধর্মীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতো। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানদের রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হয়ে গেলো যা পরবর্তীতে দু'সম্প্রদায়ের অন্তরে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে দিলো। একে অপরের মাঝখানে সন্দেহ, ক্ষোভ ও অবিশ্বাসের দুর্লজ্ঘ্য প্রাচীর তৈরী হয়ে গেলো। যার ফলশ্রুতিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো। ভারত বর্ষের বিভক্তি সঠিক ছিল না ভুল ছিল ? অথবা সমস্যার কোন বিকল্প সমাধান ছিল কিনা অথবা এ সমাধান গ্রহণযোগ্য হতো কিনা এ প্রসঙ্গ নিয়ে এ মুহূর্তে আমি কোন আলোচনা করতে চাইনা। পুরে বিষয়টি ভারতবের্ষর ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য সংরক্ষিত রইল যারা পক্ষপাতহীনভাবে ঘটনার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাবেন। আমি কেবল এতটুকু বলতে চাই যে, তৎকালীণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক এমন এক বিরূপ পরিস্থিতির জন্ম দিল যার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে অমোচনীয় তিক্ততা বৃদ্ধি পেলো এবং একে অপরকে ঘৃণা ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। সম্পকের্র এ তিক্ততা প্রতিপক্ষের ধর্ম-আকীদার সাথে হোক অথবা সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে হোক অথবা চিন্তা-চেতনার সাথে হোক সেটা বড় কথা নয়। সুতরাং অসহিষ্ণুতা ও অনাস্থার এ অনুভূতি ভারতবর্ষে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের পথে বিরাট এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে দিল। ইসলামের ব্যাপারে ভারতবর্ষে একটি সাধারণ ধারণা জন্ম নিলো যে, ইসলাম এমন একটি দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম যা প্রতিপক্ষ হওয়ার উপযোগী অথবা এমন এক জাতির ধর্ম যারা অতীতে রাজনীতির টানাপোড়েন ও তিক্ত সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিলো। সে দুর্দিনের দুঃসহ স্মৃতি এখনো অন্তরে দগদগে ক্ষত হয়ে রক্ত ঝরায়।

অনেক সময় পাকিস্তানে এমন ঘটনাবলী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যা পড়লে অন্তর পুরনো ব্যথায় বিষিয়ে উঠে।

এটাই ভারতীয় মুসলমানদের অনেক বড় সমস্যা কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, দিন যত যাবে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক তত উন্নত হবে, আবেগের উপর বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রভাব যত দৃঢ়তর হবে ততই বিরাজমান সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসবে। হতাশার মেঘ কেটে যাবে এবং ইসলামের আবেদন ও জনপ্রিয়তা আবার ফিরে আসবে। তবে শর্ত হচ্ছে মুসলমানদেরকে বাস্তবোচিত পদক্ষেপ, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যেঁতে হবে এবং রাজনৈতিক সুবিধে ও ক্ষমতায় আরোহনের কোন চিন্তা না থাকা চাই। দুনিয়া আখেরাতের মুক্তিকে সামনে রেখে মুসলমানদেরকে ওয়াজ নসীহতের ও সর্বপ্লাবী ভালবাসার প্রেরণায় উজ্জীবিত হতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মুসলমানদেরকে দেশবাসীর সামনে উন্নত নৈতিক চরিত্র ও ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিপালনের বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে। হিন্দি ও ভারতের আঞ্চলিক ভাষায় হৃদয়গ্রাহী ও সাড়াজাগানো বর্ণনারীতিতে রাসূলের জীবন চরিত ও ইসলামী সাহিত্য তৈরী করে সমাজের সামনে পেশ করতে হবে। মুসলমানদেরকে আন্তরিকতা, বিপুল উদ্দীপনা ও দায়িত্বানুভূতির সাথে জাতীয় উন্নয়ন, দেশ পুনর্গঠন ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক কাজে অংশ নিতে হবে। এটা অত্যন্ত জরুরী।

অন্যায় ও পক্ষপাতদুষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা। এ সমস্যা মুসলমানদের জাতীয় জীবন ও তাদের ভবিষ্যতের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দ্বীনের তাবলীগের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাতে কেবল ইসলামের বিস্তৃতি ও অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে। এতে মুসলমানদের বিশেষ সংস্কৃতি, বিশেষ তাহযীব ও বিশেষ আকীদা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

গণতান্ত্রিক ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে প্রত্যেক ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশ্বাস, ধর্মমত ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের দৃষ্টিতে দেশের প্রতিটি নাগরিক ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে সমান অধিকার পাওয়ার দাবীদার। এ সংবিধান এমন একটি দেশের জন্য প্রণীত হয়েছে যেখানে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন সংস্কৃতির অনুসারী বসবাস করেন। এ দৃষ্টিকোণে উক্ত সংবিধানের ধারা উপধারা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। ভারতের জন্য এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত হওয়া দরকার ছিল যেখানে রাষ্ট্র ও প্রশাসন বিশেষ কোন ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা না করে সবধর্মকে সমান দৃষ্টিতে দেখবেন এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সব ধর্মের আদর্শের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। ভারতবর্ষের মতো বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির দেশে সব ধর্মের আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বশীল একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন হয়তো সম্ভব নয়। শিক্ষা ব্যবস্থা যদি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ হতো এটাই ভাল ছিল, যেখানে কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষে ওকালতি করা হবেনা। ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণের বিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির প্রশংসার দাবী রাখে কারণ তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ ব্যবস্থা বৃটিশ শাসিত ভারতে চালু ছিল। বাস্তবে রাষ্ট্রের পক্ষপাত মুক্ত ব্যবস্থায় কোন সম্প্রদায়ের আপত্তি ও অভিযোগ থাকতে পারেনা। মুসলমানগণও এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারে সংবিধানের ধারা উপধারা ও সরকারী ঘোষণা কেবল কাগজ কলমেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল।

পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাগণ এমন এক কারিকুলাম তৈরী করেন যা সংবিধানের মৌল চেতনার পরিপন্থী। তাঁরা ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আকীদা বিশ্বাস ও দেবদেবীর কাহিনী (Mythology) দ্বারা পাঠ্যক্রম ভর্তি করে দেন। পৌত্তলিক চিন্তাধারা ও বিশ্বাস কুরআনের উল্লেখযোগ্য শিক্ষা, তাওহীদ ও রাসুলুল্লাহর (সা.) আদর্শের পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক। পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায় এর প্রণেতাগণ ভারত বর্ষের মতো বহুধর্মের দেশকে ব্রাহ্মণের দেশ মনে করেছেন এবং ব্রাহ্মণ্যপ্রীতিকে

বিবেচনায় রেখেছেন। তারা দেবতা, অবতার, উৎসব, মেলা, মন্দির, তীর্থকেন্দ্র, উপনিষদীয় রীতি-পদ্ধতিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

অধ্যয়নের জন্য যেসব গ্রন্থ নির্ধারিত হয়েছে তাতে একটি বিশেষ ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে যাতে ছাত্র-ছাত্রীগণ নিজেদের অতীত ইতিহাসের সাথে সম্যক পরিচিতি লাভ করতে পারে। পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাগণ অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় ও পরিকল্পিতভাবে ইসলামী ব্যক্তিবর্গের আদর্শ ও ইতিহাস বর্ণনাকে উপেক্ষা করে গেছেন। ইসলামের চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাসে কোন আধ্যাত্মিক সাধক, ন্যায়পরায়ন শাসক, বিজ্ঞ সংবিধান প্রণেতা, অকুতোভয় সমর কুশলী ও প্রাজ্ঞ পন্ডিত তাঁরা পাননি, যাদের জীবন ও কর্ম পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। অথচ ভারত বর্ষের আনাচে-কানাচে এমন সব ইসলামী ব্যক্তিত্ব জন্ম লাভ করেন, যাদের নিয়ে ভারত বর্ষ রীতিমত গর্ব করতে পারে। এসব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ ভারতীয় ইতিহাসের রত্ন। তাঁদের আলোচনা ও জীবন কর্মের ইতিহাস ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সাহস ও কর্ম শক্তি যোগাতে পারতো। বস্তুতঃ পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাগণ মুসলিম যুগের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা ও ইতিহাস ক্যারিকুলামের অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিদেশী ও অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করেছেন। যদি কোথাও কোন ইসলামী ব্যক্তিত্বের আলোচনা আসে তাও এমন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয় যাতে তাঁর অমর্যাদা মানহানি ঘটে।[১] মানবতার বন্ধু, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে এমন অশালীন ও অজ্ঞতাপূর্ণ বক্তব্য কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যা ঐতিহাসিক বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ প্রসূত। এসব আপত্তিকর আলোচনা ভারতীয় মুসলমানদের সাথে অবিচারের শামিল এবং এতে তাদের ধর্মীয় অনুভূতি প্রচন্ডভাবে আহত হয়। বহুস্থানে মুসলমানদের 'যবন' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন, অস্পৃশ্য, নীচ ও বিদেশী। এ ধরণের আপত্তিকর পুস্তক পাঠ্য তালিকায় সন্নিবেশ এবং মুসলমানগণ সহ সব ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামুলক করণ স্পষ্টভাবে মুসলমানদের সাথে না ইনসাফীর শামিল এবং তাদের অনুভূতি ও অধিকার

---

[১] দ্রষ্টব্য - উত্তর প্রদেশের ৬ষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক 'হামারে পুরুজ'

লঙ্ঘণের নামান্তর। এটা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংহতি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকারের প্রতি প্রচন্ড ধরণের হুমকী। অথচ মুসলমানগণ ভারতবর্ষকে নিজের মাতৃভূমি মনে করেন, এখানে স্থায়ী বসবাসের ইচ্ছে পোষণ করেন এবং এদেশের সেবা ও উন্নয়নে নিজেদের শ্রেষ্টতম মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর ব্রত নেন।

শিক্ষা পদ্ধতি মুসলিম সন্তান সন্ততিদের দ্রুত ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক নৈরাজ্যের অতলপঙ্কে নিক্ষেপ করবে এ আশঙ্কা অমূলক নয়। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে উদাসীন এমন সব মুসলিম পরিবারে ইতোমধ্যে নতুন শিক্ষা পদ্ধতির মারাত্মক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব পরিবারের সন্তানগণ উদারভাবে অনৈসলামিক ও পৌত্তলিক শিক্ষা ও রীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। সত্যিকার অর্থে এটা মুসলমানদের জন্য বড়ই উদ্বেগের বিষয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতনের ইঙ্গিতবাহী।

বর্তমান পরিস্থিতি সন্দেহাতীতভাবে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্লেশকর। সৃষ্ট পরিস্থিতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ও ৩১ ডিসেম্বর প্রদেশের বাস্তী জেলায় এক বিশাল শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মাসলাকের প্রায় ৩০০ মুসলিম প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করে সর্বসম্মতিক্রমে ভারত সরকারের কাছে দাবী জানান যেন সরকারী পাঠ্যক্রম জরুরী ভিত্তিতে সংশোধন করা হয় ; যেসব নিবন্ধ ইসলামী আকায়েদের পরিপন্থী ও বিশেষ কোন ধর্মাবলম্বীদের এবং তাদের ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে তা যেন সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক আদর্শের আলোকে ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়। সম্মেলনে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রভাতী ও নৈশকালীন বিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকালয়ে আরো কিছু নতুন বিদ্যালয় খোলা হবে যেখানে সরকারী অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি পবিত্র কুরআন, ইসলামিক ষ্টাডিজ ও উর্দু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। সম্মেলনের সিদ্ধান্তের প্রতি মুসলমানগণ ইতিবাচক সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন এবং উত্তর প্রদেশের প্রায় শহরে

শিক্ষা সম্মেলনের শাখা কমিটি গঠিত হয়। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মতবিনিময় সভা, নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠকের মাধ্যমে মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হচ্ছে মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও।

উর্দু ভাষার সমস্যা ঃ

ভারতীয় মুসলমানদের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে ভাষা সমস্যা। উর্দু ভাষা হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও শ্রেণীর মিলনের ফলে সৃষ্ট একটি নতুন ভাষা। উর্দু ভাষার মূলে ও নির্মাণ শৈলীতে সংস্কৃতি, আরবী,ফার্সি ও তুর্কীর বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। ভারতে বৃটিশ শাসনামলে বিপুল সংখ্যক ইংরেজী শব্দ উর্দূ সাহিত্য পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। ফলে উর্দু ভাষা সত্যিকার অর্থে ভারতীয় জাতীয়তার প্রতীক ও সাধারণ মানুষের ভাব প্রকাশের শ্রেষ্টতম মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি পায়। ভারতের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী মিলে উর্দুকে বুদ্ধিবৃত্তি, সংস্কৃতি, কবিতা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও ভাবের আদান প্রদানের শক্তিশালী বাহন হিসেবে গড়ে তুলেন। উত্তর প্রদেশ,বিহার,পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, দিল্লি এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের উর্দুই হচ্ছে মাতৃভাষা। কিছু ইংরেজী সংবাদপত্রকে বাদ দিলে সবচেয়ে বহুপঠিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় উর্দু ভাষায়।

ইংরেজীর পর উর্দুই ছিল ভারতের দ্বিতীয় সরকারী ভাষা। আদালত, সরকারী অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উর্দুর বিচরণ ছিল জোরালো ও সাচ্ছন্দ। উত্তর প্রদেশের প্রাক্তণ লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার এ্যান্থনী ম্যাকডোনাল্ড (Sir Anthony Mecdonald) হিন্দীকে আদালতের ভাষারূপে ঘোষণা দিয়ে দু'ভাষার এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর ভারতীয় ইউনিয়নের সংবিধানে হিন্দীকে সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ৩৪৩ ধারায় বলা হয় ঃ

The Official Language of the Unions Shall be Hindi in Devenagri script.

'দেবনাগরী হরফে হিন্দীই হবে ভারত ইউনিয়নের সরকারী ভাষা।'

এছাড়া সংবিধানের ৩৪৫ ধারায় দেশের আরো ১৪টি ভাষাকে ভারতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এসব ভাষায় যারা কথা বলেন তাঁদের দাবীর প্রেক্ষিতে সন্তান সন্ততিদের নিজেদের ভাষায় শিক্ষা প্রদান করবে। এক্ষেত্রে সবধরণের সুযোগ-সুবিধে সরকার প্রদান করবে। এক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রয়েছে তিনি যেকোন রাজ্য কর্তপক্ষকে সে রাজ্যের জনগোষ্ঠীর ভাষার ভিত্তিতে যেকোন ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। সংবিধানের ৩৪৭ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

On a demand being made on that behalf, the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout the State or any part thereof for such purpose as he may specify.

'যেকোন রাজ্যের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যদি চান যে, তাঁরা সে ভাষা ব্যবহার করবেন যে ভাষায় তাঁরা কথা বলেন এবং রাজ্য সরকারও সে ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদান করুক ; রাষ্ট্রপতি যদি এতে সন্তুষ্ট হন তাহলে দাবীর প্রেক্ষিতে সে ভাষাকে পুরো রাজ্যের জন্য অথবা রাজ্যের কোন অংশ বিশেষের সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজ্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারেন।'

কিন্তু সংবিধানের উপরিউক্ত গ্যারান্টি সত্ত্বেও উর্দুর জন্ম ও বিকাশভূমি উত্তর প্রদেশ ও দিল্লি হতে উর্দুকে নির্বাসন দেয়া হয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেও উর্দুর অস্তিত্বকে বরদাশত করা হয়নি। শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমের স্তরে হিন্দিকে শিক্ষার মাধ্যম বানানো হয়। উত্তর প্রদেশ সরকারের পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে উর্দু ব্যবহারের উপর অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে। সৃষ্ট এ পরিস্থিতি উর্দু ভাষী জনগোষ্ঠীকে দারুনভাবে হতাশ ও বিস্মিত করে দেয়। উর্দুর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ ও

বেদনার সৃষ্টি হয়। কারণ উর্দুর মর্যাদা ও ব্যবহার হ্রাস পেলে কেবল মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি হবেনা বরং তাদের আকীদা ও মাযহাবের ভবিষ্যতকে প্রশ্ন সাপেক্ষ করে তুলবে। কারণ উর্দু ভাষাই ভারতীয় মুসলমানদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম। উর্দু ভাষায় রয়েছে মুসলমানদের প্রায় সব ধর্মীয় সাহিত্য। উর্দু ভাষার বর্ণমালা আরবী বর্ণমালার কাছাকাছি হওয়ার কারণে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত সহজতর হয়। উর্দু ভাষা হতে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ মুসলমানগণ জাতীয়তা, সংস্কৃতি, সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে আত্ম পরিচয়হীন জাতিতে পরিণত হয়ে পড়বে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে উর্দু ভাষীগণ সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শণ করতে থাকে ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লিতে ১৯৪৯ সালে প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহবান করেন। উক্ত সম্মেলনে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম সংক্রান্ত নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ

The medium of instruction and examination in the Junior basic stage must be the mother-tongue of the child and where the mother-tongue is different from the Regional or the State language, arrangements must be made for instruction in the mother tongue by appointing at least one teacher, provided there are not less than 40 pupils speaking the language in the whole school or 10 such pupils in a class. The mother tongue will be the language declared by the parent of the guardian to the mother tongue.

'মাধ্যমিক মৌলিক স্তরে শিশুদের শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম অবশ্যই মাতৃভাষায় হওয়া চাই। যেখানে রাষ্ট্রীয় ও রাজ্যের ভাষা হতে মাতৃভাষা ভিন্ন হবে সেখানে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের জন্য কমপক্ষে একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে ন্যূনপক্ষে ৪০ জন অথবা ক্লাসে ১০জন উক্ত ভাষা ভাষাভাষী ছাত্র-ছাত্রী থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর মাতা-পিতা ও অভিভাবক যে ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা দিবেন সেটাই হবে উক্ত শিক্ষার্থীর 'মাতৃভাষা'।

দুর্ভাগ্যজনক ভাবে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত কেবল ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। উত্তর প্রদেশের সরকারী ও পৌর বিদ্যালয়গুলোতে হিন্দীকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেয়া হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কেবল হিন্দীই পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে অব্যাহত থাকে। উর্দু শিক্ষা প্রায় বন্ধ করে দেয়া হয়। যেসব শিশুদের মাতৃভাষা উর্দু তারাও প্রাথমিক পর্যায়ে উর্দু ভাষা শিক্ষার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। মুসলমান ও উর্দুভাষী জনগণ ১৯৪৯ সালে দিল্লিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের স্কুলে উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের নিকট বারংবার আবেদন-নিবেদন করতে থাকেন। একমাত্র লক্ষ্ণৌতেই ১০ হাজার মাতা-পিতা ও অভিভাবক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এ ব্যাপারে লিখিত আবেদন জানান কিন্তু প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কোন মনোযোগ প্রদান করেননি।

সব প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর উর্দু ভাষী জনগণ সংবিধানের ৩৪৭ ধারার আশ্রয় নিয়ে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির সমীপে একটি স্মারকলিপি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। উর্দু উন্নয়ন সমিতির (আঞ্জুমান-ই- তারাক্কী-ই-উর্দু) উদ্যোগে স্বেচ্ছায় ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রায় ২০ লাখ ৫০ হাজার বয়স্ক মানুষের এবং ২০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় স্মারক লিপিতে। আঞ্জুমানে-ই-তারাক্কী-ই-উর্দুর সভাপতি, বিহারের প্রাক্তণ গভর্ণর ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ ভাইস চ্যান্সেলর ড. জাকির হোসেনের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জননেতা ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল গঠণ করা হয়। ১৯৫৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে উর্দুকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী জানিয়ে স্মারকলিপিটি রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে (ক) যেসব ছাত্র-ছাত্রীর মাতৃভাষা উর্দু তাদের প্রাথমিক স্তরে উর্দু ভাষায় শিক্ষা প্রদানের সুবিধে প্রদান করা হোক। (খ) যেসব স্কুলে ৪০জন বা ক্লাসে ১০জন উর্দুভাষী শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের জন্য উর্দু শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হোক। (গ) তাদের অফিস ও আদালতে উর্দু ভাষায় লিখিত আবেদন ও আর্জি বিবেচনা গ্রহণ করা হোক। (ঘ) সরকারের সব নির্দেশনাবলী, নোটিফিকেশন, গেজেট, বিল, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য প্রকাশনা উর্দু ভাষায় করা হোক। (ঙ) আগের

রেওয়াজ মত উর্দু ভাষায় রচিত ব্যাতিক্রমধর্মী গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ঘোষণা করা হোক। (চ) সরকারী গণগ্রন্থাগার, একাডেমী, সেমিনার লাইব্রেরী ও পাঠকক্ষের জন্য উর্দু ভাষায় রচিত গ্রন্থ সমূহ ক্রয় করা হোক। (ছ) সরকারী দফতর সমূহে পুনরায় উর্দুকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।

বার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলে পাঁচ জন ছিলেন হিন্দু বিশেষজ্ঞ। রাষ্ট্রপতি প্রতিনিধি দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং দাবী গুলোর প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করেন। ব্যাস্ এতুটুকু। যথা পূর্বং তথা পরং। স্মারকলিপির আলোকে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি যাতে উর্দু ভাষীদের স্বস্তি মেলে এবং তাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবার হাত থেকে মুক্তি পায়। শিক্ষাবিভাগ পূর্বেকার মত উর্দুর সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ অব্যাহত রাখে। উর্দু ভাষাভাষী অঞ্চলের শিশুরা আগের মতই মাতৃভাষার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হতে বঞ্চিত রয়ে গেলো। যার ফলে নব প্রজন্মের শিশুরা ক্রমশঃ প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, আকীদা, মাযহাব ও পূর্ববর্তী যুগের বুযুর্গদের সাথে তাদের সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, নব প্রজন্ম নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে শত যোজন দূরে চলে গেছে। শত প্রচেষ্টা চালিয়েও তাদের নিজেদের তাহ্যীব ও তামাদ্দুনের সাথে পরিচিত করানো সম্ভব হচ্ছেনা। কারণ নতুন ও পুরনোর মাঝে যে সেতুবন্ধন ছিল তা ভেঙ্গে গেছে।

১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সরকারে উদ্যোগে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মূখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে বহুল আলোচিত 'তিন ভাষার ফর্মূলা' (Three Language Formula) উদ্ভাবন করা হয়। ফর্মূলা অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হিন্দী, ইংরেজী ও একটি ভারতীয় ভাষা শিখতে হবে। আশা করা হয়েছিল উর্দুভাষী শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে কিন্তু উত্তর প্রদেশ কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক নীতি ও উর্দুভাষী শিক্ষার্থীদের আশার গুড়ে বালি ছিটিয়ে দিল। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিলেন কেন্দ্রের এ

সিদ্ধান্ত তাদের জন্য প্রযোজ্য নয় বরং এটা দক্ষিণ ভারতের ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাখ্যা মাধ্যমিক পর্যায়ে উর্দু ভাষার শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীদের অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঠেলে দেয়। উর্দুকে সমাজ জীবন থেকে নির্বাসিত করার এটা কর্তৃপক্ষীয় উদ্যোগ - একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

১৯৬১ সালে পুনরায় উত্তর প্রদেশ সরকারের উদ্যোগে আচার্য জে.বি ক্রিপালিনীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠণ করা হয়। কমিটি গঠণের উদ্দেশ্য ছিল উর্দু ভাষী মানুষের ক্ষোভ যাচাই, সরকারের নির্দেশ কেন বাস্ত বায়িত হয়নি তা খতিয়ে দেখা এবং এ ব্যাপারে যুৎসই সুপারিশ পেশ করা । কিন্তু আফসোসের বিষয় কমিটি কর্তৃক সরকারের নিকট দাখিলকৃত রিপোর্ট অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। উর্দু ভাষী জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ ও দুঃখের ব্যাপারটি আদৌ বিবেচনায় না নিয়ে তদন্ত কমিটি উল্টো মুসলমানদের মাকতাব, ইসলামিক স্কুল ও ধর্মীয় আরবী-ফার্সী মাদ্রাসা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কমিটির সুপারিশ যদি গ্রহণ করা হতো তাহলে উর্দুর অবস্থান আরো দুর্বলতর হয়ে পড়তো এবং ক্রমান্বয়ে উর্দু তার স্বতন্ত্র অস্তি ত্ব হারিয়ে ফেলতো। মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত ক্রিপালিনী কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হলে শত বছর ধরে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ হয়ে যেত।

উর্দু ভাষার প্রতি সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় মুসলমানদের উভয় সঙ্কটে নিপতিত করে দেয় এবং তাঁরা এক বিস্ময়কর নৈতিক অবিশ্বাসের শিকার হন। নিজ মাতৃভুমিতে তাঁরা ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়ার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এতদসত্ত্বেও ভারতের মুসলমানদের হতাশ হয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। রাজনৈতিক সচেতনতা মুসলমানদেরকে ভারতের বৃহত্তর শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে এবং বিদ্যমান সমস্যার একটি ন্যায়ানুগ ও সম্মানজনক সমাধানে আসতে একান্ত ভাবে বাধ্য। বিজ্ঞ জনমত মুসলমান ও উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষাবিদ্যা ও সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবরূপ দানের প্রজ্ঞা শিগগির উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। ভারতে বসবাসরত

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির লালনে আস্থা ও প্রত্যাশার একটি অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অপরিহার্য পূর্বশর্ত। সংখ্যালঘুদের মনে এমন আস্থার জন্ম দিতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও বঞ্চনার দিন ফুরিয়ে গেছে ; স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে এবং কোন ভাষা, হোক সেটা হিন্দী, কোনক্রমেই যেন অন্যভাষার উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস যখন সম্মিলিতভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু করেন এবং ভারতের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণের গ্যারান্টি প্রদান করেন তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত হন শুধু একটি আশা বুকে নিয়ে তাহলো আকীদা, ধর্ম ও সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকার যা ইংরেজ শাসনামলে জনগণ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পর তা তাঁরা পুনরায় ফিরে পাবেন। মেধা ও প্রয়োজন অনুসারে তাঁরা নিজেদের উত্তরাধিকার ঐতিহ্য ও লালিত আদর্শকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করবেন। এটাই ছিল তাদের প্রত্যাশা।

মুসলমানদের অর্থনৈতিক সমস্যা ঃ

ভারতীয় মুসলমানদের চতুর্থ সমস্যা হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা। ইতহাসের দর্শন ও বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী অধ্যয়নে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অর্থনৈতিক অবস্থা যেকোন জাতির চিন্তা-চেতনা, স্বাস্থ্য, ও বুদ্ধি বৃত্তিক ক্ষেত্রে বড় ধরণের প্রভাব বিস্তার করে। যে জাতি আর্থিক দুরাবস্থা, ক্ষুৎ দারিদ্র্য, অন্নাভাবের শিকার হয়, সে জাতি উন্নতির দিশা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, ভবিষ্যত হয় অন্ধকার এবং নব প্রজন্ম হতাশ ও সাহসহারা হয়ে গুরুদায়িত্ব পালনে অক্ষম থেকে যায়। যারা উন্নত ও দুঃসাহসী জাতির সারি থেকে দূরে সরে দাঁড়ায় শিগগির তারা পশ্চাদপদ, মর্যাদাহীন ও ভীরু জাতির কাতারে শামিল হয়। তাদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা ও ধীশক্তির তীক্ষ্ণতা নিঃশেষ হয়ে যায়। ইংরেজদের রাজত্বকালে ভারতীয় মুসলমানদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল সরকারী উচ্চ পদ ও বড় মাপের ব্যবসা। দেশ বিভাগের পর জমিদারী শেষ হয়ে যায়

এবং এ পদক্ষেপ ভারতীয় সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে সঠিক ছিল। সরকারী পদ ও চাকুরীতে মুসলমানদের অনুপাত দিন দিন হ্রাস পাওয়ায় তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের ভবিষ্যত তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তর বিভিন্ন বিভাগে বিশেষত পুলিশ, সেনাবাহিনী ও দায়িত্বশীল পদে লোক নিয়োগের অনুপাতিক হারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে অপরিচিত যেকোন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন যে, হয়তো এদেশ হতে মুসলমানগণ হিজরত করে চলে গেছেন অথবা যারা আছেন তারা এতই গন্ডমুর্খ যে, সরকারী চাকুরী করার যোগ্যতাই তাঁরা রাখেন না। কিছু দিনের মধ্যে পুরনো মুসলমান অফিসার বিভিন্ন দফতর হতে সম্পূর্ণরূপে বহিস্কৃত হয়ে যাবেন। ১৫ কোটি মানুষের বিশাল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কোন দায়িত্বশীল প্রতিনিধিত্ব আমলাতন্ত্রে ও সরকারের প্রশাসনযন্ত্রে আর দেখা যাবেনা। আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে কতিপয় কর্তৃপক্ষীয় তথ্য-উপাত্ত পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি। প্রথম উদাহরণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর ওই ভাষণের অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি যা তিনি ১৯৫৮ সালের ১১ মে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি সম্মেলনে প্রদান করেছিলেন ঃ

"I called for statistics from the Sates to ascertain the percentage of minorities in the recruitments to public services. I found that the representation of Muslims was progressively declining, one of the reasons being the procedure adopted for competitive examinations that are held for recruitment to all- India services. In these examinations insistence is laid on the knowledge of Hindi and candidates who fail to qualify in it are rejected. Question papers are also required to be answered in Hindi and candidates belonging to minority communities it hard to come up to the standard of literary Hindi."

"সরকারী চাকুরীতে সংখ্যালঘুদের নিয়োগের আনুপাতি হার নিরুপনের জন্য আমি বিভিন্ন রাজ্যের পরিসংখ্যান তলব করি। আমি লক্ষ্য করি যে, চাকুরীতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে ; সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বর্তমান নিয়মপদ্ধতি তার অন্যতম কারণ। এসব পরীক্ষায় হিন্দীর ভাষাজ্ঞানের উপর জোর দেয়া হয় এবং যেসব পরীক্ষার্থী এতে অকৃতকার্য হয় তাদেরকে চাকুরী প্রদান করা হয়না। প্রশ্নের উত্তর হিন্দী ভাষা চাওয়া হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে উচ্চাঙ্গের হিন্দী সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।"

দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে ১৯৫২ সালে দিল্লি রাজ্য সভার (Delhi State Legislature) কার্যবিবরণী। এক প্রশ্নের উত্তরে সংসদকে জানানো হয় যে, '১৯৪৬ সালে দিল্লি পুলিশ বাহিনীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১৪৭০ জন আর বর্তমানে মাত্র ৫৬ জন। ১৯৪৬ সাল থেকে দু'জন মুসলিম কনষ্টেবল এবং একজন হেড কনষ্টেবলকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পুলিশের মোট সংখ্যা হচ্ছে ২০৫৮ জন।' অর্থাৎ ১৯৪৬ সাল হতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ছ'বছরে মাত্র তিনজন মুসলিম দিল্লি পুলিশ বাহিনীতে নেয়া হয়েছে।

তৃতীয় উদাহরণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী মি. মহাবীর তিয়াগীর আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ। প্রতিমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন ঃ

The percentage of Muslims in the Armed Forces, which was 32 at the time of Partition, has now come down to 2. To correct this state of things, I have instructed that due regard should be paid to their recruitment.

"দেশ বিভাগের সময় সেনাবাহিনীতে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩২ জন বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩২ জনে। এ অবস্থা সংশোধনের জন্য আমি সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের নিয়োগের ব্যাপারে যথাযথ মনোযোগ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছি।"

উপরিউক্ত বাস্তব তথ্যের আলোকে অনুমান করা যায় গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে কতজন মুসলমান কর্মরত রয়েছেন, যদিও এখনো মুসলমানদের মধ্যে যোগ্যতা ও দক্ষতা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। অতীতেও দক্ষতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের ব্যাপক খ্যাতি ছিল এবং বর্তমানেও তাদের পড়া-লেখা ও যোগ্যতার মান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের সংবিধান যদিও ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুবিধের গ্যারান্টি দিয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র একেবারে ভিন্ন ও উল্টো। বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে ভারতে চাকুরী না পেয়ে মুসলমানদের ছেলে মেয়েরা হতাশ। বহু শিক্ষিত যুবক দেশ ত্যাগ করে প্রতি বছর পাকিস্তানে পাড়ি জমাচ্ছেন। এতদসত্ত্বেও আশা করা যায় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলী বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থার অবসানে সক্ষম কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতি সন্দেহাতীতভাবে সংবিধানের মৌল চেতনার পরিপন্থী। তবে এর জন্য পূর্বশত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ তাদের আবেগকে সংযত করে সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব যদি মেনে নেন তাহলে অতীতের তিক্ত স্মৃতি মুছে ফেলা সম্ভব।

মুসলিম পারিবারিক আইন ঃ

ভারতে বসবাসরত মুসলমানগণ নিজেদের ধর্মীয় বলয়ে অবস্থান করে ব্যক্তিত্ব (Personalities) ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবেন কিনা এমন একটি প্রশ্ন সাম্প্রতিককালে দেখা দেয়। সরকার এবং সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠীর একটি চরমপন্থী শ্রেণীর মনোভাব হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন সম্পদ্রায়ের মানুষের জন্য একই দেওয়ানী-আইন (Uniform Civil Code) হওয়া চাই। এটা ছাড়া জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হতে পারেনা। এ বিপদ আশঙ্কার মাত্রা ছাড়িয়ে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে হাযির হলো মুসলমানদের সামনে। সরকারের অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির মাঝে প্রদত্ত বিবৃতি ও অভিমত একই দেওয়ানী আইন প্রবর্তনের দাবীকে শক্তি যোগায়। আবদুল হামিদ দিলওয়ায়ী নাম জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি চিহ্নিত গ্রুপও ওই একই দাবী জানাতে থাকে এবং রীতিমত আন্দোলনের সৃষ্টি করে। এ দাবী মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক নৈরাজ্য ও ইসলামী শরীয়তের সাথে বিদ্রোহের শামিল। আল্লাহর নির্ধারিত বিধান যারা লঙ্ঘণ

শরীয়তের সাথে বিদ্রোহের শামিল। আল্লাহর নির্ধারিত বিধান যারা লঙ্ঘণ করে তারা মুসলমান অভিধায় পরিচিত হতে পারেনা। মহান আল্লাহ্ বলেন 'আল্লাহর নাযিলকৃত বিধি-বিধান অনুযায়ী যারা নিজেদের জীবন পরিচালনা করে না তারা কাফির।'[১]

উপর্যুক্ত আশঙ্কাকে সামনে রেখে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড গঠিত হয়। বিহার ও উড়িষ্যার আমীরে শরীয়ত মরহুম মাওলানা সাইয়েদ মিন্নাত আলী রহমানী ছিলেন এ বোর্ড গঠণের অন্যতম পুরোধা। ১৯৭২ সালের ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত বোর্ডের প্রথম সাধারণ সম্মেলনে নিখিল ভারতের বিভিন্ন মাসলাকের ও সংগঠনের বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশ নেন। সাম্প্রতিককালে মুসলমানদের এত বড় সম্মেলন আর হয়নি। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান পরিচালল আল্লামা ক্বারী তৈয়ব (রহ.) বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। নব গঠিত বোর্ডের অধীনে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় স্থানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদেরকে তাদের সমস্যা ও বিপদের আশঙ্কা সম্পর্কে সচেতন করতে ও দাবী আদায়ে সু সংগঠিত করতে বোর্ডের ভুমিকা ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৮৩ সালের ১৭ জুলাই আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) এর ইন্তেকাল করেন। ওই বছরের ২৭-২৮ ডিসেম্বর মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত অল-ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের বার্ষিক সম্মেলনে আমার অনুপস্থিতিতে আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয় এবং ১৯৮৫ সালের ৬,৭,৮ এপ্রিল কোলকাতায় বোর্ডের পরবর্তী বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সারা ভারত থেকে পাঁচ লাখের মত মুসলমান অংশ গ্রহণ নেন। কোলকাতা সম্মেলনের দু'সপ্তাহ পর ১৯৮৫ সালের ২৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোষ সংক্রান্ত সে বিতর্কিত রায় প্রদান করেন যা ধর্মীয় বিধানে সরাসরি হস্তক্ষেপ। পবিত্র কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা, ইসলামী শরীয়তের অমর্যাদার শামিল। এ রায় ভারতীয় মুসলমানদের ঈমানী ভিত, আত্মমর্যাদা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দুর্বিনীতভাবে নাড়া

---

[১] আল-কুরআন, সূরা মায়েদা ঃ ৪৪

দেয়। সুপ্রিম কোর্ট নিজের সীমালঙ্ঘন করে এ বিপদজনক পদক্ষেপ নেন এমন কতিপয় লোকের কৃত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ভাষ্যের উপর ভিত্তি করে, যাদের তাফসীরের উপর পান্ডিত্য থাকা দূরের কথা সাধারণ আরবী জানেন কিনা তাও সন্দেহ। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলিম, প্রাজ্ঞ মুফতী ও বিদগ্ধ মুফাসসীরদের অভিমত আমলে নেয়া হয়নি।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক 'মুতা বিল মারুফ' এর অনুবাদ করেছেন 'ভরণপোষণ' (Maintenance) দিয়ে। যার কারণে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর আমৃত্যু ব্যয়ভার তালাকদানকারী স্বামীকে বহন করতে হবে। যদিও পবিত্র কুরআনের ইংরেজী অনুবাদকদের মধ্যে অধিকাংশ বিজ্ঞ, সতর্ক ভাষ্যকারগণ 'ভরণপোষণ' এর পরিবর্তে 'সম্মান জনক ও ন্যায্য মালপত্র' শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর সারা জীবনের ভরণ-পোষনের দায়িত্ব পূর্বেকার স্বামীর উপর বাধ্যতামূলক করে দিলে পরিণতি হবে দুঃখজনক ও ভয়াবহ। ফলে স্বামী তার অপছন্দনীয় স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পরিবর্তে দোদুল্যমান অবস্থায় রেখে দেবে। স্ত্রীর চোখের পানিতে বুক ভেসে যাবে। ইজ্জত ও স্বাধীনভাবে স্বামীর সংসারও করতে পারবেনা, এমনকি দ্বিতীয় বিয়েও করতে পারবেনা। নীতিগতভাবে যেকোন বিদেশী ভাষায় পবিত্র কুরআনের এক বা দু'টি ভাষা অনুবাদের উদ্ধৃতি নিয়ে পবিত্র কুরআনের শব্দ ও শরীয়তের পরিভাষায় ব্যাখ্যা প্রদান এবং তাকে ভিত্তি করে শরীয়তের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রায় দেয়া একটি বিপদজনক পদক্ষেপ এবং এর প্রতিক্রিয়া হয় দূর-প্রসারী। যার ফলে একটি জাতির পুরো শরীয়ত এবং তার ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা গভীর সংকটে নিপতিত হয়ে যায়। পারিবারিক ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। শরীয়তের বিধান সংশোধন ও বাতিল করার দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের বিতর্কিত রায়ের বিরুদ্ধে পুরো ভারতজুড়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভ শুরু হয়। এটা ছিল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ। এতে কোন সহিংসতা, আক্রমণাত্মক, আপত্তিকর কর্মকান্ড ছিলনা। বিক্ষোভ মিছিল , প্রতিবাদ সমাবেশ, ক্ষোভ প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির নিকট তারবার্তা প্রেরণের মধ্যে আন্দোলন সীমিত ছিল। অপরদিকে ইংরেজী ও হিন্দী সংবাদপত্র সমূহ এ সমস্যায় যথাসাধ্য তেজবীর্যের সাথে বিরোধিতা করেছে যার উদাহরণ দেশ

বিভাগের সময় পর্যন্ত দেখা যায়নি। সংবাদপত্র ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলো এ ব্যাপারে মুসলমানদের তীব্র অনুভূতি, পারিবারক জীবনে ইসলামী আইনের প্রভাব, তালাক প্রাপ্তা মুসলিম মহিলাদের অবস্থাকে এমনভাবে চিত্রায়িত করে যে, মনে হয়, যেন মুসলমানরা বিদেশী আগ্রাসী শক্তির হামলার শিকার হলো, যেন ভয়ানক ভূমিকম্প সাজানো বাগানকে লন্ডভন্ড করে দিল এবং আগ্নেয়গিরির উদগিরিত লাভার তলে সব কিছু চাপা পড়ে গেল।

সৃষ্ট পরিস্থিতির ভয়াবহতা মাত্রাজ্ঞানের (Sense of proportion) স্বাভাবিক রীতিকে পর্যন্ত পর্যুদস্ত করে দিল। মুসলিম মহিলাদের অধিকার ও খোর-পোষের ব্যাপারে ভারতীয় সংবাদপত্র জগতের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং হিন্দু মহিলাদের সামাজিক দূরাবস্থার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছাকৃত নীরবতা দায়িত্ব ও নীতিবোধের পরিচায়ক নয়। বি.বি.সি. হিন্দী সার্ভিস ভারত থেকে প্রকাশিত একটি হিন্দী মাসিক পত্রিকার এক মহিলা সম্পাদিকার যে সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে তাতে হিন্দু মহিলাদের অসহায়ত্বের বীভৎস চিত্র ভেসে উঠে। সাক্ষাৎকারে মহিলা সম্পাদিকা বলেন, 'বিগত তিন বছরে পুরো ভারতে যৌতুক না দেয়ার অপরধে ১১ হাজার নববধূকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।। পুলিশের দেয়া তথ্য অনুযায়ী বিগত বছর গুলোর তুলনায় কেবল ১৯৯০ সালে সাত হাজার নববধূকে আগুনে পোড়া হয়।'[১] জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র দৈনিক *'কাওমী আওয়াজ'* এর প্রতিবেদন অনুসারে দিল্লিতে গড়ে প্রতিদিন একজন নবপরিণিতা বধূকে হয়তো পুড়ে মারা হয় নইলে অন্যভাবে হত্যা করা হয়। সতীদাহ্ প্রথার শিকার অসহায় বিধবার প্রাণ নাশের ঘটনাতো হর হামেশা সংঘটিত হচ্ছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্র জগতের এত হৈ চৈ ও হাঙ্গামা অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। অথচ সংখ্যালঘু মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তালাক প্রাপ্তাদের সংখ্যা অতি নগন্য।

---

[১] বি.বি.সি. হিন্দী সার্ভিস হতে ১৯৯১ সালের আগষ্ট প্রভাতী অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে জনসভা, বিক্ষোভ মিছিল ও তারবার্তা প্রেরণের পাশাপাশি মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সভাপতি ও মহাসচিব প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করে মুসলমানদের ক্ষোভ ও দুঃখের কথা ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী এব্যাপারে অত্যন্ত সহানুভূতি ও আন্তরিকতার পরিচয় দেন। অতীতে অন্য কোন রাষ্ট্রীয় কর্ণধারের মধ্যে কোন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি।

পরিশেষে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে জনগণের লড়াই বিজয় লাভ করে। ১১ ঘন্টা দীর্ঘ উত্তপ্ত আলোচনার পর ১৯৮৬ সালের ৫ ও ৬ মে বিপুল ভোটাধিক্যে 'তালাক প্রাপ্তা মুসলিম অধিকার সংরক্ষণ বিল' মধ্যরাতে পার্লামেন্টে পাশ হয়। এভাবে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড তাদের আন্দোলনের একটি ধাপ কামিয়াবীর সাথে অতিক্রম করে। কিন্তু সফলতা ছিল আংশিক ও সীমাবদ্ধ কারণ মুসলমানদের মাথার উপর Uniform Civil Code এর খড়গ ছিল ঝুলন্ত। ওটা চালু হয়ে গেলে বিলের কার্যকারিতা হ্রাস পাবে। মুসলিম পারিবারিক আইনে হস্তক্ষেপ করার বহু দরজা খুলে যাবে। ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ধারায় 'একই নাগরিক আইন' Uniform Civil Code অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং এটাকে সংবিধানের 'নির্দেশনামূলক নীতি'র (Directive principles) মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে ঃ 'রাষ্ট্র পুরো ভারতের জনগণের জন্য 'একই নাগরিক আইন' (Uniform Civil Code) প্রবর্তনে সচেষ্ট থাকবে।' বাস্তবে 'একই নাগরিক আইন' দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র সহায়ক শক্তি নয়। শহর কেন্দ্রিক যেকোন আদালতে গেলে দেখা যাবে একই ধর্মাবলম্বী একই পার্সোনাল ল' এর অনুসারীরা একে অপরের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করছে, কিভাবে আইনের আশ্রয় প্রার্থনা করছে এবং এভাবে একে অপরের জান-মালেরও দুশমনে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ব্রিটিশ আইন বিশেষজ্ঞ E. Boden Heimer এর বক্তব্য সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য ঃ

'কোন আইনী ব্যবস্থা যার লক্ষ হচ্ছে মানব জীনে একই ধারা প্রবর্তন করা, এতে যদি জনগোষ্ঠীর একটি বৃহত্তর অংশের মধ্যে বঞ্চনা ও না ইনসাফীর

ধারণা সৃষ্টি হয় তাহলে সে আইনকে ভঙ্গ ও লঙ্ঘনের হাত থেকে রক্ষা করা ও নিরাপদ রাখা রাষ্ট্র পরিচালকদের জন্য নেহায়েত কঠিণ হয়ে দাঁড়ায়।[১] একথা মুসলমানদের ঈমান আকীদার অংশ যে,তাদের পারিবারিক আইন ওই আল্লাহর তৈরী যিনি পবিত্র কুরআন অবতরণ করেছেন, আকিদাও ইবাদতের বিধি বিধান দান করেছেন। গোটা কুরআন এসব বর্ণনায় ভর্তি। এ আকিদার প্রতি ঈমান আনতে মুসলমান নারী পুরুষ একান্তভাবে বাধ্য। এছাড়া কেউ মুসলমান থাকতে পারেনা। এ আইন সর্বজ্ঞ ও সর্বত্র বিরাজমান মহান আল্লাহর তৈরী যিনি মানুষের স্রষ্টা ও বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তিনি মানুষের প্রয়োজন ও দূর্বলতা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী যে, অপ্রয়োজনীয় মানসিক অস্থিরতা, সন্দেহ ও ভীতিপ্রদ পরিবেশের সমাপ্তি ঘটুক। কোন দেশের পুরো জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যখন নিজেদের ভবিষ্যত, জীবনধারা, আকিদা, বিশ্বাস, শরীয়তের বিধি বিধান সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয়ে পতিত হয় তখন সে দেশে ও কখনো উন্নতি করতে পারেনা। যে দক্ষতা ও প্রাণশক্তি দেশের সংহতি, অগ্রগতি ও উন্নয়নে ব্যয় হতে পারতো সেটা সন্দেহ, সংশয় দূর করার কাজে যদি নিঃশেষিত হয় তাহলে এর চাইতে দূর্ভাগ্যের কথা আর কী হতে পারে ? যদি মুসলমানদের এ আশঙ্কা হয় যে, আমাদের মত আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মও ধর্ম ও ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে অধিকার ও স্বাধীনতা পাবেনা তখন তাদের মধ্যে এমন উদ্বেগজনক অস্থিরতার জন্ম নেবে যা কেবল মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর হবেনা বরং দেশ ও জাতির জন্য হবে বেদনাদায়ক ও ধ্বংসাত্মক। এহেন পরিস্থিতি শান্তি, স্থিতি, পারস্পরিক আস্থা, সম্মান, দেশের উন্নয়ন ও যৌথ কর্মপ্রয়াসের পথে বড় ধরণের অন্ত রায় ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

ঐতিহাসিক মসজিদগুলোকে মন্দিরে পরিণত করা দাবী ঃ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ১৯৮৪ সালে ৭,৮ এপ্রিল এক গুপ্ত সম্মেলন আহবান করে। এতে সারা ভারতের বিপুল সংখ্যক চরমপন্থী হিন্দু অংশ

[১] E. Boden Heimer, Jurisprudence , Harvard, 1967, p.212

গ্রহণ করে। সম্মেলনে মুসলিম জাতি গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে বিনাশ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তাব পাশ হয়। সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের বুক থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ (Ethnic cleansing) এবং স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে তারা যেন পরিচয় দিতে না পারে। বেনারসের জ্ঞানবাকী মসজিদ, মথুরার ঈদগাহ ও অযোধ্যার বাবরী মসজিদকে মুসলমানদের হাত থেকে মুক্ত করে যথাক্রমে প্রথমটাকে বিষুনাথের মন্দির, দ্বিতীয়টিকে কৃষ্ণ জন্মভূমি ও তৃতীয়টাকে রাম জন্মভূমিতে পরিণত করার দাবী জানানো হয়। ইতোমধ্যে বিশ্বহিন্দু পরিষদ দিল্লির কুতুব মিনার আগ্রার তাজমহলের নিচে মন্দির থাকার কাল্পনিক তথ্য প্রচার করে এসব ঐতিহাসিক নিদর্শন ভেঙে ফেলার দাবী জানায়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (RSS) সাধারণ হিন্দু জনগণকে একথা বুঝাবার চেষ্টা করে যে, বর্তমানে যেখানে বাবরী মসজিদ প্রতিষ্ঠিত সেখানে ষোড়শ শতাব্দীর আগে জহিরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবর এটা ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী করেন। গোটা ভারতের ইংরেজী ও হিন্দী সংবাদপত্র সমূহ অত্যন্ত জোরালো ভাষায় রামজন্ম ভূমির পক্ষে উম্মত্ত প্রচারণা চালাতে থাকে। ১৯৮৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারী মসজিদের তালা আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হয়। আগে থেকেই মসজিদের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মুর্তি স্থাপন করা হয়। এটা ছিল বড় ধরণের ঘুর্ণিঝড়ের বিপদ সঙ্কেত। আতঙ্ক ও দূর্যোগের ঘণঘটায় আচ্ছন্ন পরিবেশে দ্বীনি, জাতীয় গবেষণা, শিক্ষা বিষয়ক কোন কাজ হতে পারেনা। সম্প্রদ্রায় হিসেবে মুসলামনদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই সংকটের আবর্তে পড়ে যায়। বাবরী মসজিদ রাম জন্ম ভূমিতে তৈরী হয়েছে এ গুজব ও প্রোপাগান্ডা খন্ডন করে লক্ষ্ণৌর ইসলামিক রিসার্চ ও পাবলিকেশন একাডেমী, আজমগড়ের দারুল মুসান্নিফীনের পক্ষ হতে বিজ্ঞ হিন্দু ও মুসলমানের লেখায় সমৃদ্ধ অনেক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ বেরিয়েছে। এসব নিবন্ধে বিজ্ঞ লেখকগণ প্রমাণ করেছেন যে, বাবর কোন মন্দিরকে ধ্বংস করে মসজিদ বানিয়েছেন এমন কোন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ প্রমাণ নেই। থাকলেও তা বিতর্কিত স্থানের বাইরে। এ বিষয়ে আজমগড়ের দারুল মুসান্নিফীনের পরিচালক মাওলানা সাইয়েদ সাবাহুদ্দীন এম.এ রচিত *'বাবরী মসজিদ তারিখী পাস মান্যার আওর পেশ নযর কী রৌশনী মে'* বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

এছাড়া ড.আর. এল. শাকলা, চৈতানন্দ দাশ প্রমুখ বিজ্ঞ লেখকগণও বাবরী মসজিদ ও রামমন্দির ইস্যু নিয়ে পক্ষপাতহীন ও বাস্তবোচিত নিবন্ধ লিখে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

ঘুমন্ত অস্থিরতাকে জাগিয়ে তোলা অনুচিত ঃ

আমি প্রাক্তণ প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে লিখিত এক পত্রে বলেছিলাম ঃ

ইতিহাসের চাকাকে উল্টো দিকে ঘুরাতে গেলে অপ্রয়োজনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এটা একটি ঘুমন্ত বাঘ, তাকে জাগানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয় গুলোর বিষয়ে ইতিহাসের ধ্বংসস্তুপ থেকে সত্য-মিথ্যা তথ্যাদি বের করে পুরণো অবয়বে ফিরে নেয়ার দাবী- একটি বড় ধরনের উত্তেজনার জন্ম দেবে এবং এর ধারাবাহিকতা শেষ হবার নয়। আমি প্রথম এ পরামর্শই দিয়েছি। অতঃপর প্রাক্তণ প্রধানমন্ত্রী রাজীবগান্ধীকেও বলেছি যে, সরকার প্রকাশ্যে ঘোষণা করুক যে, প্রতিটি সম্প্রদায়ের উপাসনালয়গুলো ১৯৪৭ সালে ১৫ আগষ্টের পূর্ববর্তী অবস্থায় থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের অপর সম্প্রদায়ের উপাসনালয় দখল করার অথবা কল্পিত পুরণো অবয়বে ফিরে নেয়ার অনুমতি দেয়া যাবেনা।

বর্তমান সরকার ও প্রশাসনের প্রতি আমার আন্তরিক পরামর্শ তাঁরা যেন উপাসনালয় ও পবিত্র স্থান সমূহের পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করার বা আধিপত্য বিস্তারের অনুমতি না দেন। ইতিহাসকে পেছনের দিকে নেয়ার পরিবর্তে সামনে দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ কারণ- জীবন চলমান ও প্রবাহমান। পৃথিবী দ্রুততর সাথে উন্নতির পথে ধাবিত হচ্ছে। আমাদের দেশ বিশেষভাবে অত্যন্ত স্পর্শকাতর সমস্যায় জর্জরিত। কল্যানকামিতা, মানবতা, শান্তিপ্রিয়তা ও নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এদেশকে পৃথিবীর নৈতিক নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে হবে। এটা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্বাভাবিকতা। পৃথিবীর বৃহত্তর শক্তিগুলো এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে এবং দুর্নামের ভাগী হয়েছে অনেকাংশে।

তাহ্‌রীকে-ই- পয়াম-ই- ইনসানিয়াত ঃ

ঘটনাবলীর নিয়মিত পর্যবেক্ষণে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, ভারতবর্ষ চারিত্রিক নৈরাজ্য ও জাতীয় আত্মহত্যার পথে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। নৈতিক মর্যাদাবোধ পদদলিত হচ্ছে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে স্বার্থপরতা ও উম্মত্ততার দৈত্য কমবেশী সবার ঘাড়ে সওয়ার। মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর সম্মান ও মর্যাদা দ্রুততার সাথে বিদায় নিচ্ছে। তুচ্ছ ব্যক্তিস্বার্থের জন্য সামগ্রিক ও জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলী দেয়া হচ্ছে। কাজে ফাঁকি, দায়িত্ববোধের অভাব, চুরি, ঘুষ, মজুদদারী, অসদাচরণ সবই একই বৃক্ষের ফল। এসব কারণে মানুষের পুরো জীবন অভিশপ্ত হয়েছে। স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব অর্জনের পরও বেঁচে থাকার অধিকার ও স্বাধীনতার সুফল ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেলো। এসব ত্রুটি ও দূর্বলতা ইংরেজী শাসনামলেও ছিল। বলতে গেলে ইংরেজ শাসিত ভারতে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে ইংরেজদের বড় ধরণের হাত ছিল। বিদেশী আগ্রাসী শক্তি, চৌকস প্রশাসন, বাধ্যবাধকতা ও অসহায়ত্ব এসব মন্দ দিক গুলো চেপে রাখে। উত্তপ্ত আগুনের উপর রক্ষিত পাত্রের ঢাকনা সরিয়ে ফেলায় ভিতরের খারাপ ও মন্দ উপাদানগুলো বাষ্পাকারে অথবা উপচে বাইরে গিয়ে পড়ে। স্বাধীনতার লড়াই ও বিদেশী খেদাও আন্দোলন জাতি পুনর্গঠন ও অবদান রাখার সুযোগ দেয়নি। স্বাধীনতাতো পাওয়া গেলো কিন্তু ভিতর থেকে বিবেক ছিল গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ। এটা ব্রিটেন বা অন্য কোন বৃহৎ শক্তির গোলামী নয় বরং লোভ, লালসা, ধন-দওলত, শক্তি-সামর্থ, ইজ্জত ও ক্ষমতা সংকীর্ণতা নিগড়ে আবদ্ধ। এতবড় দেশর নিয়ম-কানুন, রাজনীতিবিদদের পারস্পরিক টানাপোড়েন ও ক্ষমতার চেয়ার দখলের প্রতিগযোগিতা জাতীয় চরিত্র গঠনের সুযোগ দেয়নি। এক্ষেত্রে অবশ্য কতিপয় নেতা ব্যতিক্রমধর্মী হলেও বাকী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে এসবের কোন গুরুত্বও নেই। জগনণের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখে তাদের অন্তর ও বিবেককে জাগ্রত করা ও চারিত্রিক সুষমাকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজনীতিকগণ কোন মনোযোগ ও উৎসাহ প্রদর্শণ করেননি। অবশেষে কিছু আল্লাহর বান্দা ১৯৭৪ সালে *'তাহরীক-ই-পয়াম-ই-ইনসানিয়াত'* নামে একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে সব মানুষের হৃদয়ের দুয়ারে মানবতার বাণী

পৌঁছানোর ব্রত নেন। কোন মহল্লা বা কোন গ্রামে যদি আগুন লেগে যায় তখন কেউ নিজের দূর্বলতা ও অসহায়ত্বকে দেখেনা, আগুন নেভানোর জন্য সব ছুটে চলে এমনকি বোবা ও পঙ্গু পর্যন্ত।

যেকোন দেশে এবং যেকোন যুগে শিক্ষা ও জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডের জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে পরিস্থিতির স্বাভাবিকতা। যেখানে আগ্নেয়গিরির লাভা বারবার উদগিরিত হয়, ঘূর্ণিঝড় লোকালয়ে আঘাত হানে, প্লাবন নির্দয়ভাবে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, উন্নয়ন, অগ্রগতির জন্য মানসিক স্বস্তি ও কর্মপ্রেরণা কী করে থাকবে ? এসব তো প্রাকৃতিক ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কর্মকান্ড। এর উপর তো কারো হাত নেই কিন্তু যেখানে সাম্প্রদায়িক পৈশাচিকতা, মানুষ হত্যার নির্লজ্জ তান্ডব, মানবতা বিধ্বংসী মাতাল হাওয়ার প্রচন্ড আঘাতে সব লন্ড ভন্ড হয়ে যায়, যেখানে পড়া লেখা জানা মানুষ মৃগী রোগে (Histeria) আক্রান্ত হয়, যেখানে শক্তি ও সম্পত্তি ছাড়া আর কিছুকে জীবন্ত ও বাস্তব বলে মনে হয়না, সেখানে চরিত্র ও নৈতিকতার নীতি এবং মানুষের জান-মালের মূল্য থাকে কোথায়? একদা নিউ ইয়র্কের বৈদ্যুতিক কেন্দ্রে যখন বজ্র পড়ে সবাই দেখতে দেখতেই চলে গেলো, নানা মন্তব্য করলো কিন্তু কেউ কিছু করলোনা বা করতে পারলোনা। কোন মানুষের উপর বা কোন প্রাসাদের উপর যদি বজ্রপাত হয়, কোন জনসভার যদি ছাদ ভেঙে পড়ে অথবা পাগলা হাতি যদি বাজারে প্রবেশ করে দোকানদার খরিদদার সবাইকে পদদলিত করে তখন কিছু করার থাকেনা। এটা দৈবদূর্বিপাক। বিবেকহীন পশুর তান্ডব তা বুঝে আসে। কিন্তু বুঝে আসেনা যখন পড়ালেখা জানা মানুষ অন্য কোন পড়ালেখা জানা মানুষের উপর জিঘাংসায় উম্মত্ত হয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। গুজরাট, জামশেদপুর, রাউডকিলা, রাঁচী ও আহমদাবাদের ঘটনাপ্রবাহ তার বাস্তব প্রমাণ। একই কলেজের অধ্যাপক অপর অধ্যাপককে খুন করে হাত রঞ্জিত করে দেন। এক ছাত্র আপন সহপাঠীর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি (Informer) করে এবং একই রাজনৈতিক দলের কর্মী একে অপরের গলা কাটে তখন পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে বেগ পেতে হয়না।

এরূপ পরিস্থিতি সমাজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে একান্ত স্বাভাবিক পন্থায় মানুষ সামান্য কথাতেও মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনা। এহেন অনিশ্চিত ও নৈরাজ্যজনক পরিবেশে শিক্ষা, উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কর্মকান্ড কিভাবে চলতে পারে ? দেশ জুড়ে ব্যাপক আকারে রয়েছে দূর্ঘটনা। সমাজ এমন দূর্নীতিগ্রস্থ হয়েছে যে, ঘুষছাড়া মানুষ তার হক পায়না, রেলভ্রমণে আরাম নেই, পড়া-লেখার প্রতি শিক্ষার্থীগণ অমনযোগী, ক্লাসের প্রতি শিক্ষকের অনীহা, প্রশাসনের সবকর্মকান্ডে ঢিম তেতালা ভাব, সময়ের কোন মূল্য নেই, ভ্রমণ অনিরাপদ, স্থির অবস্থান অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢাকা, এরূপ নিরানন্দ ও অবনতিশীল সমাজের সদস্যগণের পক্ষে নীতি রীতির উপর টিকে থাকা কিভাবে সম্ভব ?

চারিত্রিক উৎকর্ষের এ অভিযান, মানবতার বাণীর এ আন্দোলন ভারতবর্ষের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চাকারীদের কর্ম-প্রয়াসের জন্য একটি নিরাপদ দূর্গের মর্যাদা রাখে। এ দূর্গে অবস্থান করলে যেকোন প্রয়াস সফলতার মুখ দেখবে এবং উদ্দেশ্য অর্জনে শান্তিপূর্ণ ও মাত্রাবদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এ আন্দোলনকে মঞ্চ প্রস্তুতকারীদের সাথে তুলনা করা যায়। মঞ্চ প্রস্তুত হওয়ার পর যে কেউ সেখানে বক্তৃতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আরম্ভ করতে পারে, হোক সেটা যেকোন বিষয়ে বা যেকোন ধর্মে। মুসলমান যেখানেই থাকুক নিজের পরিবেশের চিন্তা করে- এটা তার ধর্মীয় দাবী। উট পাখীর মতো বালিতে মাথা গুঁজে বিপদ হতে রক্ষার পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা ব্যর্থতার পরিচায়ক। 'সব ভাল' , 'সব ঠিক ঠাক' এসব সবকের প্রয়োজন নেই। মুসলমান যে জায়গায় থাকুক ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার জন্য আদিষ্ট। একথা বুঝতে হবে যে, জীবনে যে নৌকার উপর তিনি আরোহী , সেটা যদি ডুবে যায় তাহলে তাকে নিয়েই তলিয়ে যাবে। বিশ্বনবী- (স.) এ পরিস্থিতির এমন সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন যার নজীর পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্য ও ইতিহাসে পাওয়া মুশকিল। তিনি বলেন ঃ

"দ্বিতল একটি জাহাজের উপর তলায় এবং নিচ তলায় কিছু মানুষ আরোহন করে। নিচের তলার আরোহীদের পানির ব্যবস্থা রয়েছে উপর তলায়। নিচের আরোহীগণ পিপাসা নিবারণ ও প্রয়োজনীয় কাজ সারানোর

জন্য উপরে গিয়ে পানি আনতে বাধ্য। পানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু পানি গড়িয়ে পড়ে কিছু এলাকা প্লাবিত হয়, এতে উপরের তলার আরোহগন কিছুটা সমস্যায় পড়েন। তাঁরা পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেন। নিচের আরোহীরা বলেন, পানি ছাড়া মানুষ জীবন যাপন করতে পারেনা। উপরের আরোহীরা যদি পানি আনতে না দেন তাহলে আমরা জাহাজের তলায় ফুটো করে দেব এবং বসে বসে সমূদ্রের পানি ব্যবহার করবো। যদি উপর তলার আরোহীদের বিন্দুমাত্র বুদ্ধি থাকে তাহলে তাঁরা নিজের মানুষদেরকে একাজ করতে বাধা দিবেন এবং উপর তলা হতে পানি সংগ্রহের অনুমতি দিবেন। যদি এরূপ না করেন, জাহাজ যদি সত্যিই ফুটো হয়ে যায় উপরের তলার আরোহীরা যেমন বাঁচবেন না তেমনি নিচের তলার মানুষেরও সলিল সমাধি ঘটবে।"

মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে এ মুহূর্তে স্বার্থ, বিদ্বেষ, গোষ্ঠী প্রীতি এবং রাজনৈতিক মতলববাজী হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও সম্পর্কহীন হয়ে সাধারণ মানুষের সামনে সত্য ও বাস্তবতা তুলে ধরা কারণ এর উপর মানবতার মুক্তি ও স্বস্তি নির্ভরশীল। এসবব বিষয় অবহেলা করার ফলে আমাদের পুরো সংস্কৃতি, পুরো মানব সভ্যতা এ মুহূর্তে চরম সঙ্কটের শিকার হয়ে ধ্বংস ও মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। এসব সত্য ও বাস্তবতা নবীগণ যুগে যুগে মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেন এবং এর জন্য প্রাণান্তকর মেহনতের পরিচয় দিয়েছেন। এসব সত্য ও বাস্তবতা এখনো জীবন্ত কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন, জড়বাদী সংগঠন ও জাতীয় স্বার্থান্বেষী চক্র ধূলো বালির এমন ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করেছে যে, এ উজ্জ্বল বাস্তবতা ধূলির নিচে চাপা পড়ে গেল। এতদসত্ত্বেও মানুষের বিবেক আজো মরেনি, মানসিকতা আজো পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়নি। যদি নিঃস্বার্থভাবে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিষ্ঠা সহকারে এসব সত্য ও বাস্তবতাকে বোধগম্য ভাষায় এবং মর্মস্পর্শী পদ্ধতিতে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তবে মানুষের বিবেক আবার সচল হয়ে উঠবে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসব সত্য ও বাস্তবতাকে বরণ করে নেবে। অনেক সময় মনে হয় এসব ভাষণ জনগণের মনের কথারই প্রতিধ্বনি করে এবং তাদের বেদনারই উপশম ঘটায়।

ইতিহাসের ধারবাহিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, খুব স্বল্প সংখ্যক লোকেরাই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েছেন এবং সংখ্যার দিক দিয়ে বিপুল মানুষ এর বিরোধিতায় হয়তো মাঠে নেমেছেন নয়তো বিরোধিতাকারীদের সহায়তা করেছেন কথায় ও কর্মে। এরূপ পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে এগিয়ে আসা দরকার। কেউ যদি ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে না চায় তাহলে পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিবর্তন কোনক্রমেই আশা করা যায়না। গ্রীক ও রোমানদের গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার মতো এ সভ্যতা- সমাজও পতনের বেলাভূমিতে হারিয়ে যাবে, নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। ভারতবর্ষে মুসলমানদের সম্মানজনক পন্থায় বেঁচে থাকার জন্য একটি মাত্র পথ হচ্ছে নিজেরা দেশ ও জাতির জন্য যে অবদান রাখতে সক্ষম সেটা কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে বাস্তবে প্রমাণ করা। চারিত্রিক ও নৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে দীর্ঘ দিনের শূন্যতাকে পূরণ করার জন্য মুসলমানদের এগিয়ে আসতে হবে। কোন দেশে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী নিজেদের যুক্তি যোগ্যতা, প্রয়োজন ও অবদানের মাধ্যমে যদি সমাজ ও দেশকে উপকৃত করতে না পারে এবং নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব ও নিষ্ঠাপূর্ণ দাওয়াতী কর্মকান্ডে পিছিয়ে পড়ে তাহলে শান্তি ও সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবেনা।

'তাহরীক-ই-পয়াম-ই-ইনসানিয়াত' এর উপলক্ষ্য হলো ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের সব মানুষ। এর বিষয়বস্তু হলো মানবতা ও চরিত্র। এর উদ্দেশ্য হলো ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে জীবন পরিচালনার দক্ষতা ও নাগরিকত্বের অনুভূতি জাগ্রত করা। পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে এ আন্দোলন বিস্তৃত। এ আন্দোলনের উদ্যোগে দেশের বড় বড় শহরে এবং গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় স্থানে সাধারণ সভা ও বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সফলতার সাথে। এতে বিপুল সংখ্যক হিন্দু- মুসলমান বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিক, ধর্মীয় নেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ন্যায় নিষ্ঠ নাগরিকবৃন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের ইতিবাচক অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন। একটি শক্তিশালী ফোরামও গঠিত হয় প্রয়োজনীয় প্রচার পত্র, লিটারেচার, চিঠি, পত্র ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে মানবতার আন্দোলনকে সফল ও

প্রাণবন্ত পন্থায় জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসের এ সন্ধিক্ষণে এগুলোই হচ্ছে উল্লেখযোগ্য বিপদ, সঙ্কট ও সমস্যা। যে দেশ দীর্ঘকাল ধরে সাম্রাজ্যবাদের গোলাম ছিল, যে দেশে গণতন্ত্রের মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সত্যিকার অনুশীলন এখনো গড়ে উঠেনি, সে দেশে এমন অন্তবর্তীকালীণ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। এ অস্বাভাবিক ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বেশী দিন স্থায়ী হতে পারেনা। এ অবস্থার অবসান ঘটবে। অবশেষে বিবেক আবেগের উপর প্রাধান্য পাবে, রাজনৈতিক সচেতনতা বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতাকে মাটি চাপা দেবে। বিপদের মেঘ কেটে যাবে। ভারতের মুসলমানদের স্বাধীনতা, সমতা ও সম্মানের সুফল পাবে সব নাগরিক। ভারতের উন্নতি, সংহতি ও সমৃদ্ধির পরিকল্পনা মুসলমানদের সহযোগিতা ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এক্ষেত্রে অবশ্য মুসলমানদের আল্লাহর উপর ভরসা, নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হবে।

পরিশিষ্ট ঃ

১৯৭১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ৬১,৪১৭, ৯৩৪ অর্থাৎ পুরো জনসংখ্যার ১১.২১ শতাংশ মুসলমান। এর মধ্যে ৩১,৯৬১,৭৮৯,জন পুরুষ ও ২৯,৪৫৬, ১৪৫ জন মহিলা। মুসলমানদের জনসংখ্যার আনুপাতিক ১৯৬১ সালে ১০.৭০ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭১ সালে ১১.২১ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ০.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিগত দশকে ১৯৫১-৬১ সালে বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৯.৯১ হতে ১০.৭০ শতাংশ অর্থাৎ ০.৭৯ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

১৯৬১-৭১ পর্যন্ত ভতের বিভিন্ন রাজ্য ও জেলা ভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির খতিয়ান তিনটি সারণী প্রদর্শণ করা হলো ঃ

সারণী-১

১৯৭১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী রাজ্যভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যার বিবরণী-

রাজ্য	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান	জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমানদের আনুপাতিক হার
ভারত	৫৪৭,৯৪৯,৮০৯	৬১,৪১৭,৯৩৪	১১.২১
অন্দ্রপ্রদেশ	৪৩,৫০২,৭০৮	৩,৫২০,১৬৬	৮.০৯
আসাম	১৪,৯৫৭,৫৪২	৩,৫৯৪,০০৬	২৪.০৩
বিহার	৫৬,৩৫৩,৩৬৯	৭,৫৯৪,১৭৩	১৩.৪৮
গুজরাট	২৬,৬৯৭,৪৭৫	২,২৪৯,০৫৫	৮.৪২
হরিয়ানা	১০,০৩৬,৮০৮	৪০৫,৭২৩	৪.০৪
হিমাচল প্রদেশ	৩,৪৬০,৪৩৪	৫০,৩২৫	১.৪৫
জম্মু ও	৪,৬১৬,৬৩২	৩,০৪০,১৮৯	৬৫.৮৫

কাশ্মীর			
কেরালা	২১,৩৪৭,৩৭৫	৪,১৬২,৭১৮	১৯.৫০
মধ্যপ্রদেশ	৪১,৬৫৪,১১৯	১,৮১৫,৬৮৫	৪.৩৬
মহারাষ্ট্র	৫০,১১২,২৩৫	৪,২৩৩,০২৩	৮.৪০
মনিপুর	১,০৭২,৭৫৩	৭০,৯৬৯	৬.৬১
মেঘালয়	১,০১১,৬৯৯	২৬,৩৪৭	২.৬০
মহিশুর	২৯,২৯৯,০১৪	৩,১১৩,২৯৮	১.৬৩
নাগাল্যান্ড	৫১৬,৪৪৯	২,৯৬৬	০.৫৮
উরিষ্যা	২১,৯৪৪,৬১৫	৩২৬,৫০৭	১.৪৯
পাঞ্জাব	১৩,৫৫১,০৬০	১১৪,৪০৭	০.৮৪
রাজস্থান	২৫,৭৬৫,৮০৪	১,৭৭৮,২৭৫	৬.৯০
তামিলনাড়ু	৪১,১৯৯,১৬৮	২,১০৩,৮৯৯	৫.১১
ত্রিপুরা	১,৫৫৬,৩৪২	১০৩,৯৬২	৬.৬৮
রাজ্য	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান	পুরো জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমানদের আনুপাতিক হার
উত্তর প্রদেশ	৮৮,১৪১,১৪৪	১৩,৬৭৬,৫৩৩	১৫.৪৮
পশ্চিম বঙ্গ	৪৪,৩১২,০১১	৯,০৬৪,৩৩৮	৩.৪৬

ইউনিয়ন টেরিটরীজ ঃ

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ	১১৫,১৩৩	১১,৬৫৫	১০.১২
অরুনাচল প্রদেশ	৪৭৬,৫১১	৮৪২	০.১৮
চন্দিগড়	২৫৭,২৫১	৩,৭২০	১.৫৪
দাদার ও নগর হাবেলী	৭৪,১৪০	৭৪০	১.০০

দিল্লি	৪,৬৫,৬৯৮	২৬৩,০১৯	৬.৪৭
গোয়া,দামান,দিউ,	৮৫৭,৭৭১	৩২,২৫০,	৩.৭৬
লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনিদিভি দ্বীপ	৩১,৮১০	৩০,০১৯	৯৪.৩৭
পন্ডিচেরী	৪৭১,৭০৭	২৯,১৪১	৬.১৮

সারণী-২

জেলা ভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত

ক্যাটাগরী	জেলার সংখ্যা
২.৫ শতাংশের উর্দ্ধে	৮১
২.৫১ হতে ৫.০০ শতাংশ	৫১
৫.০১ হতে ১০ শতাংশ	১০২
১০.০১ হতে ২০ শতাংশ	৮৩
২০.০১ হতে ৫০ শতাংশ	৩০
৫০.০১ হতে তদুর্দ্ধ	০৯

সারণী-৩

এক দশকে বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির খতিয়ান ১৯৬১-৭১

	রাজ্য	পুরো জনসংখ্যার আনুপাতিক হার		%বৃদ্ধি (+) অথবা.হ্রাস (-)
		১৯৬১	১৯৭১	
১.	কেরালা	১৭.৯১	১৯.৫০	+১.৫৯
২.	গোয়া, দামান, দিউ	২.৩৩	৩.৭৬	+১.৪৩
৩.	বিহার	১২.৪৫	১৩.৪৮	+১.০৩

৪.	উত্তর প্রদেশ	১৪.৬৩	১৫.৪৮	+০৮৫
৫.	মহিশুর	৯.৮৭	১০.৬৩	+০.৭৬
৬.	মহারাষ্ট্র	৭.৬৭	৮.৪০	+০.৭৩
৭.	দিল্লি	৫.৮৫	৬.৪৭	+০.৬২
৮.	অন্দ্রপ্রদেশ	৭.৫৫	৮.০৯	+০.৫৪
৯.	ত্রিপুরা	২০.১৪	৬.৬৪	- ১৩.৪৬
১০.	লাক্ষা, দ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনিদিভী দ্বীপ	৯৮.৬৮	৯৪.৩৭	-৪.৩১
১১.	জম্মু ও কাশ্মীর	৬৮.৩০	৬৫.৮৫	-২.৪৫
১২.	আসাম	২৪.৭০	২৪.০৩	-০.৬৭
১৩.	মেঘালয়	২.৯৯	২.৬০	-০.৩৯
১৪.	পন্ডিচেরী	৬.৩৬	৬.১৮	-০.১৮
১৫.	গুজরাট	৮.৪৬	৮.৪২	-০.০৪
১৬.	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ	১১.৬৪	১০.১২	-১.৫২

সূত্র ঃ Census of India, Series, paper 2 of 1972